বঙ্গাব্দ

বাংলা সন ইতিহাস, উৎপত্তি ও বিকাশ

মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল ওরফে বাদশাহ মঙ্গৎ রায়

জয়নাল আবেদীন খান

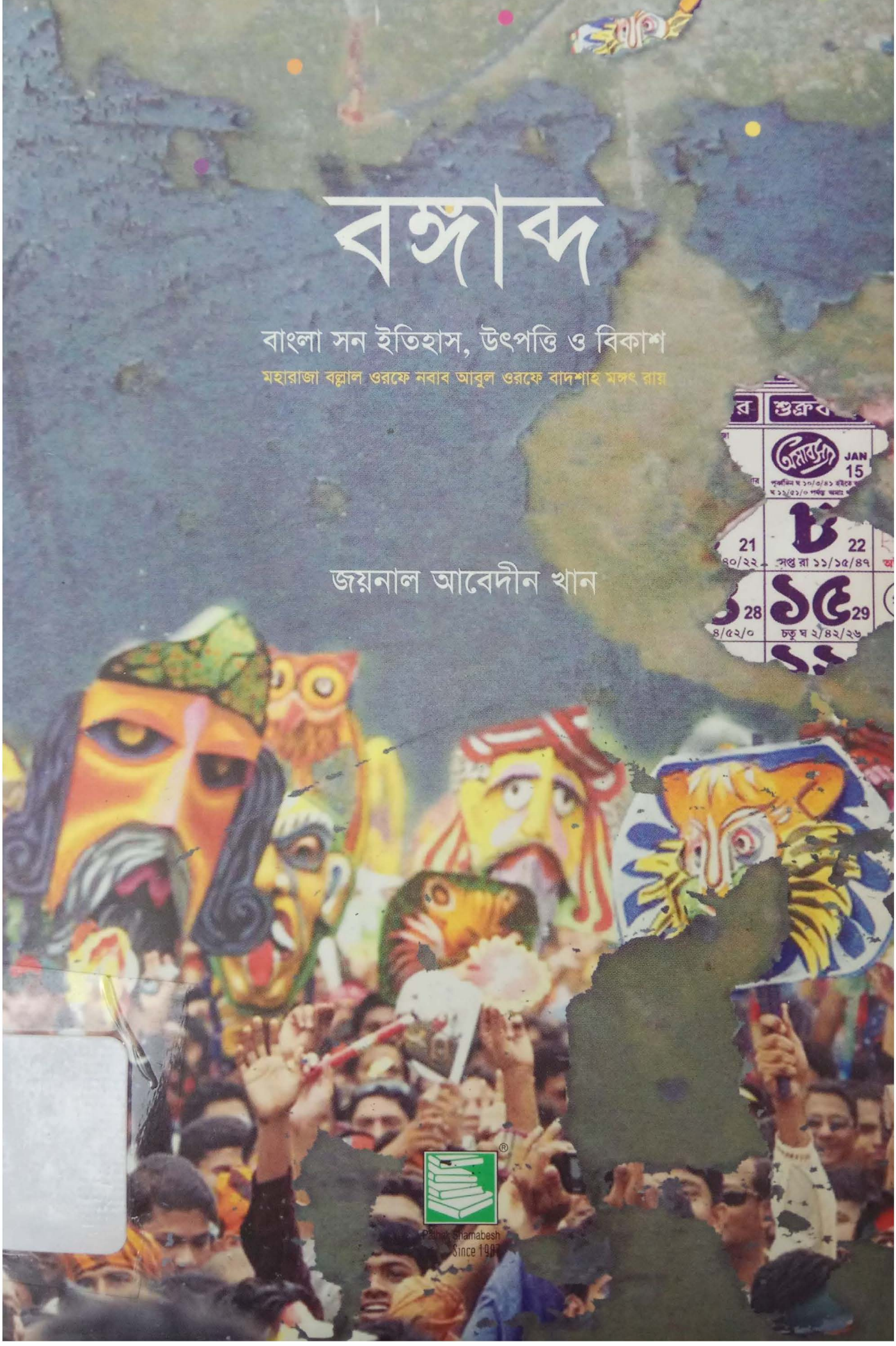

Pathak Samabesh
Since 1991

'বঙ্গাব্দ : বাংলা সন ইতিহাস উৎপত্তি ও বিকাশ বইটি একটি গবেষণাগ্রন্থ। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে এই ধরনের কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হয়নি।

মলহনের পুত্র বল্লাল : কে এই কিংবদন্তির মহানায়ক – এই বিষয়ের ওপর প্রচলিত জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক তথ্য আহরণ করতে গিয়ে অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন খান বহুবিতর্কিত বাংলা সন-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। জনশ্রুতির সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের সামঞ্জস্য বিধান করে তিনি বর্তমান গবেষণাগ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে গবেষক সফলভাবেই দেখিয়েছেন যে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত জনশ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে প্রামাণিক ইতিহাসের চেয়ে কোনো অংশেই কম বস্তুনিষ্ঠ ও কম নির্ভরযোগ্য নয়। গবেষক আরো দেখিয়েছেন যে স্বার্থবাদী মহল তাদের হীন স্বার্থে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মলহনের পুত্র কীর্তিমান বল্লাল রাজাকে চালিয়ে দিয়েছে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল রাজা হিসেবে। এই উদ্দেশ্যে তারা শত শত গ্রন্থ রচনা করেছে এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাচীনীকৃত করেছে। ফলে কীর্তিমান নবাব বল্লালের আসল ইতিহাস নকল ইতিহাসের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। গবেষক জয়নাল আবেদীন খান শ্রমসাধ্য গবেষণার মাধ্যমে সেই লুপ্তপ্রায় আসল ইতিহাসকে মিথ্যার বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন যা বঙ্গদেশ ও বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস পুনর্গঠনে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

Get closer to Pathak Shamabesh at
www.pathakshamabesh.com

ISBN 984-70212-0020-7

ব ঙ্গা ব্দ

বাংলা সন ইতিহাস, উৎপত্তি ও বিকাশ

মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল ওরফে বাদশাহ মঙ্গৎ রায়

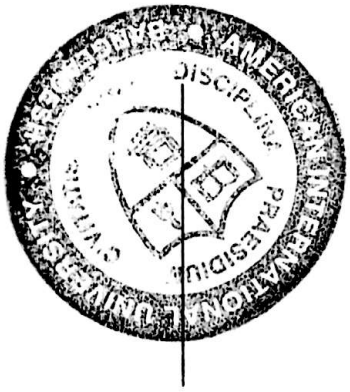

জ য় না ল আ বে দী ন খা ন

Pathak Shamabesh

পাঠক সমাবেশ

বাংলাদেশ ২০০৯

PATHAK SHAMABESH BOOK

ব ঙ্গা ব্দ

বাংলা সন ইতিহাস, উৎপত্তি ও বিকাশ

মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল ওরফে বাদশাহ মঙ্গৎ রায়

জ য় না ল আ বে দী ন খা ন

▼

স্বত্ব © জয়নাল আবেদীন খান

AIUB Library Book
Acc No-23524
Date 26.12.11

প্রথম পাঠক সমাবেশ সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯ / বৈশাখ ১৪১৬
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক
সাহিদুল ইসলাম বিজু
পাঠক সমাবেশ
১৭/এ নিচতলা এবং ২৭ দোতলা, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
ফোন : ৮৮-০২-৯৬৬২৭৬৬, ৯৬৬৩৫২৩
E-mail: pathak@bol-online.com
www.pathakshamabesh.com

প্রচ্ছদ : সেলিম আহ্‌মেদ
মুদ্রণ : কালচার প্রেস, ঢাকা

এই বইয়ের কোনো অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না, আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকর্ডিং, ইত্যাদি এই আইনানুগ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে।

529.3
K45b
2009

Bangabda

Bangla Shan Itihas, Utpatti O Bikash

Maharaja Ballal orafe Nobab Abul orafe Badsha Mangat Roy

by Joynal Abedin Khan

Copyright © Joynal Abedin Khan

First Published by Pathak Shamabesh, April 2009 / Boishakh 1416
All Rights Reserved

Published in Bangladesh by
Shahidul Islam Bizu
PATHAK SHAMABESH
17/A (Ground Floor) and 27 (First Floor), Aziz Market, Shahbag, Dhaka 1000
Phone : 88-02-9662766, 8610644, 9663523 E-mail : pathak@bol-online.com
www.pathakshamabesh

Cover : Selim Ahmed
Printed and Bound in Bangladesh by Culture Press, Dhaka

Bangladesh ISBN 984-70212-0020-7

No part of this book may be reprinted, photographed, photocopied, recorded or reproduced in any form without the written consent of the publisher.

Outlet - 1 : PATHAK SHAMABESH, Gulshan, 411 Tejgoan Link Road, Tel : 9861003
Outlet - 2 : PATHAK SHAMABESH, Shahbag, 17/A Aziz Market, G.F. Tel : 9662766
Outlet - 3 : PATHAK SHAMABESH, Shahbag, 17 Aziz Market, G.F. Tel : 9662766

উৎসর্গ

মা প্রয়াত রবেদা বেগম
ও
পিতামহ প্রয়াত মোহাম্মদ লাল খানের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

গ্রন্থকারের কথা

বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ কে উদ্ভাবন করেন, কখন করেন, কেন করেন— এই সব বিষয়ের ওপর অতীতে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। এখনও হচ্ছে। প্রতি বছরই হয়ে থাকে, বিশেষত বাংলা নববর্ষকে উপলক্ষ করে। আর এই লেখালেখিতে দেখা যায় বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের উদ্ভাবক নিয়ে প্রচুর মতপার্থক্য। কেউ বলেন গৌড়াধিপ রাজা শশাঙ্ক (রাজত্বকাল ৫৯৩ — ৬৩৫ খ্রিঃ) বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ চালু করেন। কেউ বলেন তা নয়। গৌড়রাজ শশাঙ্ক এই সন প্রবর্তন করতে পারেন না। তাদের যুক্তি গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের আমলে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে বাংলা বা বঙ্গ নামে কোন রাজ্যের পরিচিতি গড়ে ওঠে নি। তখন বঙ্গদেশ পাঁচটি জনপদে বিভক্ত ছিল। নাম ছিল এদের কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট। এই পাঁচটি জনপদের বঙ্গ বা বাংলা এই একীভূত পরিচিতি গড়ে ওঠে রাজা শশাঙ্কের অনেক অনেক পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান আমলে। তাই ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে গৌড়ের বা পুণ্ড্রের বা রাঢ়ের রাজার প্রবর্তিত সন কোনক্রমেই বঙ্গাব্দ (বঙ্গ+অব্দ) বা বাংলা সন হতে পারে না।

বাংলার কোন কোন পুঁথিতে বাংলা সন বা বঙ্গাব্দকে 'যবন নৃপতে শকাব্দ' অথবা 'যাবনী বৎসর' বলা হয়েছে। এই অভিধা থেকে অনুমিত হয় যে কোন যবন তথা মুসলমান রাজা বা বাদশাহ বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন প্রবর্তন করেন। তাহলে প্রশ্ন, কে এই মুসলমান রাজা বা বাদশাহ? এর উত্তরে কেউ বলেন বাংলার হুসেন শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৪৯৩–১৫১৯ খ্রিঃ) বাংলা সন উদ্ভাবন করেন। কেউ বলেন মোগল সম্রাট মহামতি আকবর (রাজত্বকাল ১৫৫৬–১৬০৫ খ্রিঃ) বাংলা সন চালু করেন। আবার কেউবা বলেন বাংলার কাহিনী কিংবদন্তীর মহানায়ক মহারাজা বল্লাল সেন (যিনি বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে বিক্রমপুরের বল্লাল সেন, দ্বিতীয় বল্লাল সেন ও পোড়া রাজা বল্লাল সেন নামে উল্লিখিত) বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের উদ্ভাবক। তবে এ কথাটা জোর দিয়েই বলা যায় যে যিনিই বাংলা সনের উদ্ভাবন করে থাকুন না কেন, তিনি যে নবপ্রবর্তিত বাংলা সনটিকে বাঙালীর ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সম্ভবত তা করেছিলেন তিনি বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত কৌমপ্রধান বাঙালির ঐক্য সাধনের লক্ষ্যেও— এক রাজা-এক রাজ্য-এক জাতি-এক ধর্ম এই নীতির ভিত্তিতে।

বাংলার নববর্ষ ১লা বৈশাখ উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায়। বাঙালির এই সব নববর্ষ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে চড়ক পূজা, চড়ক উৎসব, ঘুড়ি ওড়ানো, গরুর দৌড়, হালখাতা, পুণ্যাহ এবং ঢাকার বিখ্যাত ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা-আরাধনা ও মেলা। নববর্ষকে কেন্দ্র করে বাঙালির এই সব আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন সম্পর্কে গবেষক-প্রাবন্ধিক জনাব শামসুজ্জামান খান তার 'বাংলা সন ও আমাদের সংস্কৃতির রূপান্তর' নামক প্রবন্ধে (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ বৈশাখ ১৪০৫) যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "ইতিহাসে দেখা যায় যে এক সময়ে অগ্রহায়ণ মাস থেকে নববর্ষ শুরু হতো। কিন্তু কখন থেকে কিভাবে বৈশাখ মাসে নববর্ষ হলো তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান তোলা হয়, কৃষকের ঘরে ওঠে ফসল। অতএব আনন্দের মাস অগ্রহায়ণ। নববর্ষে যে সব আচার-অনুষ্ঠান হয় সে সম্পর্কে প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে কোথাও বৈশাখে নববর্ষ উৎসব সম্পর্কিত আচার নির্দেশ নেই।' তাহলে নববর্ষের আচার-অনুষ্ঠান হিন্দুদের শাস্ত্রীয় আচার নয়, অতি প্রাচীন স্থানীয় বাসিন্দাদের লোকাচার বলেই মনে করা হয়। কৌম জীবনের সঙ্গেই এর সম্পর্ক। হালখাতা, পুণ্যাহ প্রভৃতি নববর্ষের উৎসবসমূহ অর্বাচীন।"

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত ৪৩৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ অনেকগুলো তাম্রলেখ বিশ্লেষণ করে বেরি এম. মরিসন তার Political Centres and Cultural Regions in Bengal নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মোগল পোষকতা পেয়েই এই বদ্বীপ অঞ্চলের লোকজন বাঙালী হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয়ের ধারণা লাভ করে এবং নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকেও বিপুল পরিমাণে বিকশিত করে। এই বিষয়ে মরিসন লিখেন, "মোগল ও বৃটিশ আমলে শান্তির পরিবেশে পোষকতা পেয়ে বাঙালীগণ তাদের ধ্যান-ধারণা প্রকাশের যখন সুযোগ পেল, তখন তারা সাহিত্য, ভাস্কর্য, বিদ্যাচর্চা ও চারুকারুশিল্পের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র সাংস্কৃতিক অবদান রাখল। আত্মপ্রকাশের এই ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই এই বদ্বীপ অঞ্চলের লোকজন বাঙালী হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করল, আত্মপরিচয়ের ধারণাও লাভ করল।"

এখন কথা হচ্ছে কে ঐ কাহিনী কিংবদন্তীর মহানায়ক মহারাজা বল্লাল সেন ওরফে দ্বিতীয় বল্লাল সেন? এই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি আমার 'বিক্রমপুরের নবাব বল্লাল সেন ও ঢাকেশ্বরী মন্দির' নামক গবেষণা গ্রন্থে। আসলে এই কীর্তিমান বল্লাল রাজা ছিলেন শতসহস্র আরাকানী, পেগুনীজ ও ফিরিঙ্গী অনুচরসহ ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে শরণার্থী হয়ে ঢাকায় আশ্রয়প্রার্থী আরাকানরাজ মঙ্গৎ রায় ওরফে মুকুট রায় ওরফে ধরমসা। ধরম শাহ ঢাকায় এসে নিজেকে মোগল সম্রাট শাহজাহানের করদ সামন্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। মোগল সম্রাটের নিকট থেকে মনসব ও জায়গির লাভ করেন। সপরিবার ও সপারিষদ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়ার পর ধরম শাহের যে মুসলমানী নামটি হয়, সে

নামটিই বিকৃত উচ্চারণের কারণে বল্লাল হয়ে যায়। খুব সম্ভব এ কারণেই মোগল আমলের কোন প্রামাণিক দলিলে 'বল্লাল' এই নামটির কোন হদিস পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক, তান্ত্রিক (শক্তি) ধর্মের প্রচারক ও হিন্দু সমাজের সংস্কারক এই প্রজারঞ্জক, কীর্তিমান ও কীর্তিলিপ্সু বল্লাল রাজার অমর কীর্তিগুলোকে (বিশেষত তার মঠ-মন্দির-মসজিদ-পুকুর-দীঘি-দেবমূর্তি-রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি) চালিয়ে দেয়া হয় বেনামিতে, চালিয়ে দেয়া হয় খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের বঙ্গের সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেনের কীর্তি বলে অথবা খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল সুবাদার মীর জুমলা-শায়েস্তা খানদের কীর্তি হিসেবে কিংবা পরবর্তীকালের ভুঁইফোঁড় জমিদার-রাজা-মহারাজাদের কীর্তিরূপে। এই সব ডাহা মিথ্যাকেই ঐতিহাসিক সত্য বলে সমর্থনের জন্য কুলীনদের ইতিহাস কুলগ্রন্থ ব্যাপক ও বিধিবদ্ধভাবে জাল করা হয় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাচীনীকৃত করা হয়। এমনকি সরকারী দলিলাদিতে পর্যন্ত গোপনে প্রক্ষেপণ হয়। মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য কতভাবে যে কুলগ্রন্থ জাল করা হয়, তার সাক্ষি কুলগ্রন্থগুলোই স্বয়ং ! এই বিষয়ে ঐতিহাসিক সুখময় মুখোপাধ্যায় তার 'বাংলার ইতিহাসের দু' শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১৩০) যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "চন্দ্রদ্বীপে যে দনুজমর্দন নামে কোনও রাজা ছিলেন, তা কোন প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায় না। এই দনুজমর্দন কেবলমাত্র কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থে উল্লিখিত। অবশ্য এই কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থের একটা বড় অংশই দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কারের পরে সৃষ্টি হয়েছে, তারও ইতিহাস বেশ কৌতুকজনক। প্রথমে এই মুদ্রাগুলির তারিখ পড়তে পারা যায় নি। তখন কেউ কেউ মত প্রকাশ করলেন, এই দনুজমর্দন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা দনুজমাধব বা দনুজ রায় অভিন্ন। এই সময় কতগুলি কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হল, যাতে লেখা রয়েছে দনুজমর্দন ও দনুজমাধব অভিন্ন। এর পরে মুদ্রাগুলির তারিখ কেউ কেউ আংশিকভাবে পড়তে পারলেন, কিন্তু তারা মহেন্দ্রদেবকে অগ্রবর্তী ও দনুজমর্দনদেবকে পরবর্তী রাজা মনে করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি কুলগ্রন্থও বেরোল, যাতে লেখা আছে দনুজমর্দন মহেন্দ্রের পুত্র। বটুভট্টের দেববংশেও (নামান্তর 'দেববংশের ইতিবৃত্ত') এই কথা লেখা আছে; এই সব জঞ্জাল এই সময়ের সৃষ্টি। আবার তারিখ ঠিকভাবে পড়তে পারার পর সেই অনুযায়ী কুলগ্রন্থও বেরিয়েছে।" উল্লেখ থাকে যে পাণ্ডুনগর ও চাটিগ্রাম টাকশাল থেকে ১৩৩৯ শকাব্দে রাজা দনুজমর্দনদেব এবং ১৩৪০ শকাব্দে তদীয় পুত্র রাজা মহেন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত কিছু মুদ্রা পাওয়া যায়। এই সব মুদ্রা থেকে নিশ্চিতভাবেই জানা যায় যে এই দুইজন রাজা গোটা বাংলারই রাজা ছিলেন। তারা খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজত্ব করতেন এবং পিতা-পুত্র উভয়েই চণ্ডীচরণপরায়ণ অর্থাৎ চণ্ডীভক্ত ছিলেন। কুলগ্রন্থ 'বটুভট্টের দেববংশ' সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "ইহা (বটুভট্টের দেববংশ) হয় খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত নতুবা ইহা কৃত্রিম, বর্তমান

যুগের শত শত কুলপঞ্জিকার ন্যায় দুই দশ বৎসর পূর্বে লিখিত এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রাচীনীকৃত।" শুধু তা-ই নয়। বল্লালকৃত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক গ্রন্থ দুটির রচনাকাল বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলোকেও তিনি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

আমরা দেখতে পাই, বাঙালীর মূল আর্থ-সামাজিক বাস্তব জীবনযাত্রা ও বিশাল গ্রামীণ জনপদের প্রায় প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম ও উৎসব-অনুষ্ঠানে বাংলা সনের ব্যবহার ব্যাপক ও অপরিহার্য। তাই বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য বাংলা সনের ইতিবৃত্ত আমাদের সকলেরই জানা আবশ্যক। আমাদের জানা প্রয়োজন, কে বাংলা সনের প্রকৃত উদ্ভাবক আর তার সংস্কৃতি ও ধর্মমতইবা কী ছিল। প্রধানত, এই সব বিষয় জানার উদ্দেশ্যেই আমার এই গ্রন্থ রচনার কষ্টসাধ্য প্রয়াস।

আমি আমার এই গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে বাংলা সনের উদ্ভাবক আসলে ছিলেন কাহিনী-কিংবদন্তীর মহানায়ক মহারাজা বল্লাল সেন (ওরফে নবাব আবুল কাশেম ওরফে শাহজাদা মঙ্গৎ রায় ওরফে শ্রীধরমসা), যিনি ছিলেন আরাকানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা মলহন ওরফে হুসেন শাহ (রাজত্বকাল ১৬১২—১৬২২ খ্রিঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র এবং প্রজাবৎসল ও কীর্তিমান মোগল সম্রাট শাহজাহান (রাজত্বকাল ১৬২৭—১৬৫৮ খ্রিঃ)-এর অধীনস্থ আরাকানের শরণার্থী করদ রাজা, ঢাকার নবাব এবং নিম্নবঙ্গের মোগল সুবাদার। আমি এই বিষয়ে আমার মতের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে নতুন কোন উপাদান উদ্ভাবন করি নি। যেসব তথ্য ও উপকরণ পণ্ডিত মহলে অল্পবিস্তর পরিচিত ও আলোচিত, তা থেকেই আমি প্রায় সমস্ত তথ্য ও উপাদান আহরণ করেছি। আমি শুধু বাংলা সনের ইতিহাস একটি নতুন কার্যকারণ সম্বন্ধগত যুক্তি- পরম্পরায় একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর দিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছি-মাত্র। আমার এই দুঃসাহসী প্রয়াস কতটুকু সফল হয়েছে, জানি না। প্রজ্ঞাবান পাঠকই তার বিচার করবেন।

এ ধরনের গবেষণানির্ভর গ্রন্থে বিস্তৃত তথ্যনির্দেশ দেয়ার প্রচলিত নিয়ম আমি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করেছি এবং প্রচুর উদ্ধৃতিও সংযুক্ত করেছি। যাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করেছি ও উদ্ধৃতি দিয়েছি কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের সকলের ঋণ আমি গভীরভাবে স্বীকার করছি। পাঠক সমাবেশের স্বত্ত্বাধিকারী শাহিদুল ইসলাম বিজু এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমার এই গ্রন্থখানি যদি কৌতূহলী পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তিতে ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের গবেষণাকর্মে সামান্যতমও সাহায্য করে, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

বিনীত

খানবাড়ী, বেশনাল
টঙ্গিবাড়ী, বিক্রমপুর
ফাল্গুন ১৪১১

জয়নাল আবেদীন খান

সু চি প ত্র

অ ধ্যা য় ১

বিভিন্ন সন, প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও লিপিমালায় বাংলা সনের উল্লেখ নেই, আকবরের সৌরসন প্রবর্তন ২৩-২৮

সন কী ও কেন ২৩

আমাদের পঞ্জিকায় বিভিন্ন সন ২৩

শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ বঙ্গাব্দ নয় ২৪

লক্ষ্মণাব্দও বঙ্গাব্দ নয় ২৪

হিন্দু-বৌদ্ধ আমলে বাংলা সন প্রচলিত ছিল না ২৫

সম্রাট আকবরের সৌর সন ও সৌর মাস প্রচলনের কারণ ২৫

সৌর সন-চান্দ্র সন-মলমাস ২৬

চান্দ্র সন ইসলামী ২৭

অ ধ্যা য় ২

রাশিচক্র, মলমাস, দক্ষ প্রজাপতির গল্প ২৯-৩২

রাশিচক্র-সংক্রান্তি-সৌর মাস-চান্দ্র মাস ২৯

শাবনমিতি ৩০

মাসের নামকরণ যেভাবে হয় ৩০

নক্ষত্র ও হিন্দু পুরাণের গল্প ৩০

তিথি-শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ ৩১

গ্রহ-উপগ্রহের নামে দিনের নামকরণ করা হয় ৩১

অ ধ্যা য় ৩

আকবরের ইলাহী সন ও নওরোজ ৩৩-৩৫

আকবরের ইলাহী সন ও রাজজ্যোতিষী ফতেউল্লাহ সিরাজী ৩৩

নওরোজ ৩৪

পারস্য সনের নওরোজ থেকে ইলাহী সন গণিত হয় ৩৪

ইলাহী সনের মাসের নাম পারস্য দেশীয় ৩৫

অ ধ্যা য় ৪

বাংলা সন আকবর প্রবর্তন করেন নি ৩৬-৩৯

বাংলা সন ও ইলাহী সন এক নয় ৩৬

বাংলা সন ও ফসলী সনও এক নয় ৩৭

আকবর বাংলা সনের প্রবর্তক নন ৩৭

অ ধ্যা য় ৫

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দলিলপত্রে বাংলা সনের উল্লেখ, কিংবদন্তীর মহানায়ক কে এই মহারাজা বল্লাল ৪০-৪৪

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে দলিলপত্রে বাংলা সনের উল্লেখ ৪০

গ্রামীণ জীবনে বাংলা সনের প্রভাব সর্বব্যাপী ৪১

বাংলা সনের উদ্ভাবক কে এই কিংবদন্তীর মহানায়ক বল্লাল ৪১

অ ধ্যা য় ৬

মগ রাজা মঙ্গৎ রায়ের বংশধরদের শ্রুতি-স্মৃতি, মঙ্গৎ রায় ছিলেন নির্বাসিত মগ রাজা, নরপতির মগ রাজসিংহাসন জবরদখল ৪৫-৫২

মগ রাজা মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লালের বংশধরদের শ্রুতি-স্মৃতি ৪৫

মঙ্গৎ রায় আসলে ছিলেন আরাকানের নির্বাসিত মগ রাজা ৪৭

মঙ্গৎ রায়ের সদলবলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ জায়গীর ও মনসব লাভ ৪৯

মঙ্গৎ রায়ের নিজেকে মোগল সম্রাটের করদ রাজা বলে ঘোষণা ৪৯

মঙ্গৎ রায় সম্বন্ধে হাশেম সুফীর মন্তব্য ৪৯

মঙ্গৎ রায় মুসলমানী নামের আড়ালে চলে যান ৫০

মঙ্গৎ রায়কে বন্দী করার জন্য নরপতিগ্যির ব্যর্থ চেষ্টা ৫১
নরপতিগ্যিকে আরাকানীরা তাদের বৈধ রাজা বলে মেনে নেয় নি ৫২

অধ্যায় ৭

মঙ্গৎ রায় মোগলদের জায়গীরদার, মনসবদার ও করদ রাজা ছিলেন, তিনি ঢাকার নবাব ছিলেন, তার জনপ্রিয় নাম ছিল বল্লাল ৫৩-৫৫

মঙ্গৎ রায়ের মুসলমানী নাম আবুল ৫৩
মঙ্গৎ রায়ের জনপ্রিয় নাম বল্লাল ৫৪
মঙ্গৎ রায়ের পিতার জনপ্রিয় নাম মলহন ৫৪
আবুল হয়ে যায় বল্লাল ৫৫

অধ্যায় ৮

আরাকান ও আরাকানী, মগরাজা নরমেখলা ওরফে সোলেমান খান, আরাকানে ইসলামী প্রভাব, মগ রাজাদের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য ৬০-৬৯

আরাকান ও আরাকানী বা মগ ৬০
আরাকান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুইজারল্যাণ্ড ও শস্যভাণ্ডার ৬১
আরাকানে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বাস ৬১
আরাকান একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় হিন্দু রাজ্য ছিল ৬২
আরাকান একটি সঙ্কর ইন্দোচৈনিক রাজ্যে পরিণত হয় ৬২
আরাকানের ইতিহাস-ঐতিহ্য অনেকটাই ভারতীয় হিন্দু ৬৩
আরাকান রাজারা আদিশূর তথা সূর্যদেবতার বংশধর ৬৩
আরাকানরাজ নরমেখলার গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ ৬৩
নরমেখলার মুসলমানী নাম গ্রহণ ৬৪
নরমেখলার মসজিদ নির্মাণ ৬৪
নরমেখলার গৌড় ও দিল্লীর বাদশাহদের অনুকরণে রাজদরবার প্রতিষ্ঠা ৬৫
নরমেখলা ও তার পারিষদবর্গ ইসলামী সভ্যতার অনুসারী হয়ে যান ৬৫
আরাকানে নবযুগের সূচনা ৬৬
দেবাসুরের সংগ্রামে দৈবশক্তির জয় এই হল আরাকানীদের সাধনা ৬৬
আরাকান রাজাদের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য ৬৭
আরাকান রাজারা নিজেদেরকে বঙ্গদেশের বৈধ অধিপতি বলে মনে করতেন ৬৭

মোগলদের বিরুদ্ধে আরাকান রাজাদের অবিরাম যুদ্ধ ৬৮
আরাকান রাজাদের চট্টগ্রাম দখল ৬৮
আরাকান সম্বন্ধে বারবোসার বিবরণ ৬৮

অধ্যায় ৯
মগ রাজাদের কুমারী পূজা ও সূর্য পূজা ৭০-৭১
আরাকান রাজাদের কুমারী পূজা ও সূর্য পূজা ৭০

অধ্যায় ১০
মগ রাজারা মুসলিম ভাবাপন্ন হয়ে যান ৭২-৭৭
আরাকান রাজাদের মুসলমানী নাম ধারণ ৭২
রোয়াইঙ্গা মুসলমানদের মতে আরাকান রাজারা মুসলমান ছিলেন ৭৩
আরাকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা ৭৩
আরাকান রাজাদের পুকুর-দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ ৭৪
আরাকানরাজ জৌবক শার অভিনব স্থাপত্য শৈলী প্রবর্তন ৭৪
আরাকানে বিভিন্ন জাতির লোকের আগমন ও বসতি স্থাপন ৭৫
জেরবাদী মুসলমান ৭৬
আরাকান রাজধানী মিহং নগরী সম্বন্ধে মরিস কলিসের বর্ণনা ৭৬
মিহং কসমপলিটান নগরীতে পরিণত হয় ৭৬
আরাকানীরা এক সুসভ্য জাতি ৭৭

অধ্যায় ১১
মগ রাজসভায় সুফী ও হিন্দু আধ্যাত্মিক সাধনার সম্মেলন, আরাকানী মুসলমানেরা প্রতিমা পূজক ৭৮-৮৪
আরাকানে সমন্বয়পন্থী ধর্মমত ও মিশ্রদেবতাদের উদ্ভব ৭৮
আরাকানে ইসলাম একটি লৌকিক ধর্মে পরিণত হয় ৮০
বদরমোকান ৮০
আরাকানী মুসলমানেরা দেবীপূজক ৮১
আরাকান সালতানাতে পরিণত হলেও পৌত্তলিকই থেকে যায় ৮১
আরাকানে মহামুনি প্রতিমার পূজা ৮২

মহামুনির উদ্দেশ্যে শ্বেত পশু-পাখী বলি ৮২
ইয়াক্ষাইং পওনা ও ইয়াক্ষাইং সত্তা ৮৩
রাক্ষাইঙ শ্রীকৃষ্ণ ৮৪
আরাকান রাজাদের ব্রাহ্মণ পোষণ ৮৪

অধ্যায় ১২
আরাকানীরা তান্ত্রিক ধর্মের অনুসারী, তারা নাথ ও প্রতীক পূজক, মগ রাজা সোলেমান শার বিধবা রানী মগেশ্বরীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান ৮৮-৯১
আরাকানীরা তান্ত্রিক ধর্মের অনুসারী ৮৮
আরাকানীরা নাথ ও প্রতীক উপাসক ৮৯
আরাকানীরা যুগল দেবতার উপাসক তাদের প্রধান দেবতা উমা (মাউ) ৮৯
মগেশ্বরীর পূজা ৯০
বুদ্ধ হিন্দু দেবতায় পরিণত হন ৯০
তান্ত্রিকদের বিশ্বাস কলি যুগের জন্য তান্ত্রিক ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম ৯১

অধ্যায় ১৩
মগ রাজার পালনীয় কর্তব্যসমূহ, মগ রাজা তার রাজ্যের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র অধিপতি ৯২-৯৩
আরাকান রাজারা বুদ্ধাবতার ৯২
আরাকান রাজার অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ ৯২
আরাকান রাজা প্রধান কুলপতি ও কুলদেবতার জিম্মাদার ৯৩
খাতা অনুষ্ঠান ৯৩

অধ্যায় ১৪
যাত্রা ও যাত্রার বিষয়বস্তু, বার মাসে তের পার্বণের দেশ আরাকান, সাইংগ্রাইং উৎসব ৯৪-৯৭
আরাকানে যাত্রা ও যাত্রার বিষয়বস্তু ৯৪
বার মাসে তের পার্বণের দেশ আরাকান ৯৫
সাইংগ্রাইং উৎসব ৯৬
সাইংগ্রাইজা ৯৬

সাইংগ্রাইং উৎসবের আগমনে কর্মচাঞ্চল্য ৯৬
সাইনগাইক ৯৭
সাইংগ্রাইং মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেতনা জাগায় ৯৭

অ ধ্যা য় ১৫
রাজা স্বরাহণ মগী সন প্রবর্তন করেন, মগী সন একটি সৌর সন ৯৮-৯৯
রাজা স্বরাহণ বর্মী তথা আরাকানী সন প্রবর্তন করেন ৯৮
আরি মতবাদ ৯৮
আরাকানী সন একটি সৌর সন ৯৯
আরাকানী বর্ষ গণনার রীতি হিন্দু পঞ্জিকার অনুরূপ ৯৯

অ ধ্যা য় ১৬
মঙ্গৎ রায়ের আগমনের পূর্বে নিম্নবঙ্গ, মঙ্গৎ রায়ের আগমনের পর নিম্নবঙ্গ ১০২-১১২
মঙ্গৎ রায়ের আগমনের পূর্বে নিম্নবঙ্গ বিরান ছিল ১০২
এই সময়ে বাংলার সমাজে হিন্দু ধর্মের একক আদর্শ ছিল না ১০৩
পূর্ববঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল না ১০৩
পশ্চিম বঙ্গেও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল ১০৪
বাংলায় কোন উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান ছিল না ১০৪
মুসলিম বিজয়ের পর হিন্দু ধর্ম ম্রিয়মান হয়ে যায় ১০৪
চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম ১০৫
ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের ত্রাণকর্তারূপে বল্লালের আবির্ভাব ১০৫
মঙ্গৎ রায়ের ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন ১০৬
মঙ্গৎ রায় পূর্ববঙ্গকে জনবহুল ও আবাদী করে তুলেন ১০৭
মগ রাজা মিণ্ডনের কীর্তিসমূহ ১০৮
বল্লাল রাজা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করেন ১০৮
বল্লাল রাজার আমলে নিম্নবঙ্গে শান্তি ফিরে আসে ১০৯
সুবাদার শাহ্ শুজা ও তার প্রতিনিধি নবাব আবুলের আমলের অকল্পনীয় সুখ-সমৃদ্ধি ১০৯
নবাব আবুলের আমলে ঢাকায় অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ইমারত তৈরী হয় ১১০
নবাব আবুলের আমলে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হয় ১১১
কারা ঐ বহিরাগত শাসক শ্রেণী ১১২

অধ্যায় ১৭

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উচ্চতর হিন্দু সমাজে নারী দেবতার স্থান ছিল গৌণ, মঙ্গত রায়ের আমলে নারী দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১১৬-১২১

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাংলার উচ্চতর হিন্দু সমাজে নারীদেবতার প্রাধান্য ছিল না ১১৬

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বাংলায় নারীদেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১১৭

এই সময়ে বাংলা ভাষায় লৌকিক ও পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য রচনার ধূম পড়ে যায় ১১৮

এই সময়ে সংস্কৃত পুরাণ ও উপপুরাণও রচিত হয় ১১৮

সপ্তদশ শতকে অনার্যদেবী চণ্ডী (উমা) বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত হন ১১৯

নবাব বল্লালের মত যুবরাজ দারাও হিন্দু বলে অভিহিত হন ১২০

বাংলার হিন্দু সমাজের ঐক্য সাধনে ঢাকার ভূমিকা ১২০

অধ্যায় ১৮

মঙ্গৎ রায়ের আমলে বল্লালী হিন্দুয়ানি প্রতিষ্ঠিত হয় ১২২-১২৩

বল্লাল বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্ম (বল্লালী হিন্দুয়ানি) সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ১২২

বাংলার হিন্দুতান্ত্রিক ধর্মের ওপর বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব ১২৩

বল্লালি ক্রিয়া ১২৩

অধ্যায় ১৯

মঙ্গৎ রায় ছিলেন শাহ সুজার দিওয়ান, কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন, কুলীনদের মাধ্যমে মহাদেবীর পূজা জনপ্রিয় হয়, কার্ত্তিকপুরের মুসলমান জমিদারদের কালী পূজা ১২৪-১৩৩

শাহ শুজার দিওয়ান হিসেবে মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল ১২৪

বল্লালের কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন ১২৫

কৌলধর্ম-কুলীন-কুলশাস্ত্র ১২৬

তান্ত্রিক উপাসনায় ভাব ও আচার ১২৬

তন্ত্রাচারই কলিযুগের ভবব্যধির একমাত্র নিদান ১২৭

পঞ্চমকারের সাধনা ১২৭

কুলীনদের জন্য ৯টি সদগুণ অর্জন বাধ্যতামূলক ১২৭

কুলীনদের বাড়তি সম্মানসূচক পদবী ১২৮

ঘটক সম্প্রদায় সৃষ্টি ১২৮
কুলীনদের জন্য নানকার জমি ১২৮
দিনাজপুর জমিদারি ১২৯
কুলীনেরা মোগল রাজস্ব ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ১২৯
কুলীনেরা ব্যঙ্গচ্ছলে বল্লাল সেনিয়া বলে আখ্যায়িত হন ১২৯
মহাদেবীর পূজা জনপ্রিয় হয় কুলীনদের মাধ্যমেই ১৩০
কুলীনদের বাড়ীর সামনে আরাকানী ঐতিহ্যে মঠ-মন্দির নির্মাণ ১৩১
বল্লালী আমলে মুসলিম সমাজে তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব ১৩১
কার্ত্তিকপুরের মুসলমান জমিদারদের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ১৩১
বল্লাল রাজা বঙ্গদেশে সমন্বয়বাদী জীবনধারা গড়তে চান ১৩২
বাঙালীর দুর্গা-পূজা আসলে আরাকানীর মাউ-পূজা ১৩৩

অধ্যায় ২০

আকবরের দীন-ই-ইলাহী, আকবর শাহজাদা দারা ও মঙ্গৎ রায়ের আদর্শ ছিলেন, বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ, মগী সনের প্রথম দিন ও প্রথম মাস, বৌদ্ধদের নিকট বৈশাখ মহাপবিত্র মাস ১৩৭-১৭২

হিজরত ও হিজরী সন ১৩৭
সম্রাট আকবর সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ১৩৭
আকবরের দীন-ই-ইলাহী ১৩৮
আকবরের চিন্তা-চেতনার প্রতিভূ ছিলেন দারা ও বল্লাল ১৩৮
বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ ১৩৯
বাঘার বাংলা 'মুলকী সনের' প্রথম মাস অগ্রহায়ণ ১৩৯
বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ হওয়ার কারণ ১৩৯

অধ্যায় ২১

চড়ক উৎসব, বিক্রমপুরে চড়ক উৎসব, চড়ক উৎসব ও সূর্য উৎসব অভিন্ন, বৌদ্ধ রাজাদের ভূমিকর্ষণ উৎসব ১৪৪-১৫৭

বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানসমূহ ১৪৪
চড়ক উৎসব ১৪৪
চড়ক পূজার বিভিন্ন নিষ্ঠুর আচার ১৪৫

চড়ক পূজায় নিম্নবর্ণের লোকেরাই অত্যধিক গুরুত্ব পায় ১৪৫
চড়ক উৎসব ও নববর্ষ সম্পর্কে নীলিমা ইব্রাহিমের বিবরণ ১৪৬
চিল পূজা ১৪৭
তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে চক্র (চড়ক) পূজা ১৪৭
তিব্বতীদের একটি জনপ্রিয় উৎসব চোড়গ ১৪৮
ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশে চড়ক পূজার প্রচলন ছিল না ১৪৮
খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রাজনগরে হত বঙ্গদেশের বৃহত্তম চড়ক পূজা ও চড়ক উৎসব ১৪৯
রাজনগর রাজপ্রাসাদ ও চড়ক উৎসব সম্পর্কে হিমাংশু বাবুর বিবরণ ১৪৯
কে চড়ক উৎসবকে সর্বশ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন ১৫২
চড়ক উৎসব ও সূর্যোৎসব অভিন্ন ১৫২
সূর্য কৃষির সহায়ক দেবতা ১৫৪
জপসার নামক জনপদে সূর্য পূজা ১৫৪
শিব তথা সূর্যের মাথায় জল ঢালা ১৫৫
আরাকান রাজারা সূর্যোপাসক ১৫৫
বুদ্ধ একবার হলধর হয়ে জন্মান ১৫৫
চৈনিক রাজাদের রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠান ১৫৬
চৈনিক সূর্যপুরাণের গল্প ১৫৬

অধ্যায় ২২

হালখাতা, হালখাতায় গণেশ পূজা **১৫৯-১৬৩**

হালখাতা ১৫৯
মিষ্টিমুখ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চারের অনুষ্ঠান ১৫৯
ব্যবসায়ী ও বণিকদের দোকানে-গদিতে গণেশ মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা ১৬০
হালখাতা ব্যবসায়ী ও খদ্দেরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়তে সহায়ক ১৬০
হালখাতার অনুষ্ঠান এককালে চীনদেশে ছিল ১৬১
বিক্রমসংবৎ অনুসারে নববর্ষের উৎসবে লক্ষ্মীর আসন সবার উপরে ১৬১
বাঙালীর হালখাতায় গণেশের প্রতিষ্ঠার কারণ কি ১৬১
বুদ্ধ বণিক-ব্যবসায়ীর বিঘ্ন নাশ করেন বলে তার শরণ আবশ্যক ১৬২
বৈশাখ মাস বুদ্ধাবতার গণেশের জন্মোৎসব পালনের প্রশস্ত মাস ১৬২

আরাকান রাজারা বুদ্ধাবতার গণেশের ভক্ত ১৬২
আরাকান রাজাদের শ্বেত গজেশ্বর উপাধি ধারণ ১৬৩
মনদের প্রধান দেবতা গণেশ ১৬৩
মঙ্গৎ রায়ের আমলে বণিকের হালখাতায় বুদ্ধাবতার গণপতির প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক ১৬৩

অ ধ্যা য় ২৩
পুণ্যা, ঝারোকা-ই-দর্শন, মগ খাতা অনুষ্ঠান, বুদ্ধাবতারের পূজা ১৬৫-১৭১
পুণ্যাহ ১৬৫
গ্রাম্য জমিদারদের পুইণ্যা অনুষ্ঠান ১৬৬
বোমাং রাজাদের পুণ্যা উৎসব ১৬৬
বাংলার নবাবদের পুণ্যাহ উৎসব ১৬৭
ঝারোকা-ই-দর্শন ১৬৭
খাতা অনুষ্ঠান ১৬৮
ঝারোকা-ই-দর্শন ও খাতা অনুষ্ঠানের মিশ্ররূপ বাংলার পুণ্যা অনুষ্ঠান ১৬৯
গোহার ও ধরম-ডাক ১৬৯
ধর্ম উপার্জন করতে হলে বুদ্ধাবতারকেও পূজা ও ভক্তি করতে হয় ১৭০
বল্লাল প্রত্যক্ষ নারায়ণ এবং কুলীনেরা দেবতার সমান ১৭০
প্রজাদের জন্য রাজাকে ও কুলীনদেরকে দর্শন ও দর্শনী প্রদান পুণ্যের কাজ ১৭০
আরাকানী ভাষার পুণীয়া থেকে পুইণ্যা ১৭০
মগ খাতা অনুষ্ঠান পুইণ্যা অনুষ্ঠান নামে চালু হয় ১৭১

অ ধ্যা য় ২৪
ঢাকায় চিল পূজার মেলা, অন্যান্য স্থানের মেলা, ঢাকায় ঘুড়ি উড়ানো উৎসব, গরুর পরিচর্যা ও দৌড়, বাসি হওয়া ঠান্ডা খাবার খাওয়া ১৭৩-১৮০
মেলা ১৭৩
ঢাকা শহরের দুটি বিখ্যাত মেলা ১৭৩
নেকমর্দানের বিখ্যাত মেলা ১৭৪
মেলা গলৈয়া নামেও পরিচিত ১৭৫
মেলায় হরেক রকম জিনিস বেচাকেনা হয় ১৭৫

ঢাকাবাসীর ঐতিহ্যবাহী উৎসব ঘুড়ি ওড়ানো ১৭৫
নববর্ষে গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা ১৭৬
পয়লা বৈশাখে গরুর পরিচর্যা ও দৌড় ১৭৭
বোহগ বিহু ১৭৭
বৌদ্ধ গরু জাতকের কাহিনী ১৭৮
চৈত্র সংক্রান্তিতে ঘুড়ি-উড়ান এবং পয়লা বৈশাখে বাসি-হওয়া ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া ১৭৮
ঐতিহ্যবাহী চীনা লোক উৎসব কীংমিং ১৭৯
চীনা রান্না ঘরের এক অধিদেবতা ১৭৯
নবাব বল্লাল ও ঢাকার কুট্টি জনগোষ্ঠী ১৮০

অধ্যায় ২৫

বাংলা সন দ্রুত চালু হওয়ার কারণ ১৮১-১৮০

বল্লালী দারিদ্র ১৮১
বল্লালী ক্রিয়া ১৮১
বল্লালী আমল বঙ্গের হিন্দুর ইতিহাসে স্বর্ণযুগ ১৮২
ইতিহাস বিকৃতির শিকার হন নবাব বল্লাল ১৮২
বাংলা সন দ্রুত চালু হওয়ার কারণ ১৮৩
বাংলা সনে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে ১৮৪

অধ্যায় ২৬

চিত্র ১৮৭

অধ্যায় ১

বিভিন্ন সন, প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও লিপিমালায় বাংলা সনের উল্লেখ নেই, আকবরের সৌরসন প্রবর্তন

সন গণনা, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে শকাব্দ-বিক্রমাব্দ-রাজ্যাঙ্কের ব্যবহার, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের সাহিত্য ও প্রামাণ্য লিপিমালায় বাংলা সনের উল্লেখ নেই, আকবরনামাতেও নেই বঙ্গাব্দের উল্লেখ, কথিত আছে সম্রাট আকবর বাংলা সন প্রবর্তন করেন, আকবরের সন ইলাহী প্রবর্তন, মলমাস, শাবনমিতি, চান্দ্রসন ইসলামী, সৌর সন ইসলামী নয়।

সন কী ও কেন

সভ্যতার উন্মেষ ও লিখন পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ধারাবাহিক ও সময়ানুক্রমিক হিসাব রাখার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। এরই ফলে কোন একটি বিখ্যাত ঘটনা নিয়ে সন বা অব্দ গণনা শুরু হয়। অতি প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর দেশে দেশে নানা অব্দের প্রচলন হয়। এদের কোনটি কালোত্তীর্ণ হয়ে আজও টিকে আছে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন— খ্রিষ্টাব্দ, শকাব্দ, হিজরী সন ইত্যাদি। আবার কোনটিবা কালক্রমে সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে যেমন হর্ষাব্দ, লক্ষ্মণাব্দ, সন বলালি প্রভৃতি।

আমাদের পঞ্জিকায় বিভিন্ন সন

আমাদের পঞ্জিকায় এখন পাশাপাশি খ্রিষ্টাব্দ, বাংলা সন ও হিজরী সালের হিসাব চলে আসছে। এমনটি অবশ্য সব সময় ছিল না। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মুসলিম বিজয়ের পূর্বে অর্থাৎ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে

বঙ্গদেশে শকাব্দ ও বিক্রমাব্দের ব্যবহার ছিল। তবে শকাব্দেরই ব্যবহার ছিল বেশী।[১] অবশ্য রাজকার্যে রাজকীয় সন হিসেবে সংশ্লিষ্ট রাজার রাজ্যাঙ্কের ব্যবহারই ছিল সর্বত্র।[২] মুসলিম অধিকারের পর এই রীতির অবসান ঘটে এবং রাজকার্যে রাজকীয় সন হিসেবে হিজরী সনের ব্যবহার শুরু হয়।[৩] ঐ সময়ে এই দেশে ইংরেজী সনের প্রচলন ছিল না। এই দেশে ইংরেজী সন অর্থাৎ খ্রিষ্টাব্দের প্রচলন হয় ইংরেজ অধিকারের পর। ইংরেজ অধিকারের পর আমাদের দেশে রাজকার্যে রাজকীয় সন হিসেবে হিজরী সনের বদলে খ্রিষ্টাব্দের ব্যবহার শুরু হয়।[৪] সুতরাং দেখা যায় যে বঙ্গদেশে মুসলিম বিজয়ের সঙ্গে হিজরী সন এবং ইংরেজ বিজয়ের সঙ্গে ইংরেজী সন সম্পর্কিত। এমতাবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আমাদের পঞ্জিকায় খ্রিষ্টাব্দ ও হিজরী সনের পাশাপাশি বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন এল কোথা থেকে? বঙ্গাব্দ কি তৎকালে প্রচলিত শকাব্দ, বিক্রমাব্দ বা লক্ষ্মণাব্দের নামান্তরমাত্র?

শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ বঙ্গাব্দ নয়

আমরা সকলেই অবগত আছি যে: শকাব্দার[৫] বয়স এখন এই ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে (২০০৪ − ৭৮ =) ১৯২৬ বৎসর আর বিক্রমাব্দার[৬] বয়স এই ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে (২০০৪ + ৫৮ =) ২০৬২ বৎসর। পক্ষান্তরে বঙ্গাব্দের বয়স এখন এই ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১৪১১ বৎসর। দেখা যায় বঙ্গাব্দ শকাব্দের চেয়ে (১৯২৬ − ১৪১১ =) ৫১৫ বছরের ছোট আর বিক্রমাব্দের চেয়ে (২০৬২ − ১৪১১ =) ৬৫১ বছরের ছোট। এমতাবস্থায় শকাব্দ বা বিক্রমাব্দের অপর নাম কোনভাবেই বঙ্গাব্দ হতে পারে না।

লক্ষ্মণাব্দও বঙ্গাব্দ নয়

এবার লক্ষ্মণাব্দের বিষয়ে আসা যাক। লক্ষ্মণাব্দ বঙ্গদেশের সেন রাজবংশের রাজা লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বিষয়ে জানা যায় সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল লিখিত আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ থেকেও। ইলাহী সন বা তারিখ-ই-ইলাহী প্রবর্তন করতে গিয়ে সম্রাট আকবর যে বাদশাহী ফরমান জারী করেন তাতে লক্ষ্মণাব্দ সম্বন্ধে লিখিত আছে —"It is also apparent that within the Imperial Dominions diverse eras are followed by the people of India. For example, in Bengal the era dates from the beginning of the rule of Lacksman Sen from which date till now 465 years have elapsed."[৭] এখান থেকে দেখা যায় যে লক্ষ্মণাব্দ লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যারম্ভ কাল থেকে গণিত হয়ে আসছে। আমরা জ্ঞাত আছি যে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল শুরু হয় ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে।[৮] লক্ষ্মণাব্দ যদি এখনও প্রচলিত থাকত, তাহলে বর্তমানকালে এর বয়স হত (২০০৪ − ১১৭৯ =) ৮২৫ বছর। পক্ষান্তরে বঙ্গাব্দের বয়স এখন ১৪১১ বছর। বঙ্গাব্দ লক্ষ্মণাব্দের চেয়ে বয়সে অনেক অনেক বড়। তাই লক্ষ্মণাব্দের নামান্তর কোনক্রমেই বঙ্গাব্দ হতে পারে না।

হিন্দু-বৌদ্ধ আমলে বাংলা সন প্রচলিত ছিল না

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বঙ্গাব্দ লক্ষ্মণাব্দ-শকাব্দ-বিক্রমাব্দ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বঙ্গাব্দ কি বঙ্গদেশে মুসলিমপূর্ব যুগে প্রচলিত ছিল? এর উত্তরে বলা যায়, হিন্দু-বৌদ্ধ আমলে বঙ্গাব্দ প্রচলিত ছিল না। বঙ্গাব্দ যদি মুসলিমপূর্ব যুগে প্রবর্তিত হত, তাহলে বঙ্গদেশের পাল-চন্দ্র-বর্ম-দেব রাজবংশের রাজাদের এবং সেন রাজবংশের রাজাদের বিশেষ করে বল্লাল সেন, পুত্র লক্ষ্মণ সেন এবং পৌত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের সরকারী দলিলে এই সনের ব্যবহার থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পাল-চন্দ্র-বর্ম-সেন-দেব লিপিমালার সর্বক্ষেত্রেই রাজ্যাঙ্কের ব্যবহার রয়েছে। এমনকি হিন্দু যুগের সাহিত্য বা প্রামাণ্য লিপিমালায় বঙ্গাব্দের উল্লেখ তো দূরের কথা, এই সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কোন ইঙ্গিতও নেই। তদুপরি বঙ্গাব্দের মত উন্নত ধরনের সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন সন যদি বঙ্গদেশে বা ভারতের অন্য কোনও অঞ্চলে প্রচলিত থাকত, তাহলে ঐতিহাসিক আবুল ফজল তার আকবরনামায় তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। আকবরনামায় বঙ্গাব্দের কোন উল্লেখ নেই, আছে লক্ষ্মণাব্দের উল্লেখ। এ ছাড়া বাংলা সনের উল্লেখকালে আমরা সাধারণত এভাবে লিখি 'সন ১৪১১ সাল, তারিখ ১লা বৈশাখ।' সন শব্দের অর্থ বর্ষ বা বর্ষপঞ্জী। শব্দটি আরবী। সাল অর্থও বৎসর। শব্দটি ফারসী। ১লা বৈশাখ বৎসরের শুরু। তারিখ মানে দিন। শব্দটি আরবী। স্পষ্টই বোঝা যায় বাংলা সনের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দগুলো বাংলাতে প্রচলিত হয়েছে।[৯] সুতরাং বঙ্গাব্দের প্রচলনের সঙ্গে হিন্দু আমলের কোন রাজাকে সম্পর্কিত করার কোন ভিত্তিই থাকতে পারে না।

সম্রাট আকবরের সৌর সন ও সৌর মাস প্রচলনের কারণ

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যায়, হিন্দু আমলের পরবর্তীকালের কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে বঙ্গাব্দের প্রচলন হয়? কে এর প্রচলন করেন? কখন করেন? কেনই-বা করেন? এই সব প্রশ্নের উত্তরে অহরহ বলা হয়ে থাকে যে মোগল সম্রাট আকবর খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে তার রাজত্বকালে বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন। আমরা সকলেই অবগত আছি যে সম্রাট আকবর ৯৬৩ হিজরী সনের ২রা রবিয়াস সানী মুতাবিক ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মোগল রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক আবুল ফজলের আকবরনামায় পরিষ্কার লিখিত আছে '৯৬৩ হিজরী সনের ২রা রবিয়াস সানী শুক্রবার প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেন।' ঐ সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই রাজকীয় সন হিসেবে হিজরী সনের প্রচলন ছিল। হিজরী সন একটি চান্দ্র সন। চান্দ্র সনে চন্দ্রের অস্থিরতার কারণে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট মৌসুমে নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করার অসুবিধে দেখা দেয়। সৌর সনে কিন্তু এই অসুবিধে নেই। সৌর সনের মাস ও দিনগুলো নির্দিষ্ট ঋতুতেই বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। সম্রাট

আকবরের রাজত্বের ২৯তম বৎসরে রাজকার্য নির্বাহে নানা অসুবিধে দেখা দেয়। বিশেষ করে হিজরী সনের দুর্বলতার কারণে বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ পাঠে আমরা জানতে পারি যে সম্রাট আকবরের দরবারের কিছু প্রভাবশালী কর্মচারীও হিজরী সনের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন এবং একটি নতুন সনের জন্য আব্দার করেন। নতুন সন প্রচলন করার জন্য আকবর যে বাদশাহী ফরমান জারী করেন, তাতে আছে— "The repeated representation of the body of men (the great officers of the court) and a regard for their petitions prevailed and were accepted and order was issued that the new year which followed close to the year of the accession should be made the foundation." বাদশাহের দরবারের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী যে নতুন সন প্রচারের জন্য আবেদন করেন এতে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এই সকল আবেদনের মধ্যে নতুন সনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে-সব কারণ দেয়া আছে, তাতে ভারত সন, লক্ষ্মণ সন, বিক্রম সন, শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, হিজরী সন প্রভৃতির ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা এবং অসুবিধে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্রাট নিজেও হিজরী সনের দুর্বলতার বিষয়ে অবগত ছিলেন। সম্রাট এমন একটি ত্রুটিমুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত সৌর সনের প্রতিষ্ঠা করতে চান, যা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য আদর্শ হবে। তাই তিনি এই বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। সম্রাটের নির্দেশনামায় বলা হয়, "Whereas in the almanac current in India, the years were solar and the months lunar, we ordered that the months of the new era should be solar." এর বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায়— "যেহেতু ভারতে প্রচলিত সনগুলো সৌর পদ্ধতির এবং তার মাসগুলো চান্দ্র পদ্ধতির তাই আমার নির্দেশ এই যে প্রস্তাবিত সনটি যেন পূর্ণাঙ্গ সৌর পদ্ধতির হয়।" সম্রাটের নেক নজরের ফলে যে নবতর সনের প্রচলন হয় তাতে মলমাসের দিনগুলো অবলুপ্ত হয় এবং মাসগুলোও সৌর পদ্ধতির হয়। এই বিষয়েও আকবরনামায় আছে— "By the blessings of His Majesty's attention, intercalary days were abolished and the months like the year, became solar." উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায় আকবরের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে সৌর বৎসরের প্রচলন থাকলেও সৌরমাসের প্রচলন ছিল না। আকবরের ফরমানের বলে মাসগুলোও সৌর মাসে পরিণত হয় এবং মলমাসগুলো উঠে যায়।[১০]

সৌর সন-চান্দ্র সন-মলমাস

এই কথাগুলো ভালোভাবে বোঝাবার জন্য বিশ্বভারতীর গণিত ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক রায় সাহেব জগদানন্দ রায়ের 'নক্ষত্র চেনা' নামক পুস্তকের বিভিন্ন স্থান থেকে কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেছেন, "আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা প্রথমে সূর্যের গতিবিধি দেখিয়া মাস বা বৎসরের হিসাব করিতেন না। তাহারা চাঁদকে চিনিতেন এবং রাশিচক্রের উপর দিয়া চাঁদের গতি দেখিয়া সময় ভাগ করিতেন। ইহারা হিসাব

করিয়াছিলেন চাঁদের এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমায় আসিতে সাড়ে ঊনত্রিশ দিন সময় লাগে। তাহারা এই সময়টাকেই মাস নাম দিলেন। ...বার চান্দ্র মাসে তিন শত ষাইট তিথি থাকে। কিন্তু তিথিগুলি এক দিনের চেয়ে সাধারণত ছোট। এই জন্য দিনের হিসাব করিলে বার চান্দ্র মাসে ৩৫৪ দিন ৯ ঘণ্টার বেশী সময় থাকে না। কাজেই বলিতে হয় আমাদের তিথির বৎসর অর্থাৎ চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিন ৯ ঘণ্টায় শেষ হইয়া পড়ে। ...আমাদের পূজা-পার্বণ, ব্রত-উপবাস, শ্রাদ্ধ-শান্তি সকলেই চান্দ্র দিনের হিসাবে অর্থাৎ তিথি অনুসারে চলে... প্রতি বৎসরেই পূজা-পার্বণের দিন আগেকার বৎসরের তুলনায় প্রায় এগার দিন করিয়া তফাৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু এই তফাৎকে কখনই চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া জমিতে দেওয়া হয় না। ...চান্দ্র বৎসর প্রতি চলতি বৎসরে প্রায় এগার দিন বাড়িতে বাড়িতে যখন তিন বৎসরে সাড়ে বত্রিশ দিন তফাৎ হইয়া পড়ে তখন একটা চান্দ্র মাসকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়। সংক্রান্তির পর হইতে অর্থাৎ সূর্য যখন এক রাশি ছাড়িয়া অন্য রাশিতে প্রবেশ করে তখনই মাসের আরম্ভ হয়। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্যের গতির গোলযোগে এমন মাস ঘটে, যাহাতে সংক্রান্তি হয় না। এই রকম অমান্ত মাসকেই বাদ দিবার নিয়ম আছে। এই বাদ দেওয়া চান্দ্র মাসকে কি বলে? ...ইহাকে বলা হয় মলমাস বা অধিকমাস। এই মাসটিকে হিন্দুরা মাস বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না। কোন যাগযজ্ঞ, পূজা, হোম বা অন্য শুভ কার্য মলমাসে করা হয় না। ...বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ প্রভৃতি বারো মাসের ...নামের সঙ্গে রাশিচক্রের নক্ষত্রদেরও নাম জড়ান আছে। প্রতি মাসেই একবার করিয়া পূর্ণিমা হয়। প্রত্যেক মাসের পূর্ণিমার চাঁদ কোন রাশির কোন নক্ষত্রে থাকে তাহা আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিশেষ করিয়া লক্ষ করিতেন এবং যে নক্ষত্রে দাঁড়াইয়া চাঁদ পূর্ণিমা দেখাইত তাহারই নাম অনুসারে সেই মাসের নামকরণ করিতেন। যে মাসটিকে আমরা বৈশাখ বলি সে মাসে চাঁদ বিশাখা নক্ষত্রে আসিয়া পূর্ণিমা দেখায়। তাই মাসটির নাম হইয়াছে বৈশাখ।"[১১]

রায় সাহেব জগদানন্দ রায়ের এই সকল উক্তি থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি যে পূর্বে এ দেশে চান্দ্র মাস এবং তিন বৎসর অন্তর একটি মলমাসের প্রচলন ছিল। অতএব বৎসরগুলো হিজরীর মত চান্দ্র বৎসর হলেও তিন বৎসর অন্তর অন্তর মলমাসের যোগে তিন সৌরবৎসরের সমান হত। সে জন্য আকবরনামায় এ দেশে প্রচলিত বৎসরকে সৌর বৎসর এবং মাসগুলোকে চান্দ্র মাস বলা হয়েছে। আকবরের সময়ে এই মলমাস উঠিয়ে দিয়ে চান্দ্র মাসের বদলে মাসগুলোকে সৌর মাসে পরিণত করা হয়। অর্থাৎ চান্দ্র বৎসরকে প্রায় সাড়ে দশ দিন বাড়িয়ে দিয়ে চান্দ্র মাসগুলোকে সৌর মাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চান্দ্র সন ইসলামী

তবে সৌর মানে গণিত সৌর মাস ইসলামী নয়, অ-ইসলামী। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে হিজরী সনের গবেষক সুনির্মল কুমার দেব মীন লিখেছেন, "সূর্য আর চন্দ্রকে নিয়েও

আমাদের মধ্যে একটি অজ্ঞতাসুলভ একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। অনেকেই চন্দ্রকে আপন করে নিয়েও সূর্যকে পর মনে করেন। তাদের কাছে চান্দ্র মানে গণিত চান্দ্রসন ইসলামী এবং সৌর মানের সৌরবর্ষ অ-ইসলামী। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাটুকু কিন্তু শুধু এতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। কোন প্রতীক হিসেবে সূর্যকে দেখে কিংবা পতাকায় চাঁদের বদলে সূর্যকে দেখলে এরা প্রায় ক্ষেপে যেতে চান। কারণ ঐ একই, চন্দ্র ইসলামী আর সূর্য অ-ইসলামী।"১২

অধ্যায় ২

রাশিচক্র, মলমাস, দক্ষ প্রজাপতির গল্প

রাশিচক্র, সংক্রান্তি, প্রত্যেক রাশিতে সূর্যের স্থিতিকাল সমান নয়, চান্দ্র ও সৌর বর্ষে পার্থক্য, মুসলিম পর্বের ঋতু অস্থির, হিন্দু পর্বের ঋতু স্থির, হিন্দু পঞ্জিকায় ১২ রাশি ও ২৭ নক্ষত্র, মাসের নামকরণ নক্ষত্রের নামে, কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ, দিনের নামকরণ গ্রহের নামে।

রাশিচক্র-সংক্রান্তি-সৌর মাস-চান্দ্র মাস

পৃথিবীর বার্ষিক গতি থাকায় মনে হয় সূর্য যেন সারা বছর ধরে আকাশে একটি পথ পরিক্রমণ করছে। এই কাল্পনিক পথের নাম ক্রান্তিবৃত্ত বা রাশিচক্র। এই পথে চলার সময় বছরের কোন্ সময় সূর্য কোথায় থাকে তা স্থির করা দরকার। প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা লক্ষ করে দেখেন যে এই পথে বারোটি তারকামণ্ডল আছে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী সেগুলো এক একটি রাশি। সূর্য যখন এক রাশি ছেড়ে পরবর্তী রাশিতে যায় তাকে সংক্রান্তি বলে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে এক সংক্রান্তি থেকে অপর সংক্রান্তি পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান একটি সৌরমাস। সূর্য এক মাস করে একটি রাশিতে থেকে তারপর পরবর্তী রাশিতে প্রবেশ করে। প্রত্যেক রাশিতে সূর্যের স্থিতিকাল অবশ্য এক সমান হয় না। কোনটিতে ২৯ দিন, কোনটিতে ৩০ দিন, কোনটিতে ৩১ দিন আবার কোনটিতেবা ৩২ দিন হয় এবং ৩৬৫ দিনে হয় এক সৌর বৎসর।[১৩]

অপর পক্ষে এক অমাবস্যা থেকে আরেক অমাবস্যা অথবা এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়ের ব্যবধানকে চান্দ্রমাস বলে। আর চান্দ্রমাসের হিসাবে যে বৎসর গণনা করা হয়, তার নাম চান্দ্র-বৎসর। যেহেতু চন্দ্রের গতি অনুসারে চান্দ্র-মাস ও বর্ষ গণিত হয়ে থাকে সেহেতু ভোরবেলায় চন্দ্রের সংক্রমণ (সংক্রান্তি) হলে ৩৫৪ দিনে এবং রাতে হলে ৩৫৫ দিনে চান্দ্রবৎসর ধরা হয়।[১৪] কাজেই সৌর বৎসরের তুলনায় চান্দ্র বৎসর প্রায় ১১ দিন কম হয়।

শাবনমিতি

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই উৎসব-অনুষ্ঠান পালা-পার্বণের তারিখ চান্দ্রমাসের হিসেবে ঠিক করা হয়। এ জন্য দেখা যায় যে মুসলমানদের পরব প্রতি বছরই এগার দিন করে এগিয়ে আসে। ফলে মুসলমানদের একই পরব কোন বছর হয় গ্রীষ্মে আবার কোন বছর হয় শীতে। কিন্তু হিন্দুরা প্রতিটি পরব নির্দিষ্ট ঋতুতে পালন করার পক্ষপাতী। হিসেব অনুসারে ৩২ সৌরমাস প্রায় ৩৩ চান্দ্রমাসের সমান। এই ব্যবধান দূর করার জন্য হিন্দুদের ও বৌদ্ধদের পঞ্জিকায় অতিরিক্ত চান্দ্রমাসটিকে মলমাস নামে গণনার বহির্ভূত ধরা হয়। দুই অমাবস্যাযুক্ত রবিসংক্রান্তিবর্জিত মাসের নাম মলমাস। মলমাসে হিন্দুদের ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ। সৌর সনের সঙ্গে চান্দ্র সনের এই মিল করাকে বলে শাবনমিতি।[১৫] এই জন্য হিন্দুদের পূজা-পার্বণের তারিখ মুসলমানদের মত ক্রমাগত এগিয়ে যেতে পারে না। বরাবরই নির্দিষ্ট ঋতুতেই সীমাবদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য যে পূর্বে হিজরী সনেও মল মাসের প্রচলন ছিল। কিন্তু দশম হিজরী সনের পর থেকে হিজরী সন গণনা রীতিতে মলমাস গণনা রহিত ও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় এবং চাঁদ দেখেই হিজরী সনের চুলচেরা হিসেব রাখা হয়।[১৬]

মাসের নামকরণ যেভাবে হয়

হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে রাশিচক্রে ১২টি রাশি ও ২৭টি নক্ষত্র আছে। এই ১২টি রাশির নাম যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। চাঁদ সাতাশ দিনে এই ১২ রাশি ও ২৭ নক্ষত্র একবার করে ঘুরে আসে। সূর্যের এই রাশিচক্রের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে এক বৎসর। মাসের নামকরণের সঙ্গে এই রাশিচক্রের নক্ষত্রের নাম জড়িত রয়েছে। কেননা পূর্ণিমায় চাঁদ রাশিচক্রের যে নক্ষত্রের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা দেখায় তার নাম অনুসারে মাসের নামকরণ করা হয়। যেমন আমরা বৈশাখ সেই মাসকেই বলি যে মাসে চাঁদ রাশিচক্রের বিশাখা নামক নক্ষত্রের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা দেখায়। এভাবে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নামে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ার নামে আষাঢ় ইত্যাদি মাসের নামকরণ হয়েছে।

নক্ষত্র ও হিন্দু পুরাণের গল্প

তবে নক্ষত্র বলতে কিন্তু এখানে সাধারণ তারা বোঝায় না। কতগুলো তারা নিয়ে একটি রাশিচক্র গঠিত হয়। তার চেয়ে কিছু অল্পসংখ্যক তারা নিয়ে এক একটি নক্ষত্র গঠিত হয়। সমগ্র রাশিচক্রকে ২৭টি সমান ভাগে ভাগ করলে যে বৃত্তাংশ হয় তাকেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে নক্ষত্র নামে অভিহিত করা হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে ১২টি রাশি নিয়ে যে রাশিচক্র হয় তার মধ্যে ২৭টি নক্ষত্র অবস্থান করে এবং প্রত্যেকটি নক্ষত্রের ভাগে পড়ে

সোয়া দুটি তারা। অর্থাৎ ১২ রাশি ও ২৭ নক্ষত্র মিলে রাশিচক্র পূর্ণ হয়। হিন্দুদের পুরাণে এই ২৭টি নক্ষত্র সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে। গল্পটি এই রকম :

> দক্ষ প্রজাপতির ২৭টি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। এই ২৭টি কন্যার নাম যথাক্রমে অশ্বিণী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তরভাদ্রপদা এবং রেবতী। দক্ষ রাজা মেয়েদের বিয়ের জন্য উপযুক্ত বরের সন্ধান করে একমাত্র চন্দ্রদেব ছাড়া অন্য বরের সন্ধান পেলেন না। তাই অনন্যোপায় হয়ে চন্দ্রদেবের সঙ্গেই তার ২৭ কন্যার বিয়ে দিলেন। ফলে চন্দ্রদেব পড়লেন বিপদে। একা এক স্বামী এই ২৭ স্ত্রীর ঘর সামলাবেন কেমন করে? মাথায় তার বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি স্থির করলেন ১২ রাশিচক্রের মধ্যে তিনি তার ২৭ সুন্দরী স্ত্রীকে এমনভাবে ঘর বেঁধে দেবেন যেন প্রতি মাসে অন্তত একবার করে তাদের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ দিয়ে আসতে পারেন। সেই ব্যবস্থা মত চাঁদ স্বামী আজও রাশিচক্র পাড়ি দিয়ে তার প্রিয়তমা পত্নী অশ্বিণী-ভরণী-কৃত্তিকাদের মাসে অন্তত একবার করে দেখা দিয়ে এসে তিন দিন বিশ্রাম করেন।

তিথি-শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষ

চাঁদের এই রাশি পরিক্রমণকেই আমরা মাস নামে অভিহিত করি। এই মাস চান্দ্র মাস। এক চান্দ্র মাসে ৩০টি তিথি থাকে। এই তিথিগুলোর মধ্যে অমাবস্যার পর প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা এই ১৫টি তিথি নিয়ে হয় শুক্লপক্ষ। শুক্লপক্ষের পরেই দেখা দেয় কৃষ্ণপক্ষ। পূর্ণিমার পর প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত ১৫টি তিথি নিয়ে হয় কৃষ্ণপক্ষ। তিথিগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি চান্দ্র দিন বলা যায় এবং এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা কিংবা এক অমাবস্যা থেকে আরেক অমাবস্যা পর্যন্ত সময়ের নাম চান্দ্র মাস। তিথিকে একটি দিন হিসেবে ধরা হলেও আসলে তিথি ২৪ ঘণ্টার দিন থেকে সামান্য একটু ছোট হয়। তাই ৩০টি তিথি একত্রে সাড়ে ঊনত্রিশ দিনমাত্র হয়। এক সৌর বৎসরে যেখানে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা হয়, এক চান্দ্র বৎসরে সেখানে হয় ৩৫৪ দিন ৯ ঘণ্টা। অর্থাৎ চান্দ্র ও সৌর বৎসরের হিসেবে প্রতি বৎসরে ১০/১১ দিনের ব্যবধান থাকে।[১৭]

গ্রহ-উপগ্রহের নামে দিনের নামকরণ করা হয়

আমাদের দেশে মাসগুলোর মত দিনগুলোর নামের সঙ্গেও জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ যোগ আছে। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যেমন নক্ষত্রের নামে মাসের নামকরণ

করেছিলেন, সপ্তাহের দিনগুলোর নামকরণের বেলাতেও তেমনি গ্রহ-উপগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন। যেমন আমাদের সপ্তাহের দিনগুলোর নাম যথাক্রমে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনির মত সূর্য এবং চন্দ্রকেও (রবি ও সোম) তারা গ্রহ বলে মনে করেন এবং তাদের নামেই আমাদের সপ্তাহের দিনগুলোর নামকরণ করেন।[১৮]

অধ্যায় ৩

আকবরের ইলাহী সন ও নওরোজ

সম্রাট আকবরের দীন ইলাহী ও সন ইলাহী প্রবর্তন, পণ্ডিত ফতেউল্লা সিরাজী, নওরোজ, ইলাহী সনের মাসের নামকরণ।

আকবরের ইলাহী সন ও রাজজ্যোতিষী ফতেউল্লাহ সিরাজী

আমরা সকলেই জানি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সর্বভারতীয় জাতি গঠনের লক্ষ্যে মহান সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি অভিনব সমন্বয়বাদী ধর্ম প্রচার করেন। নাম দেন এর তৌহীদ-ই-ইলাহী বা দীন-ই-ইলাহী। তিনি ইলাহী মুদ্রারও প্রচলন করেন। মুদ্রা থেকে ইসলামী কালিমা তুলে দেন। মুদ্রা ও শিলালিপিতে আরবী ভাষার বদলে ফারসী ভাষা প্রবর্তন করেন। তিনি আরবী চান্দ্র মাসের পরিবর্তে পারস্যের অনুকরণে সৌর মাস গণনা করেন এবং এর নাম দেন তারিখ-ই-ইলাহী বা সন ইলাহী।[১৯]

ইলাহী সনের উদ্ভাবন সম্পর্কে জানা যায় সম্রাট আকবর বিজ্ঞ রাজ জ্যোতিষী ও পণ্ডিত আমীর ফতেউল্লাহ শিরাজীর ওপর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করেন ৯৯২ হিজরী সনে। ফতেউল্লাহ পূর্বতন হিজরী সনের মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন বা পরিবর্তন না করে তারই ওপর ভিত্তি করে ইলাহী সন প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ তিনি আকবর বাদশাহের সিংহাসন আরোহণের সময় ৯৬৩ হিজরীকে ইলাহী সনের ৯৬৩ বৎসর ধরে তার পর এক এক সৌর বৎসর অন্তর ৯৬৪, ৯৬৫ এই হিসেবে গণনার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয় প্রবর্তিত সনটি পূর্বতন সকল সনের প্রাসঙ্গিক দুর্বলতা মুক্ত এবং অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ হিজরী সনের চান্দ্রমাসগুলো সৌর মাসে পরিণত হয় এবং মল মাসগুলো উঠে যায়। এ ছাড়া হিজরী সনের ওপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একাধারে ইসলাম ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মোগল সম্রাটের রাজকীয় ঐতিহ্য ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাটের নির্দেশনামা জারি হয় হিজরী ৯৯২ সালের ৮ই রবিউল

আউয়াল মুতাবিক ১০ই মার্চ, ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং তা কার্যকরী হয় ৯৬৩ হিজরীর ২৮শে রবিউল আখের মুতাবিক ১০ই অথবা ১১ই মার্চ, ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। দিনটি সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের স্মারক হলেও সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের দিন ছিল না। সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের দিন ছিল ২রা রাবিউল আখির মুতাবিক ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ।

নওরোজ

আরও উল্লেখ্য যে ইলাহী সনের প্রথম দিনটি প্রাচীন পারস্য সনের অনুকরণে নওরোজ বা নতুন দিন হিসেবে গৃহীত হয় এবং ইলাহী সনের মাসগুলো পারস্য সন থেকে নেয়া হয়। পারসিক আদর্শ গৃহীত হওয়ায় এই দিনটিকেও নওরোজ এবং বিশেষ উৎসবের দিন বলে গ্রহণ করা হয়।[২০] ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায়— "The ancient kings of Persia, and following them the Muslim rulers of that country as well as the Mughal sovereigns of India, used to observe the day when the Sun enters the Aries as a time of rejoicing, because it was the New Year's Day of the Zoroastrian calendar (1st of Farwardin) and the traditional date of the accession of mythical King Naushirwan. A sort of Carnival was held on the occasion at Court and throughout the empire. But the common people looked upon the day as one of special sanctity and religious significance, like the two Ids of the Muslim Calendar. This was an innovation on the Orthodox Practice of Islam."[২১]

পারস্য সনের নওরোজ থেকে ইলাহী সন গণিত হয়

পারস্য সনের আদর্শে গৃহীত বলে সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের দিন না ধরে ২৬ দিন এগিয়ে গিয়ে পারস্য সনের প্রথম দিন থেকে ইলাহী সন গণনা শুরু করা হয়। এই বিষয়ে আকবরনামায় লিখিত আছে "সিংহাসনে আরোহণ করার ২৫ দিন পরে ষষ্ঠবিংশতি দিবসে ২৮শে রাবিয়াস সানি থেকে এলাহী সনের নতুন বৎসর গণনা আরম্ভ হয়।" যেদিন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করেন সে দিন থেকে এলাহী সনের গণনা আরম্ভ না হয়ে তার ২৫ দিন পরে আরম্ভ হল কেন? এর উত্তর এই যে ঐ সময়ে প্রচলিত পারস্য সনের বৎসর শেষ হতে ২৫ দিন বাকি ছিল। এই ২৫ দিন অন্তে পারস্য সনের প্রথম তারিখ থেকে পারস্য সনের মাসগুলো নিয়ে ইলাহী সনের যাত্রা শুরু হয়। এর ফলে সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণের দিন না হলেও সিংহাসনে আরোহণের মাস ও বৎসরকে অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয়।[২২]

ইলাহী সনের মাসের নাম পারস্য দেশীয়

ইলাহী সনের মাসের বিন্যাস করা হয় পারস্য গুরগানী পদ্ধতিতে। ফলে ইলাহী সনের মাসগুলোর নাম হয় পারস্য দেশীয় যথা ফারওয়ারদীন, আর্দিবিহিশ্‌ত, খুরদাদ, তীর, মুরদাদ, শাহরীয়ার, মিহির, আবান, আজার, দে, বাহমান এবং ইসপন্দর।[২৩] এভাবে দেখা যায় যে সম্রাট আকবর তার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে যুক্ত করে ইলাহী সন নামের এই সর্বভারতীয় সৌর-সনটি প্রবর্তন করেন।

অধ্যায় ৪

বাংলা সন আকবর প্রবর্তন করেন নি

বাংলা সন ইলাহী সনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হলেও এক নয়, বাংলা সন হিজরী সন ও ফসলী সন থেকেও আলাদা, বাংলা সন সম্রাট আকবর প্রবর্তন করেন নি।

বাংলা সন ও ইলাহী সন এক নয়

আবার বাংলা সনও আমরা দেখি সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে যুক্ত এবং ইলাহী সনের আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত। তবে কি বাংলা সন সম্রাট আকবর প্রবর্তিত ইলাহী সনেরই নামান্তর মাত্র ? এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক আবু তালিব বলেন, "বাংলা যেমন হিজরী সন নয়, তেমনি এটি ইলাহী সন থেকেও ভিন্ন। হিজরী সনের ওপর ভিত্তি করা হলেও এর গঠন পদ্ধতি ভারতীয় শকাব্দের মত, অথচ এটি শকাব্দেরও সমগোত্রীয় নয়। শকাব্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক এইটুকু যে এর মাস ও দিনের নাম শকাব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। মোবারক আলী খান সাহেবের ভাষায় তাই বলা যায় বাংলা সন পুরাণ কাহিনীর Mermaid নামক সেই জন্তুটির মত যার দেহের নিম্নাংশ মাছের মত এবং উর্ধ্বাংশ ঠিক যেন স্ত্রী লোকের মত। বাংলা সনও তাই। তার ভিত্তি হিজরী সনের (চান্দ্র সন) উপর অথচ আকৃতি শকাব্দ শ্রেণীর সৌর সনেরই মত।"[২৪] এছাড়া বাংলা সন ও ইলাহী সনের মধ্যে অন্যান্য যে সকল অমিল দেখা যায় তা এই ঃ

১। ইলাহী সনের মাসগুলোর নাম পারস্য দেশীয়। দিনগুলোর নাম আরবী।[২৫] পক্ষান্তরে বাংলা সনের মাসগুলোর নাম ভারতীয় এবং ভারতীয় দেবতাদের নামে। দিনগুলোর নামও তাই।[২৬]

২। ইলাহী সনের আরম্ভ মার্চ মাসের মধ্যভাগে অর্থাৎ পারসী পঞ্জিকার ফারওয়ারদিন মাসের ১লা তারিখে যেদিন পারস্য সম্রাট শাহ নৌশেরোয়াঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২৭] বাংলা সনের আরম্ভ ইংরেজি এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে[২৮] অর্থাৎ বৌদ্ধ

ধর্মের প্রবর্তক মহামানব গৌতম বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত পবিত্র বৈশাখ মাসে।[২৯]

৩। ইলাহী সনের নববর্ষের নাম নওরোজ।[৩০] বাংলা সনের নববর্ষের নাম পয়লা বৈশাখ।[৩১]

৪। হালখাতা ও পুণ্যাহ অনুষ্ঠান বাংলা নববর্ষের দুটি সার্বজনীন আচরণীয় রীতি।[৩২] পক্ষান্তরে ইলাহী সনের নওরোজের সঙ্গে অনুরূপ আচরণীয় কোন রীতি নেই।[৩৩]

৫। ইলাহী সন দীর্ঘ দিন টিকে থাকে নি। কয়েক বছরের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৩৪] পক্ষান্তরে বাংলা সন শুধু টিকেই থাকে নি উপরন্তু বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও কৌমপ্রধান বাঙালী সমাজকে দিয়েছে জাতীয় চেতনা, ঐক্য ও গৌরব বোধের এক বিশেষ শক্তি।[৩৫]

সুতরাং 'বাংলা সন' ইলাহী সনের নামান্তর নয়।

বাংলা সন ও ফসলী সনও এক নয়

পুনরায় প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলা সন কি সম্রাট আকবর প্রবর্তিত ফসলী সনের সঙ্গে অভিন্ন ? আমরা জানি সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে ফসলী সন নামে একটি সন প্রবর্তন করেন। তৎকালীন নিয়ম অনুসারে ফসলের মাধ্যমেও রাজকর পরিশোধ করা হত। এই সন প্রতিষ্ঠাকালে ফসলের মৌসুমের দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছিল বলে একে ফসলী সন বলা হয়। এই সন ইলাহী সনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৬] বঙ্গদেশে এই সনের প্রথম মাস ধরা হয় অগ্রহায়ণ মাসকে, কারণ অগ্রহায়ণ মাস বাঙালী কৃষকের প্রধান ফসল ধান কেটে ঘরে তোলার সময়।[৩৭] প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে দক্ষিণ ভারতে ফসলী সনের বর্ষসংখ্যা বাংলা সন থেকে ৩ সংখ্যা অধিক এবং আরম্ভকাল আষাঢ়।[৩৮] দেখা যায় বঙ্গদেশে ফসলী সনের প্রথম মাস অগ্রহায়ণ। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বাংলা সনের প্রথম মাস অগ্রহায়ণ নয়। বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ। সুতরাং ফসলী সন ও বাংলা সন এক নয়। তারা পরস্পর থেকে আলাদা।

আকবর বাংলা সনের প্রবর্তক নন

প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলা সন কি সম্রাট আকবর প্রবর্তন করেছিলেন? সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এই সন যে সম্রাট আকবর প্রবর্তন করতে পারেন না তার অনেক প্রমাণ দেয়া যায়। কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ হলো ঃ

১। মোগল সম্রাট আকবর তার সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ বা সুবায় বিভক্ত করেন। আমাদের এই বঙ্গদেশের নামকরণ করেন 'সুবে বাঙ্গালাহ'। সম্রাট প্রতিটি

সুবায় একই ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "He (Akbar) decided to divide his empire into twelve provinces, called Subahs, and give to each the same type of regular administration, under the same necessary classes of officers with division of functions in specialised departments."[৩৯] এমতাবস্থায় সম্রাট আকবর যদি সুবে বাংলার জন্য বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ প্রবর্তন করতেন, তাহলে মোগল সাম্রাজ্যের বাকী সুবাগুলোতেও বঙ্গাব্দের মত সমান্তরাল উড়িষ্যাব্দ, বিহারাব্দ, গুজরাটাব্দ ইত্যাদি থাকার কথা ছিল। কিন্তু তা নেই।[৪০]

২। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুলতান দাউদ খান কররানীকে পরাজিত ও নিহত করে সম্রাট আকবর নামেমাত্র সুবে বাংলা জয় করেন। কিন্তু কার্যত কিংবদন্তীর বারোভুইয়ারা এই দেশকে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত করে স্বাধীনভাবে শাসন করেন। এই বিদ্রোহী প্রধানদের বিশেষ করে বিক্রমপুরের ইসা খান-মুসা খান[৪১], শ্রীপুরের চাঁদ রায়-কেদার রায়[৪২], যশোরের প্রতাপাদিত্য এবং শ্রীহট্টের খাজা উসমানকে যুদ্ধে যুদ্ধে দমন-দলন করে মোগল শক্তি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এসে ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা বাদে ব্রহ্মপুত্রের এপার অবধি নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।[৪৩] সুতরাং দেখা যায় যে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ ছিল খুবই অশান্ত।[৪৪] সময় কেটেছে সম্রাটের যুদ্ধবিগ্রহে, রাজ্যজয়ে ও ক্ষমতা সুদৃঢ়ীকরণে। এখানে নতুন কার্যক্রমে খুব মনোনিবেশ করার সময় আকবরের ছিল না। থাকার কথাও নয়। এই বিষয়ে যদুনাথ সরকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "It was only in the reign of Jahangir that Mughal administration really started in Bengal, because Akbar's time and the first eight years after Jahangir's accession were the age of conquering generals, when the province was not yet ready to accept and work a settled civil government. It was only Islam Khan's success in crushing out – and not, as under his predecessors, merely defeating in skirmishes – the old heads of local rebellion, that made regular peaceful Mughal rule in this province possible. Though Bengal had been included among the eleven subahs to which Akbar in November 1586 sent out orders for setting up his new type of uniform provincial administration, the order took a quarter of a century to be actually enforced."[৪৫]

আমরা সকলেই জানি, সন বা পঞ্জিকা সংস্কার একটি বৈপ্লবিক বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। রাজ্যে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করেই পঞ্জিকা সংস্কার, প্রচলিত সনের ত্রুটি দূর বা নতুন সন প্রবর্তন করেন রাজা-বাদশাহ-শাসকরা।[৪৬] সুতরাং সম্রাট আকবরের আমলের

বঙ্গদেশের এহেন অশান্ত ও নৈরাজ্যকর পরিবেশ কোনক্রমেই বাংলা সনের মত এমন একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর সন প্রবর্তন উপযোগী সময় হতে পারে না।

৩। সম্রাট আকবরের আমলে ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মোগলেরা নামেমাত্র বাংলার অধিকার লাভ করে। কিন্তু অধিকার লাভ করলে কী হবে, সম্রাট আকবরের কোন আগ্রহ ছিল না বাঙালীর জীবন-জীবিকার প্রতি। এই বিষয়ে ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন, "১৫৭৫ সনে আকবর জয় করে নিলেন বাংলাদেশ। তেরো নদীর ওপারের বাদশাহর রাজত্ব ও রাজস্বে যত আগ্রহ ছিল তার কণা পরিমাণও ছিল না বাঙালীর জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থায় উৎসাহ।"[৪৭] অতএব সম্রাট আকবর বাঙালীর ব্যবহারের জন্য বাংলা সনের মত একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর নতুন সন প্রচলন করেন তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

৪। আমরা জানি, বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভাশুভের সময় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। প্রতিটি শুভকর্মের জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ মাস, নক্ষত্র, বার ও যোগের প্রয়োগ যা ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয়।[৪৮] দেখি বাঙালী হিন্দুরা তাদের পূজা-পার্বণ, ব্রত-উপবাস, শ্রাদ্ধ-শান্তি সবই বাংলা সনের হিসেবে করে থাকে।[৪৯] আকবর বাদশাহের মত কোন মুসলমান বাদশাহ কর্তৃক বাংলা সন প্রবর্তিত হলে বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায় তা মেনে নিয়ে (হিন্দু ঐতিহ্যবাহী বহুল প্রচলিত শকাব্দ বা বিক্রমাব্দের বদলে)[৫০] তার সঙ্গে তাদের ধর্মকর্মের সংযোগ সাধন করবেন, তা কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে দীন-ই-ইলাহীর অনুসারীদের কথা স্মরণ করা যায়। একমাত্র বীরবল ব্যতীত অন্য কোন হিন্দু আকবর প্রবর্তিত এই দীন-ই-ইলাহী গ্রহণ করেন নি। এমনকি ভগবান দাস, টোডরমল ও মানসিংহ এই ধর্ম গ্রহণে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানান। জৈন, অগ্নিউপাসক ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধিও দীন-ই-ইলাহী গ্রহণ করেন নি। দীন-ই-ইলাহী প্রজাদের মনে কোন রেখাপাতই করে নি। সম্রাট আকবরও এর প্রচারে সচেষ্ট হন নি।[৫১] এমতাবস্থায় বাংলা সন সম্রাট আকবর প্রবর্তন করলে তার সঙ্গে হিন্দুরা তাদের ধর্মকর্মের সংযোগ সাধন করবেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৫। সম্রাট আকবর যদি সুবে বাংলার জন্য বাংলা সনের মত উন্নত ধরনের, বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর কোন আলাদা সন প্রবর্তন করতেন তাহলে সম্রাটের সভাসদ ঐতিহাসিক আবুল ফজল তার বিখ্যাত গ্রন্থ আকবরনামা বা আইন-ই-আকবরীতে তা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। কিন্তু আকবরনামা বা আইন-ই-আকবরীতে বাংলা সনের কোন উল্লেখই নেই।

অতএব উপরোক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা বাংলা সনের গবেষক গোলাম মুরশিদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি যে সম্রাট আকবরের আমলে বাংলা সন প্রবর্তিত হয় নি।[৫২] তাহলে কখন হয়েছে? হয়েছে পরবর্তীকালে।

অধ্যায় ৫

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দলিলপত্রে বাংলা সনের উল্লেখ, কিংবদন্তীর মহানায়ক কে এই মহারাজা বল্লাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার দলিলপত্রের লিপিকাল সদর সনে অর্থাৎ বাংলা সনে উল্লিখিত, যা ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক, জনশ্রুতিতে দ্বিতীয় বল্লাল সেন বাংলা সনের প্রবর্তক, বিভিন্ন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বল্লাল সেন।

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে দলিলপত্রে বাংলা সনের উল্লেখ

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুঁথিশালায় কিছু দলিলপত্রের পাঠোদ্ধার হয়েছে যার সময়কাল খ্রিষ্টীয় সতের শতক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সব দলিলপত্রের মধ্যে অধিকাংশ পত্রের লিপিকাল সদর সন বা বঙ্গাব্দে উল্লেখ আছে। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে গবেষক দেলওয়ার হাসান লিখেছেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে সংরক্ষিত সতের শতকের পুঁথিগুলোর অধিকাংশই বাংলা ভাষায় রচিত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলো ভূমি উৎসর্গপত্র, ব্রহ্মোত্তরপত্র, মনুষ্য বিক্রয়ের দলিল, খারিজপত্র, কর্জপত্র, স্মারকপত্র, পাট্টা কবুলিয়তপত্র, ব্যক্তিগত পত্র, ভূমি বিক্রয়পত্র, অঙ্গীকারপত্র, আবেদনপত্র, খারিজ জমা ভূমি বিক্রয়পত্র ইত্যাদি শিরোনামে বিভাজন করা চলে। অধিকাংশ পত্রের উৎসস্থল শ্রীহট্ট, সরকার বাজুহা, ময়মনসিংহের শাহজিয়াল পরগনা, ঢাকার জাফরগঞ্জ, মকিমাবাদ ও সুবর্ণগ্রাম। উল্লিখিত পত্রগুলোতে এসব অঞ্চলের সতের শতকের প্রচলিত ও ব্যবহৃত বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। পত্রগুলোর ভাষা বাংলা হলেও ফারসী ও আরবী শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। দু'-একটি পত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কোন কোন পত্রে আবার ফারসী ভাষার সিলমোহর রয়েছে। দলিলপত্রগুলোতে প্রশাসনিক একক হিসেবে সাকিন (গ্রামের নাম), মৌজা, তপ্পা, পরগণা ও সরকারের নামোল্লেখ আছে। তবে পত্রগুলোর লিপিকাল হিসেবে পরগনাতি সন ও সদর সন বা বঙ্গাব্দের

ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায়, সতের শতকের পূর্ববাংলার দৈনন্দিন জীবনে ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও বঙ্গাব্দের ব্যবহারের প্রাধান্য ছিল। পরগনাতি সন গণনা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এ সনের সঙ্গে ১২০১ যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সে হিসেবে শ্রীহট্ট, ঢাকা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রাপ্ত সতের শতকের পত্রগুলোর লিপিকাল দাঁড়ায় ১৬৩৮ থেকে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।"[৫৩]

গ্রামীণ জীবনে বাংলা সনের প্রভাব সর্বব্যাপী

আমরা দেখতে পাই, গ্রাম বাংলার সামাজিক জীবনে বাংলা সনের প্রভাব সর্বব্যাপী। সেখানে এখনও জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের ক্ষেত্রে দিন-তারিখের হিসাব হয় বাংলা সন অনুযায়ী। কৃষক ফসল বোনে, ফসল তোলে বাংলা তারিখের হিসেবে। তাতী-কামার-কুমার-জেলের দেনা-পাওনা শোধ সব ক্ষেত্রেই বাংলা সন-তারিখ রয়েছে কার্যকর। বাঙালী হিন্দুর পূজা-পার্বণ, ব্রত-উপবাস, শ্রাদ্ধ-শান্তি ইত্যাদি সকল অনুষ্ঠানই বাংলা সন-তারিখের হিসাবে হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত বাঙালীর বর্ষশেষ চৈত্রসংক্রান্তির চড়ক উৎসব, বর্ষশুরু পয়লা বৈশাখের নববর্ষ উৎসব এবং এই উৎসবের অনুষঙ্গ হালখাতা ও পুণ্যাহ অনুষ্ঠানও বাংলা সন-তারিখের হিসেবেই হয়। সুতরাং এখান থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে এ দেশের মানুষের পালা-পার্বণ-আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্রের হিসাব অনুযায়ী পালনের সুবিধার্থে সম্রাট আকবরের পরবর্তীকালে এ দেশেরই কোন প্রজাহিতৈষী ও কীর্তিলিপ্সু হিন্দু বা হিন্দুভাবাপন্ন রাজা বা রাজপুরুষ একটি সমন্বয়বাদী সন হিসেবে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।

এমতাবস্থায় স্বভাবতই জিজ্ঞাসা, আকবর বাদশাহ যদি বাংলা সনটি প্রবর্তন না করে থাকেন তাহলে কে সেই প্রজাহিতৈষী ও কীর্তিলিপ্সু হিন্দু বা হিন্দুভাবাপন্ন রাজা বা রাজপুরুষ যিনি সম্রাট আকবরের আমলের পরবর্তীকালে এই অভিনব বাংলা সনটি প্রবর্তন করলেন এবং এর সঙ্গে বাঙালীর পূজা-পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠান পালনের দিন-ক্ষণ অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে দিলেন?

বাংলা সনের উদ্ভাবক কে এই কিংবদন্তীর মহানায়ক বল্লাল

এই প্রশ্নের উত্তরে একটি জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, যে হিন্দুভাবাপন্ন রাজা বা রাজপুরুষ বাঙালীর পূজা-পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠান দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র অনুযায়ী পালনের সুবিধার্থে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন, তিনি ছিলেন বিক্রমপুরের বিখ্যাত রাজা কাহিনী কিংবদন্তীর মহানায়ক নবাব বল্লাল সেন। এই মহারাজা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ব্রাড্‌লী বার্ট লিখেছেন, "After Adisur reigned Ballal Sen, the most famous of the Sena Kings in Vikrampur, round whose name gather almost all the traditions still linger in Rampal...While one story makes him the son of King

Adisur.....another places him at the end of a long line of kings with whose death the kingdom fell into the hands of the Musalman invaders."[৫৪]

এখন প্রশ্ন, কে এই কাহিনী-কিংবদন্তীর মহানায়ক মহারাজা বল্লাল সেন?

কাহিনী-কিংবদন্তীর মহানায়ক এই বল্লাল সেনকে বিভিন্ন গ্রন্থে দ্বিতীয় বল্লাল সেন নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই মহারাজা দ্বিতীয় বল্লাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "Now such a story can not be true of Vallala Sena, as the Muslims never approached Vikrampur or Rampal during his reign. So it has been taken to refer to Vallala Sena II, who is mentioned as having ruled in 1312 A.D. in a text called Viprakalpa-Latika. But the account specially the date and genealogy contained in this book can hardly be relied upon."[৫৫] এই কীর্তিমান মহারাজা সম্বন্ধে বিমল কুমার দত্ত বলেন, "On the bank of the Brahmaputra near Mograpara the remains of a Ratha made of stone is still existing. It is said that Maharaja Ballal Sen II constructed the Ratha. On the day of Rathayatra festival 100 Brahmins used to pull the car which was finally destroyed by one converted Muslim by the name Kalu."[৫৬] বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেন, "বাঙ্গালাদেশে বল্লাল সেনর মত পরিচিত কোন হিন্দু রাজা নাই। বল্লালের ইতিহাস বাদ দিলে বঙ্গের হিন্দুর ইতিহাসে কিছু থাকে না। আর সেই বল্লালী ইতিহাসের নির্যাস এই আভিজাত্য (কৌলিন্য)।"[৫৭] এই রাজা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, "বল্লাল সেন হিন্দু সমাজকে নূতনভাবে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ...এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সামাজিক আচার-ব্যবহার-বিবাহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে কুলীন শ্রেণীর লোকদিগকে কতগুলি বিশেষ রীতিনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইত। ন্যায়পরায়ণতা, জাতিগত পবিত্রতা, সততা প্রভৃতি সদগুণের বৃদ্ধি করাই ছিল এই সকল রীতিনীতির মূল উদ্দেশ্য। বল্লাল সেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই ধর্ম প্রচারের জন্য তাহার চেষ্টার অন্ত ছিল না এবং এই জন্য তিনি মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা ও নেপালে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।"[৫৮] মহারাজা বল্লালের কৌলিন্য প্রথার বিষয়ে ঐতিহাসিক শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত বলেন, "বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন ও বিশ্বরূপ সেন-এর তাম্রশাসনসমূহে তাম্রশাসনগ্রাহী ব্রাহ্মণগণের উল্লেখকালে বল্লাল সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আভিজাত্যের কোন কথাই নাই। বল্লাল সেন যদি গৌড় বঙ্গীয় সমাজে এরূপ কোন নূতন বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া থাকিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার কথা তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ হইত। হয়ত বল্লাল সেনের ১১শ' রাজ্যাঙ্কের পরে এই নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু তাহা হইলে লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন চতুষ্টয়ে এবং কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? ... কৌলিন্য প্রথা সম্ভবত মোসলমান বিজয়ের বহু শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।"[৫৯] এই প্রসঙ্গেই ড. জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, "It is probable,

however, that the occurences of a later age have been embellished by the traditions of an earlier age and that the present organisation of this great tribe (Kayath) was the work of a reformer who lived long after the reigns of Adisur and Ballal Sen."[৬০] ড. ওয়াইজ আরো লিখেছেন, "আব্দুল্লাপুরে হিন্দু সৈন্য মোসলমানদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং রাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেন যুদ্ধে নিহত হন।"[৬১] এই মহারাজা বল্লাল সম্পর্কে ড. এ. এইচ. দানী লিখেছেন, "The bridge of Taltola is wrongly attributed to Ballal Sen. Its construction is typically of the Muslim period ...At Mirkadim (Abdullapur) there is a strong bridge of masonry spanning the Mirkadim Khal. It is also wrongly attributed to Ballal Sen."[৬২] বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায় লিখেছেন, "মোগড়াপাড়ার অনতিদূরে পবিত্র ব্রহ্মপুত্র তটে পোড়া রাজার প্রস্তরময় রথের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে মহারাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেন প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এই রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রস্তরগুলির উপরে উৎকীর্ণ বহুবিধ চিত্র অদ্যাপি হিন্দু ভাস্কর্যের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে। প্রবাদ এই যে রথ দ্বিতীয়ার দিন একশত ব্রাহ্মণ এই প্রকাণ্ড রথটি টানিয়া স্থানান্তরিত করিত। ...কালু নামক কোনও হিন্দু ফকির মোসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিয়া এই রথের চূড়া ও কারুকার্যময় প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির বিনাশ সাধন করেন।"[৬৩] এই কীর্তিমান রাজা সম্বন্ধে আনন্দ ভট্টের 'বল্লাল চরিতম' নামক গ্রন্থে আছে, "The king was an expert in erotics and horsemanship. He was learned in the shastras and was like a second Karna in munificence. ...Then the Brahmans well versed in the Vedas and the subsidiary studies at the proper moment initiated king Vallala, son of Malhana. Like a second Karna the king desirous of prosperity, distributed gifts. He had a sword in his hand, a turban on his head and various ornaments on his person."[৬৪] ঐতিহাসিক শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায় এই রাজা সম্পর্কে লিখেছেন, "ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে দ্বিতীয় বল্লাল পূর্ব হইতেই 'পোড়া রাজা' নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধ। আব্দুল্লাপুরের ভীষণ যুদ্ধেই সুবর্ণগ্রামে আর্য্য স্বাধীনতা সূর্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত হইয়া কোনও হিন্দু নরপতি আত্মহত্যা করিবেন, ইহা কি সম্ভবপর? কোনও কারণে দগ্ধ দেহ হইয়া ২য় বল্লাল 'পোড়া রাজা' নামে ঘোষিত হইয়াছিলেন ইহাই অধিকতর সম্ভব।"[৬৫] আর প্রাবন্ধিক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, "নহ্য মূলা জনশ্রুতি, এইরূপ একটা কথা আছে। জনশ্রুতি এক মূল সাধিতে পারে, কিন্তু সেই মূলকে বিকৃত আকারে বিপথে লইয়া যাওয়াও জনশ্রুতির একটি কার্য্য। ...বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা অসম্ভব বলিয়া এবং কিংবদন্তী খুব প্রবল বলিয়া কোন কোন লেখক পরবর্তীকালের দ্বিতীয় বল্লাল সেন নামক এক রাজার উপর এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিত ব্যাপার চাপাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেখানে ইতিহাস এত বিকৃত, সেখানে এরূপ কিছু করিয়া থাকিলে, রাজার নামটাই যে বিকৃত হয় নাই এই কথা কে বলিতে পারে?"[৬৬]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই কাহিনী কিংবদন্তীর মহানায়ক ছদ্মবেশী বল্লাল সেন, যিনি মোগল সম্রাট আকবরের আমলের পরবর্তীকালে বাঙালীর ব্যবহারের জন্য প্রবর্তন করলেন সমন্বয়মূলক সন হিসেবে বাংলা সন, যার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে রয়েছে বর্ষশেষ চৈত্রসংক্রান্তির চড়ক ঘোরানো ও ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব এবং বর্ষশুরু পয়লা বৈশাখের পুণ্যাহ ও হালখাতা অনুষ্ঠান?

অধ্যায় ৬

মগ রাজা মঙ্গৎ রায়ের বংশধরদের শ্রুতি-স্মৃতি, মঙ্গৎ রায় ছিলেন নির্বাসিত মগ রাজা, নরপতির মগ রাজসিংহাসন জবরদখল

মঙ্গৎ রায় নামক শরণার্থী এক মগ রাজার বংশধরদের শ্রুতি-স্মৃতি, মঙ্গৎ রায়ের এক নাম বল্লাল সেন, মঙ্গৎ রায় ঢাকার নবাব ও বঙ্গদেশের সুবাদার ছিলেন, তার পূর্বপুরুষেরা মগদের রাজা ছিলেন, তারা মুসলমান হলেও হিন্দুদের মত পূজা করতেন, মঙ্গৎ রায় কুলীন সৃষ্টি করেন, মঙ্গৎ রায়ের অসংখ্য সুরম্য রাজপ্রাসাদ ছিল, তিনি আরং রাজার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন, মঙ্গৎ রায়ের আসল পরিচয়, তিনি ছিলেন আরাকানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা মলহন ওরফে হুসেন শাহের কনিষ্ঠ পুত্র এবং আরাকানরাজ মহাশ্রীসুধর্ম ওরফে দ্বিতীয় সেলিম শাহের অনুজ, মহাথেরী থুদম্মার রাজত্বকালে তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের ভাইসরয়, তিনি ছিলেন মোগল সাম্রাজ্যে নির্বাসিত করদ আরাকান রাজা, তিনি এবং তার অনুচরেরা মুসলমান হয়ে মুসলমানী নামের আড়ালে চলে যান, আরাকানীরা জবরদখলকারী নরপতিকে তাদের বৈধ রাজা হিসেবে মেনে নেয়নি, আরাকানীরা আজও মলহনের বংশকেই তাদের প্রাচীন আইনানুগ রাজবংশ বলে ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

মগ রাজা মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লালের বংশধরদের শ্রুতি-স্মৃতি

বিক্রমপুরের টঙ্গিবাড়ী উপজেলাধীন বেশনাল গ্রামনিবাসী সর্বজনাব আব্দুল খালেক খান, আব্দুল লতিফ খান এবং মুহম্মদ হাফেজ খান মঙ্গৎ রায় ওরফে রাজা মন্দি খান নামক এক মগ রাজার বংশধর বলে সুপরিচিত। এই বংশের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত শ্রুতি-স্মৃতি থেকে যা জানা যায় তা এই রকম ঃ

'মঙ্গৎ রায় ওরফে রাজা মন্দি খান একজন অত্যন্ত জনপ্রিয়, কীর্তিমান ও কীর্তিলিপ্সু রাজা ছিলেন। তিনি বিক্রমপুরের রাজা ছিলেন, ঢাকার নবাব ছিলেন এবং বঙ্গদেশের সুবাদার ছিলেন। তার এক নাম ছিল বল্লাল সেন। উজ্জয়িনীর বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের নামে তিনি তার রাজ্যের নামকরণ করেন বিক্রমপুর।

রাজা মন্দি খানের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন দক্ষিণ দেশের তথা ভাটির দেশের রাজা। তারা খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাদের শাসনে বাঘে-মোষে এক ঘাটে পানি খেত। তারা মগদের রাজা ছিলেন। তারা জাতিতে ছিলেন পাঠান, ধর্মে ছিলেন মুসলমান। তবে মুসলমান হলেও তারা হিন্দুদের মত বহু দেবদেবীর পূজা করতেন। এমনকি মানুষ পর্যন্ত বলি দিতেন।

শত্রু আকর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে হেরে গিয়ে মঙ্গৎ রায় অফুরন্ত সম্পদ, হাজার হাজার মগ সৈন্য আর হাতী-ঘোড়া নিয়ে ভুলুয়া পরগণার মধ্য দিয়ে বিক্রমপুরে এসে উপস্থিত হন। তিনি জঙ্গলাকীর্ণ ও পতিত বিক্রমপুর আবাদ করেন। বিশাল রামপাল-ধামারণ-কোদালধোয়ার-কেশারমার দীঘিসহ শতসহস্র পুকুর-দীঘি খনন করেন। এদের পাড় বেঁধে লোকবসতি গড়ে তোলেন। মঙ্গৎ রায় বিক্রমপুরের বিখ্যাত 'কাচকীর দরজা' সড়কসহ ছোট-বড় অসংখ্য সড়ক নির্মাণ করেন। তালতলার পুল, আব্দুল্লাপুরের পুল, পাগলার পুল, টঙ্গির পুলসহ অসংখ্য পুল তৈরি করেন। ইদ্রাকপুর ও হাজীগঞ্জ কেল্লাসহ অনেক দুর্গ নির্মাণ করেন।

মঙ্গৎ রায় মুসলমান ছিলেন। তবে মুসলমান হলেও তিনি হিন্দুদের মত বহু দেবদেবীর পূজা করতেন। এমনকি মানুষ পর্যন্ত বলি দিতেন। তিনি বিক্রমপুরের রামপালে পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ এনে এক বিরাট যজ্ঞ করেন। তাতে বিশাল ভোজের আয়োজন করে রাজা উপাধি ধারণ করেন। তিনি হিন্দু ধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নতুন নতুন পূজা-পার্বণ চালু করেন। বিক্রমপুরের বিখ্যাত 'রাজাবাড়ীর মঠ'সহ শত শত মঠ-মন্দির-মসজিদ নির্মাণ করেন। এদের চূড়া সোনার পাতে মুড়ে দেন। মঠ-মন্দিরের মধ্যে দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি মসজিদের মধ্যেও মূর্তি স্থাপন করেন।

মঙ্গৎ রায় ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ছিলেন। ব্রাহ্মণদেরকে নিষ্কর ভূমি দান করেন। তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে চাটুজ্জে-বাড়ুজ্জে-মুখুজ্জে-গাঙ্গুলী এবং কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ-বোস-গুহ-মিত্রদেরকে কৌলিন্য প্রদান করেন। প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যও তার চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য টোল-চতুষ্পাঠী ও মক্তব স্থাপন করেন।

রাজা মন্দি খান অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। তার এবং তার রাণীর বসার জন্য ছিল সোনার সিংহাসন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মঠ-মন্দির-মসজিদ-পুকুর-দীঘি-বাগানসম্বলিত তার অসংখ্য রাজপ্রাসাদ ও রাজবাড়ি ছিল। রাজপ্রাসাদ পাহারার জন্য সাতশত সশস্ত্র মগ সৈন্য দিবারাত্র নিযুক্ত থাকত।

বিক্রমপুরের রামপালের নিকটস্থ আব্দুল্লাপুরে আরং রাজার সৈন্যদের সঙ্গে মঙ্গৎ রায়ের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মঙ্গৎ রায় নিহত হন। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার রাজ্য ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ফলে তার বংশধররাও নিঃসম্বল হয়ে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যান।'

মঙ্গৎ রায় আসলে ছিলেন আরাকানের নির্বাসিত মগ রাজা

কাহিনী কিংবদন্তীর মহানায়ক এই বল্লাল সেন ওরফে মঙ্গৎ রায় আসলে ছিলেন আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'বাদশাহনামার' আরাকানরাজ মানিক তেওয়ারী যিনি আরাকান রাজসিংহাসনের জবরদখলকারী নরপতিগ্যির দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় এসে আশ্রয়প্রার্থী হন। শরণার্থী এই আরাকানরাজ মানিক তেওয়ারী ওরফে মঙ্গৎ রায় ছিলেন আরাকানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা মলহন ওরফে হুসেন শাহের পুত্র এবং আরাকানরাজ শ্রীশ্রীসুধরম ওরফে দ্বিতীয় সেলিম শাহের অনুজ। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গৎ রায় ছিলেন চট্টগ্রামে শ্রীশ্রীসুধরমের ভাইসরয়।[৬৭] আরাকানী ভাষায় এই ভাইসরয়ের উপাধি ছিল আলীমানজা, আলীমানিক বা মেংরি, যার অর্থ ফিল্ড মার্শাল বা বড় লাট।[৬৮] মঙ্গৎ রায়ের প্রকৃত নাম ছিল শ্রীধরমসা।[৬৯] চট্টগ্রামে অবস্থানরত এই বড় লাটের একটি দায়িত্ব ছিল চট্টগ্রামের ১২ জন স্থানীয় সামন্ত রাজার নিকট থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা। "Its (Chittagong's) administration was left in the hands of twelve local rajahs who paid an annual tribute to the Arakanese King's Viceroy at Chittagong."[৭০] রেওয়াজ অনুযায়ী আরাকান রাজার পুত্র, ভাই কিংবা কোন বিশ্বস্ত জ্ঞাতি চট্টগ্রামে আরাকান রাজার ভাইসরয় হিসেবে নিযুক্ত হতেন। এই বড় লাটকে সাহায্য করার জন্য আরাকানরাজ প্রতি বৎসর এক শত জাহাজ বোঝাই করে সৈন্য ও গোলাবারুদ পাঠাতেন।[৭১] "There is always some trusted relative or faithful clansman of the Rajah in charge of the Government of Chatgaon."[৭২]

আরাকানরাজ শ্রীসুধর্ম ওরফে দ্বিতীয় সেলিম সাহের প্রধান রাণী ছিলেন নাৎসিনমি। তাদের একমাত্র পুত্র ছিলেন শিশু মিনসানী। রাণী নাৎসিনমির গোপন প্রণয়ী ছিলেন শ্রীসুধর্ম রাজার মন্ত্রী ও লংগিয়েতের অধিপতি নরপতিগ্যি। এই নরপতিগ্যি ছিলেন জীবনবিনাশী কাল যাদুবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। এদের ষড়যন্ত্রের ফলে রাজা শ্রীসুধর্ম নিহত হলেন। বিধবা রাণী শিশু পুত্র মিনসানীকে শূন্য মগ রাজসিংহাসনে বসালেন। কিন্তু ২৮ দিনের মাথায় শিশু রাজা মিনসানীও নিহত হলেন।[৭৩] "In 1638 his brother, Lord of Chittagong deserted to the Mughals. The chief queen Natshinme had a paramour, the Lord of Launggyet, minister and royal kinsman, who was expert in the deadliest forms of black magic. So Thiri Thudhamma died suddenly. His only direct heir, Minsani, the little son of Natshinme, then fell ill; Natshinme nursed him, and he died."[৭৪] রাণী নাৎসিনমি শূন্য মগ রাজসিংহাসনে প্রণয়ী নরপতিগ্যিকে বসালেন এবং সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য ভূতপূর্ব রাজার জ্ঞাতিবর্গের বিরুদ্ধে গণহত্যার নির্দেশ জারী করলেন। "The queen thereupon placed her paramour on the throne as Noropatigyi (1638-45) and enforced the Massacre of the Kinsmen."[৭৫]

ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের হত্যাকাণ্ড এবং নরপতি ও নাৎসিনমির এই অন্যায়ভাবে মগ রাজসিংহাসন দখলের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চট্টগ্রামে অবস্থানরত বড় লাট শাহজাদা মঙ্গৎ রায় ওরফে ধরমসা নিজেকে আরাকানের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করলেন। "Matak rai, brother of Thiri Thudhamma declared himself independent in his Viceroyalty at Chittagong."[৭৬] জবরদখলদারদেরকে আরাকান রাজসিংহাসন থেকে উৎখাতের জন্য তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার নৌদুর্বলতার কারণে তিনি পরাজিত হলেন।[৭৭] ফলে বাধ্য হলেন পরিবার-পরিজন-অনুচরসহ মোগল বাংলার দিকে পালিয়ে আসতে। স্থলপথে তিনি ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। সীমান্ত ঘাঁটি জগদিয়ার মোগল থানাদারের নিকট ঘটনার বিবরণ জানিয়ে পত্র দিয়ে দূত পাঠালেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী নরপতির নৌবহরের আক্রমণের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানালেন। "But his attempt to oust the usurper from the throne of Arakan failed through his naval weakness, he had to flee to Bengal for safety along with his leading partisans. He marched by land towards Bhulua and wrote to the imperial thanadar of the frontier post of Jagadia for protection from the pursuing Magh fleet."[৭৮] জগদিয়ার থানাদার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকার মোগল সুবাদার ইসলাম খান মাশহাদির নিকট এই ঘটনা জানিয়ে খবর পাঠান। ইসলাম খান মাশহাদি পলায়নরত মগ রাজা মঙ্গৎ রায়কে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের জন্য জগদিয়ার থানাদার সানজার তার খান এবং ভুলুয়ার থানাদার সৈয়দ হাসানকে তাদের নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী এই দুই মোগল থানাদার সসৈন্যে আরাকান ও মোগল বাংলার সীমানা নির্দেশক ফেনী নদীর দিকে অগ্রসর হলেন। নরপতিগ্যির অনুগত নৌবাহিনীর যে দুই শত নৌযান মঙ্গৎ রায়কে মোগল বাংলার দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেয় তাদেরকে জগদিয়ার থানাদার অবিরাম গোলা বর্ষণ করে তাড়িয়ে দিলেন এবং মঙ্গৎ রায়কে ফেনী নদী পার করিয়ে নিয়ে এলেন মোগল বাংলায়। "By Islam Khan's command the thanadar of Jagadia drove away by incessant gunfire some 200 Magh Jalias which were obstructing Mangat rai and ferried him over the Feni river into Mughal territory."[৭৯]

মঙ্গৎ রায় ওরফে মুকুট রায়ের মোগলদের দলে এসে যোগদান সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। এই গৃহযুদ্ধজনিত অরাজকতার সুযোগে দশ-বার হাজার বাঙালী, যারা বিগত চল্লিশ বছর ধরে চট্টগ্রামে ফিরিঙ্গীদের অধীনে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল তারা আপন জন্মভূমিতে পালিয়ে আসতে সক্ষম হল। চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গী উপনিবেশকারী ও জলদস্যু যারা মুকুট রায়কে অভ্যুত্থানে সহায়তা করে তারাও এখন নতুন মগ রাজার প্রতিশোধের ভয়ে চট্টগ্রাম নগরী ছেড়ে পালিয়ে যায়। এদের অনেকেই পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহে গিয়ে বসবাস শুরু করে। আর অন্যেরা নিজ নিজ পরিবার-পরিজন ও নৌযান নিয়ে মোগলদের দলে এসে যোগ দেয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কালক্রমে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মিশে যায়। "The Feringi settlers and pirates of Chatgaon, who had backed Mangat rai in his abortive rising, now abandoned that city

in fear of the Magh King's vengeance. Most of them migrated to the Portuguese possessions, and a few came over to the Mughals with their families and boats ; in the course of time most of the latter embraced Islam and became merged in the local population."[৮০]

মঙ্গৎ রায়ের সদলবলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ জায়গীর ও মনসব লাভ

মঙ্গৎ রায় তার পরিবার-পরিজন, একজন পোমাজা (প্রাদেশিক গভর্নর), কিছু- সংখ্যক নেতৃস্থানীয় সমর্থক, দশ-বার হাজার আরাকানী ও মন (পেগুনীজ) অনুচর, নৌবহর ও ১৯টি হাতীর একটি বাহিনী নিয়ে ঢাকায় এসে উপস্থিত হলেন।[৮১] ঢাকায় এসে মঙ্গৎ রায় সুবাদার ইসলাম খান মাশহাদি ওরফে মীর আব্দুস সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে তিনটি হাতী উপঢৌকন দিলেন। সুবাদারও মুকুট রায়কে পাঁচ হাজার টাকা এনাম দিয়ে মনসব ও জায়গির প্রদান করলেন।[৮২]

মঙ্গৎ রায়ের নিজেকে মোগল সম্রাটের করদ রাজা বলে ঘোষণা

মঙ্গৎ রায় নিজেকে দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহজাহানের অধীনে করদ রাজা বলে ঘোষণা করলেন। "Makat Roy paid his respect to Islam Khan at Dacca, acknowledged himself a vassal of the empire and made over the sovereignty of his territory."[৮৩] তিনি বাঙ্গালার নবাবের হাতে নিজ রাজ্য আরাকানের শাসনভার সমর্পণ করে তারই অধীনতায় নিজে রাজ্য শাসন করতে থাকলেন।[৮৪] মঙ্গৎ রায় তার সমস্ত পরিবার ও অনুচর নিয়ে নবাবের নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।[৮৫] অতঃপর তাদের বসবাসের ব্যবস্থা হল ঢাকা শহরের তিন মাইল উত্তরে এক বনাকীর্ণ অঞ্চলে যা পরবর্তীকালে মগবাজার নামে পরিচিত হল।[৮৬]

মঙ্গৎ রায় সম্বন্ধে হাশেম সুফীর মন্তব্য

এই বিষয়ে ঢাকার গবেষক হাশেম সূফী বলেন, "মগটুলী মোগল আমলের প্রথম দিকের ঢাকার একটি প্রাচীন মহল্লার নাম। প্রাচীন মগটুলী মহল্লাটি গঠিত ছিল বর্তমানের কবি নজরুল কলেজ, ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক প্রধান কার্যালয়, সমগ্র ভাঙ্গাবাড়ী অঞ্চল, কুঞ্জ বাবু লেনের পশ্চিমাংশ অঞ্চলটি নিয়ে। ...ঐতিহাসিক সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর তার 'গ্লিম্পসেস অব ওল্ড ঢাকা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, চট্টগ্রামের গভর্নর মঙ্গৎ রায়ের সবংশ ও সদলবলে বসবাসের কারণে মগবাজার মহল্লাটির নামকরণ হয়েছে। উক্ত যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা মঙ্গৎ রায়ের সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন কোন ছোট প্রাচীন পাকা অট্টালিকাও সেখানে কোন দিন পাওয়া যায় নি। ১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বাংলার সুবেদার দ্বিতীয় ইসলাম খান মাশহেদীর কাছে আরাকান রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র

চট্টগ্রামের গভর্নর মঙ্গৎ রায়, ঢাকায় আত্মসমর্পণ করেন এবং সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তৎকালীন যুগে নিয়ম ছিল আত্মসমর্পণকারীর সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী তাকে মাসিক ভাতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা, জায়গিরদারী ও নিরাপত্তা প্রদান করা। আমার মতে, মঙ্গৎ রায় বসবাস করতেন মগটুলীতে, মগবাজারে নয়। কারণ মোগল যুগের নির্মাণ রীতি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাফরী ইটের তৈরী বেশ কয়েকটি প্রাচীন পাকা অট্টালিকা সেখানে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ১৮৮৫ সালের দিকে ইংরেজ সরকার মগটুলীর ভাঙ্গাবাড়ীটি ঢাকা কালেকটরেটের পদস্থ কর্মচারী জনৈক হিন্দুকে প্রদান করে। মূল ভবনটি ঠিক রেখে হিন্দুরা অন্যান্য পরিত্যাক্ত ভবনের জাফরী ইট দিয়ে দুইটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করে। ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মগটুলীর ভাঙ্গাবাড়ীটিতে কালেকটরেটের হিন্দু কর্মচারীরা একটানা ৬২ বছর বসবাস করায় ও কালেকটরেট থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে কিছু অর্থ সম্পদ আহরণ করায় অত্র অঞ্চলের অনেকের ধারণা ছিল, সেটি হিন্দু জমিদার বাড়ি। মজার ব্যাপার যে, উক্ত মগটুলী মহল্লায় মোগল বা ইংরেজ আমল তথা কোন আমলেই কোন হিন্দু মন্দির ছিল না বরং মসজিদ ছিল, যা বর্তমানে কলতাবাজার গাড়িখানা মসজিদ নামে পরিচিত। আমার মতে, উঁচু বেদীসম্পন্ন বিরাটাকার এক গম্বুজের উক্ত মসজিদটি মগ রাজপুত্র নওমুসলিম মঙ্গৎ রায় কর্তৃক নির্মিত। ভাঙ্গাবাড়ী অর্থাৎ মঙ্গত রায়ের মূল বাসভবনটিতে ছিল ইসলামী স্থাপত্যকলা-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মার্বেল পাথরের নির্মিত বহিঃঅঙ্গন ও অন্তঃঅঙ্গন চৌকোণ চত্বর এবং তার চতুষ্পার্শ্বে বহু ঘরবিশিষ্ট সুরকি-চুনার একতলা ভবন, যা আমি ছোটকালে ভাঙ্গা অবস্থায় দেখেছি।"[৮৭]

মঙ্গৎ রায় মুসলমানী নামের আড়ালে চলে যান

মঙ্গৎ রায়, তার পরিবারের সদস্য, তার একজন পোমাজা ও তার শতসহস্র আরাকানী, তৈলং ও ফিরিঙ্গী অনুচর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় স্বভাবতই তাদের মুসলমানী নাম হয়। ফলে সঙ্গত কারণেই তারা রাতারাতি পশ্চিমদেশীয় মুসলমানী নামের আড়ালে চলে যান এবং নতুন গ্রহণকরা মুসলমানী নামই হয় তাদের সরকারী নাম। এমতাবস্থায় এই বিপুলসংখ্যক নওমুসলমানকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলে ভুল করাটাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন ভুল করেছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারও। এই বিষয়ে যদুনাথ সরকারের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "The names of many of his (Shuja's) officers in Bengal suggest that they were Persians and Shias. Did they come from Persia by the now safer and more convenient sea-route directly to Bengal?"[৮৮]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ভারতে মোগল শাসনের অধীনে আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে ইরানের সাফাভী শাসকগণ কর্তৃক নির্যাতীত সুন্নী ধর্মতত্ত্ববিদ, পণ্ডিত ও কবি-সাহিত্যিকগণ পারস্য থেকে দলে দলে ভারতে আসেন এবং তাদের কেউ কেউ বাংলায়

এসে স্থায়ীভাবে বসতিও স্থাপন করেন।[৮৯] তবে এই সময়ে পারস্য থেকে দলে দলে শিয়া মুসলমানেরা এসেছিলেন ঢাকায়, এমন কোন প্রমাণ নেই। ড. এ. করিম লিখেছেন, "ইতোপূর্বে শিয়ারা বড় বেশি এই দেশে আসিতেন না। ...কিন্তু আঠার শতকের প্রথম পাদেই বাংলাদেশে শিয়াদের আগমন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।"[৯০] তাহলে ঢাকায় এই সময়ে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ঐ বিপুল- সংখ্যক পারস্যদেশীয় মুসলমান নামধারী শিয়া এলেন কোথা থেকে? এরা কি ঢাকার পারস্যদেশীয় সুবাদার ইসলাম খান মাশহাদীর নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত শরণার্থী মগ রাজা মঙ্গৎ রায় ও তার শতসহস্র মগ অনুচররা নন? উল্লেখ্য যে পৌত্তলিকদের সঙ্গে পারস্যদেশীয় শিয়া মুসলমানদের অনেকটা মিল আছে। শিয়ারা হজরত আলীকে আল্লার অবতার মনে করে। তারা অনেকে তাকে পূজা করে এবং তার বংশধরদেরকে দেবতা মনে করে।[৯১] এই পারস্যদেশীয় মুসলমানদের প্রভাব আরাকানে প্রচণ্ড। তারাই আরাকানের কেন্দ্রীয় শহর 'আকিয়াব'-এর গোড়াপত্তন করে। ফারসী শব্দ 'এক-আব' থেকেই আকিয়াব নামের উৎপত্তি। জনশ্রুতি আছে, হজরত আলীর ছেলে মুহাম্মদ হানিফা এজিদের সঙ্গে পরাজিত হয়ে আরাকানে আসেন এবং ইসলাম প্রচার করেন। আরাকানের মংডু শহরের নিকটস্থ পাহাড়ের সুউচ্চ দুটি চূড়ার একটির নাম হানিফার টংকী এবং পার্শ্ববর্তী অপরটি হানিফার প্রেমিকা কয়রাপরীর টংকী বলে খ্যাত। এই কয়রাপরী ছিলেন শাহপরীর কন্যা।[৯২]

মঙ্গৎ রায়কে বন্দী করার জন্য নরপতিগ্যির ব্যর্থ চেষ্টা

প্রথম অভিযানে মঙ্গৎ রায়কে বন্দী করতে ব্যর্থ হয়ে জবরদখলদার নরপতিগ্যি দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। "The Magh king made another attempt to push forward into the Mughal territory after his failure to have Matak rai in his grip."[৯৩] এই দ্বিতীয় অভিযানে নরপতির ৫০০টি জালিয়া নৌযান, ১৫০টি গোরব এবং গোলাবারুদ বোঝাই ৫টি জাহাজ অংশ নেয়। ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করে নরপতির নৌবহর ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে ভুলুয়া ও শ্রীপুরের মধ্যবর্তী মোহনায় প্রবেশ করে। খবর পেয়ে নবাব ইসলাম খান মেশহাদী ক্ষিপ্র গতিতে ঢাকা থেকে ধাপা অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ধাপার ৮ মাইল দক্ষিণে খিজিরপুর মোহনার উভয় পাড়ে রাতারাতি বাঁশ ও মাটি দিয়ে ৪টি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং তাতে ভারী কামান স্থাপন করে মগ নৌ আক্রমণ সফলভাবে মোকাবিলা করেন। এইভাবে মঙ্গৎ রায়কে বন্দী করার নরপতির দ্বিতীয় অভিযানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। "Then the Magh king, after some preparations, launched a naval attack. A fleet composed of over 500 Jalias, 150 Ghurabs (floating batteries) and five ships full of munition, entered the estuary between Bhalua and Sripur. Islam Khan met the threat by advancing from Dacca, some eight miles southwards to Dhapa

and rapidly raising four earth and bamboo forts on the two banks at the mohana of Khizirpur and planting heavy guns on them.This bold front scared away the Magh navy and the attack did not materialise (end of September,1638)."[৯৪]

নরপতিগ্যিকে আরাকানীরা তাদের বৈধ রাজা বলে মেনে নেয় নি

উল্লেখ থাকে যে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নরপতি আরাকান রাজসিংহাসন জবরদখল করলেও আরাকানীরা কিন্তু তাকে কোন দিনও তাদের বৈধ রাজা হিসেবে স্বীকার করে নেয় নি। ফলে নরপতিগ্যি তার বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভরশীল হয়েই রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তবে এই সৈন্যবাহিনীও কিন্তু তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে সদা সচেষ্ট ছিল। নরপতির সিংহাসন জবরদখলের ফলে আরাকানী রাজতন্ত্রের অলঙ্ঘনীয়তা ও পবিত্রতা চিরতরে বিনষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আইনানুগ রাজবংশেরও আরাকানে বিলুপ্তি ঘটল। এই বিলুপ্ত রাজবংশকেই আরাকানীরা আজও তাদের প্রাচীন বৈধ রাজবংশ হিসেবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে থাকে। "The usurper Narapatigi was never fully accepted by the Arakanese. He depended upon his foreign mercenaries. These were ready to unmake him. The sanctity of authority was gone."[৯৫]

অধ্যায় ৭

মঙ্গৎ রায় মোগলদের জায়গীরদার, মনসবদার ও করদ রাজা ছিলেন, তিনি ঢাকার নবাব ছিলেন, তার জনপ্রিয় নাম ছিল বল্লাল

মঙ্গৎ রায় মুসলমান অবস্থায় হন মীর আবুল কাশেম হুসনেনী আস সমঅনী আততাবাতাবা, এই দীর্ঘ মুসলমানী নামের কারণ, মগ রাজাদের 'সিন বায়া সিন' উপাধি ধারণ, উচ্চারণ বিকৃতির কারণে আবুলহয়ে যায় বল্লাল, 'বল্লাল' এই নামটিই তার জনপ্রিয় নাম হয়, তার পিতাও 'মলহন' এই ছোট্ট নামে জনপ্রিয় ছিলেন।

মঙ্গৎ রায়ের মুসলমানী নাম আবুল

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আরাকানরাজ নরমেখলা ওরফে সোলেমান খান ওরফে সমঅনের বংশধর, আরাকানরাজ মলহন ওরফে হুসেন শাহের পুত্র এবং দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহজাহানের করদ ঢাকায় বসবাসরত শরণার্থী এই আরাকানরাজ মঙ্গৎ রায় ওরফে শ্রীধরম শাহ মুসলমান অবস্থায় 'মীর আবুল কাশেম আল হুসনেনী আল সমঅনী আততাবাতাবা'-তে রূপান্তরিত হন। রাজার এই সুদীর্ঘ মুসলমানী নামটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় : হুসনেনী (হুসেন শাহ) ও সমঅনী (সোলেমান শাহ)-এর বংশধর মীর আবুল কাশেম আত তাবাতাবা। 'তাবাতাবা' খুব সম্ভব 'তারাবায়াতারা' কিংবা 'সিনবায়াসিন' এই আরাকানী রাজউপাধিটিরই অশুদ্ধ মুসলমানীকরণ কিংবা আরবী প্রতিবর্ণীকরণ।[৯৬] 'সিনবায়াসিন' অথবা 'তারাবায়াতারা' একটি আরাকানী রাজউপাধি। অর্থ 'ধবল গজেশ্বর' বা শ্বেত হস্তীর প্রভু। সুপ্রাচীন কালে ভারতের হিন্দু রাজারা শ্বেত হস্তীকে পবিত্র ও সৌভাগ্যের প্রতীক বলে বিশ্বাস করতেন। সম্ভব হলে তা সংগ্রহ করে সযত্নে প্রতিপালন করতেন। রাজপুরোহিতের ওপর শ্বেত হস্তী রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করতেন। বৌদ্ধ জাতকের একটি কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে অতীতে কোন এক জন্মে গৌতম বুদ্ধ শ্বেত হস্তীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাই

বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে শ্বেত হস্তীর মধ্যে ভবিষ্যত বুদ্ধের আত্মা বাস করেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ রাজারা শ্বেত হস্তীর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তারা যে কোন মূল্যে শ্বেত হস্তী সংগ্রহ করতে সচেষ্ট থাকতেন। সেকালে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পেগুর তলইং বংশীয় রাজা ন্যানডা বায়েনিং চারটি শ্বেত হস্তীর মালিক ছিলেন। এই শ্বেত হস্তীর লোভে আরাকানরাজ মেং ইয়াজাগ্যি ওরফে সলিম শাহ ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পেগু রাজ্য আক্রমণ করেন। তিনি ন্যানডা বায়েনিংকে পরাজিত করে শ্বেত হস্তী ৪টি, রাজকন্যা সিনডোনং, রাজপুত্র মেং শোয়ে প্রু ও তার ছোট ভাই এবং কয়েক হাজার তলইং সৈন্য বন্দী করে রাজধানী ম্রোহং-এ নিয়ে এলেন এবং নিজ আরাকানী ও আরবী নামের সঙ্গে শ্বেত গজেশ্বর উপাধি গ্রহণ করলেন। সেই থেকে ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান রাজারা প্রত্যেকে নিজেদের আরাকানী ও ইসলামী নামের সঙ্গে 'সিনবায়াসিন' উপাধিটি ধারণ করেন।[৯৭]

মঙ্গৎ রায়ের জনপ্রিয় নাম বল্লাল

একাধিক তথ্য-প্রমাণ থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে 'মীর আবুল কাশেম আততাবাতবা আল হুসনেনী আল সমঅনী' রাজার এই সুদীর্ঘ আরবী বা মুসলমানী নামের 'আবুল' এই অংশটিই উচ্চারণ বিকৃতির দরুন বুলা, বলা, বলার, বলাল বা বল্লাল হয়ে যায় এবং এই ছোট্ট নামটিই তার অত্যন্ত জনপ্রিয় নামে পরিণত হয়।[৯৮]

মঙ্গৎ রায়ের পিতার জনপ্রিয় নাম মলহন

তার মহান পিতাও যেমন 'সিনবায়াসিন ওয়ারা ধম্মরাজা হুসেন শাহ' এই দীর্ঘ নামের বদলে 'মলহন' (<মনহন<মনহমন<মনখমন<মংখমং<মেংখামং) এই ছোট্ট নামে জনপ্রিয় ছিলেন। মলহন সম্ভবত কোন মুসলমানী রাজ উপাধিরই অশুদ্ধ আরাকানীকরণ, যার অর্থ 'রাজাদের চন্দ্রাতপ'। "The next coin is that of the son and successor of the preceding king. The obverse bears the following date and inscription:

974, Shin Bya Shin Wara-dhamma Raza-Oo-Shyoung-Shya.This date is equivalent to A.D.1612. Shin Bya Shin is a Burmese title stands for Lord of the white elephant. Wa-ra-dham-ma Ra-dza is a Pali title said to signify Excellent-Law-Observing King. While Oo-Shyoung-Shya we have another instance of the barbarous adoption of a Mohamedan name, it appearing to stand for Hoo Sein Shah. This king was commonly known to his subjects by the name Meng Khamoung, ...It is probable that this title Meng Khamoung was a translation of some Mohamedan epithet which this king took to himself. It may be rendered The Canopy of Kings."[৯৯] মলহন অত্যন্ত জনপ্রিয়, প্রজাহিতৈষী ও কীর্তিমান রাজা ছিলেন। আরাকানীরা আজও 'মলহন' এই নামটি

উচ্চারণ করতে অতিশয় শ্লাঘা বোধ করে থাকে। "His name is still remembered with pride and affection by the people of Arakan."[১০০]

আবুল হয়ে যায় বল্লাল

আমরা সকলেই অবগত আছি যে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় আদি অক্ষরে স্বরধ্বনি লোপ অত্যন্ত অভ্যস্ত একটি রীতি, যেমন— ইবরাহিম>বিরাহিম, অরিটঠ>রিঠা ইত্যাদি।[১০১] এই অতিশয় অভ্যস্ত রীতির কারণেই আবুল হয়ে যায় বুলা বা বলা। যেমন ঢাকার চুরিহাট্টা মহল্লার 'বুলা খানের মসজিদ'।[১০২] খান একটি মুসলমানী উপাধি।[১০৩] অর্থ রাজা বা শাসক।[১০৪] চুরিহাট্টা মহল্লার এই মসজিদটি অবিকল হিন্দু মন্দিরের অনুরূপ করে নির্মিত ছিল এবং এই মসজিদে কষ্টি পাথরের তৈরী একটি বাসুদেব মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত ছিল।[১০৫] উল্লেখ্য যে আরাকানী মুসলমানেরা মসজিদ নির্মাণ করে তাতে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে উপাসনা করে।[১০৬] এই ধরনের মসজিদকে বদরমোকান বা বুদ্ধের মসজিদ বলে।[১০৭] এই মসজিদকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানরাও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। "After the 10th century the country was professedly Buddhist, notwithstanding the spread of Mohamedanism which reached Achin in 1206 and dotted the coast from Assam to Malaya with the curious mosque known as Buddermokan (Temple) reverenced by Buddhists and Chinamen as well as Mohamedans."[১০৮]

এখন বল্লাল এই নামটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যাক। আমরা জানি অস্ট্রিক ভাষা র-কার ও ল-কার বহুল ভাষা।[১০৯] আরাকানী ভাষাও র-কার ও ল-কার বহুল ভাষা।[১১০] ফলে ঐ 'বলা' (<বুলা<আবুল) হয়ে যায় বলার বা বলাল। যেমন বিক্রমপুরের 'বলার বাড়ী' বা 'বলাল বাড়ী' বা 'বল্লাল বাড়ী'[১১১] এবং 'সন বলালি'[১১২]। আরাকানী ভাষায় সিন বা সেন অর্থ রাজা।[১১৩] ফলে বলা খান (<বুলা খান<আবুল খান), বলাল খান বা বল্লাল খান হয়ে যায় বল্লাল সেন বা বিল্লাল সিন (Billal Sein, Raja of Vikrampur)[১১৪]। তদুপরি দ্রাবিড়-অস্ট্রিক ভাষারও একটি শব্দ বল্লাল, যার অর্থ সামন্ত রাজা বা করদ রাজা।[১১৫] মঙ্গৎ রায় প্রকৃতপক্ষেই মোগল সম্রাট শাহজাহানের অধীনে করদ রাজা হওয়ায় 'তার বল্লাল নামটি ব্যাপক আকারে সুপ্রচলিত হয়ে যায়'[১১৬]। আবার অনেকটা নাম সাদৃশ্যের কারণে বঙ্গদেশের সেন রাজবংশের রাজা বল্লাল সেন (রাজত্বকাল ১১৫৮—১১৭৯ খ্রিঃ)-এর সঙ্গে তাকে অভিন্ন করা সহজ হয়।[১১৭] এবং তার প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করা কিংবা মুছে ফেলাও সম্ভব হয়।

তথ্যনির্দেশ

১। বাংলা সনের জন্মকথা : মুহম্মদ আবু তালিব : ১৯৯৩ : ঢাকা : পৃঃ ১২।
২। বাংলাদেশের ইতিহাস : ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম গং : ১৯৭৭ : ঢাকা : পৃঃ ১০৪; Inscriptions of Bengal : Vol. III : Nani Gopal Majumdar : 1929 : Rajshahi : PP. 1-182.
৩। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ৪১ ; হিজরী সনের ইতিকথা : সুনির্মল কুমার দেবমীন : ১৯৭৯ : সিলেট : পৃঃ ৯৫।
৪। দৈনিক জনকণ্ঠ : ১/১/৯৭ ইং : ইংরেজী সনের ইতিকথা : হাসান আব্দুল কাইয়ূম।
৫। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ১২।
৬। প্রাগুক্ত : পৃঃ ১২।
৭। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : শামসুজ্জামান খান : ১৯৯৩ : ঢাকা : পৃঃ ৯।
৮। বাংলা দেশের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার : ১৩৭৭ : কলিকাতা : পৃঃ ১১৭।
৯। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
১০। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : শামসুজ্জামান খান : পৃঃ ৭-১০।
১১। নক্ষত্র চেনা : শ্রীজগদানন্দ রায় : ১৯৩১ : এলাহাবাদ : পৃঃ ৬৩-৭৩।
১২। হিজরী সনের ইতিকথা : দেবমীন : পৃঃ ৬৭।
১৩। A Standard Calendar for India : S.K.Chatterjee : 1980 : New Delhi: PP. 6-10.
১৪। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ১৬।
১৫। প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪-৬ ; হিজরী সনের ইতিকথা : দেবমীন : পৃঃ ৭০-৭৯।
১৬। হিজরী সনের ইতিকথা : দেবমীন : পৃঃ ৭৭।
১৭। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ১-৪।
১৮। প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪-৫।
১৯। ইতিহাস : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা (বাইপপ) : ১ম-৩য় সংখ্যা: ১৩৯৯ : ঢাকা : পৃঃ ১৪-১৭।
২০। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ১০-১৯।
২১। History of Aurongzib : Vol.: III : Sir Jadunath Sarkar : 1972 : New Delhi : P. 53.
২২। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ১৪-১৫।
২৩। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : শামসুজ্জামান খান : পৃঃ ৫-১০ ; ইতিহাস : বাইপপ : ষড়বিংশতি বর্ষ: ১ম-৩য় সংখ্যা : বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৯৯ : পৃঃ ১৪-১৭।
২৪। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ৭।
২৫। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : শামসুজ্জামান খান : পৃঃ ৭২।
২৬। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ২-৫।
২৭। ভারতকোষ : ৪র্থ খণ্ড : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : কলিকাতা : পৃঃ ১৪২।
২৮। প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৪-১৫।
২৯। বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন : ভিক্ষু সুনীথানন্দ : ১৯৯৫ : ঢাকা: পৃঃ ২৪২।
৩০। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : শামসুজ্জামান খান : পৃঃ ৩৪।
৩১। প্রাগুক্ত : পৃঃ ৩৮।

৩২। বইয়ের খবর : ত্রৈমাসিক পত্রিকা : ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা : জানু-মার্চ, ১৯৮২ : ঢাকা : পৃঃ ১০-১১।
৩৩। ভারতকোষ : ৪র্থ খণ্ড : পৃঃ ১৪২-১৪৩।
৩৪। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : শামসুজ্জামান খান : পৃঃ ১৭।
৩৫। প্রাগুক্ত : পৃঃ ৭৬।
৩৬। ভারতকোষ : ১ম খণ্ড : পৃ. ৯১ ; বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ৬, ৭, ১৪, ৪৫।
৩৭। বাংলাদেশের উৎসব : মুনতাসীর মামুন : ১৯৯৪ : ঢাকা : পৃঃ ৯৫; দৈনিক জনকণ্ঠ : নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা : ১৪০২ : বাঙলাদেশের বাঙালী জাতি এবং বঙ্গাব্দের জন্মকথা : এম. আর. আখতার মুকুল।
৩৮। ভারতকোষ : ১ম খণ্ড : পৃঃ ৯১।
৩৯। History of Bengal (M.P.) : Sir Jadunath Sarkar : 1973 : Patna : P. 196.
৪০। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ৫০।
৪১। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : P. 214.
৪২। Ibid. : P. 214.
৪৩। Ibid. : PP. 187-215 ; খবরের কাগজ : ১২ বর্ষ : ২১-২২ সংখ্যা : ২৫ মে, ১৯৯৩ : পৃঃ ৪৯।
৪৪। মুসলিম বাংলা সাহিত্য : ড. এনামুল হক : ১৯৬৫ : ঢাকা : পৃঃ ১১৮।
৪৫। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : P. 216.
৪৬। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : শামসুজ্জামান খান : পৃঃ ৭৫-৭৬।
৪৭। বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব : ড. আহমদ শরীফ : পৃঃ ৭৪।
৪৮। বাংলাদেশের মন্দির : রতনলাল চক্রবর্তী : ১৯৮৭ : ঢাকা : পৃঃ ২৫।
৪৯। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ৩৫।
৫০। প্রাগুক্ত : পৃঃ ২৫, ৪১।
৫১। ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুসলিম ও বৃটিশ শাসন) : ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: ঢাকা : পৃঃ ৩৩২।
৫২। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ৪৯-৫০।
৫৩। দৈনিক ইত্তেফাক : ১৮ই জুলাই, ১৯৯৭ : সতের শতকের বাংলা গদ্যের নমুনা: দেলওয়ার হাসান।
৫৪। The Romance of an Eastern Capital : Bradley Birt : 1914 : London: P. 29.
৫৫। History of Bengal (H.P.) : Dr. R. C. Majumdar : 1943 : Dacca : P. 249-251.
৫৬। Bengal Temples : Bimal Kumar Datta : 1975 : New Delhi : P. 50-51.
৫৭। বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : ১৯৩৯ : কলিকাতা : পৃঃ ২৫৯।
৫৮। ভারতের ইতিহাসকথা : ১ম খণ্ড : ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী : ১৯৭৩ : কলিকাতা : পৃঃ ২২১।
৫৯। প্রাচীন রাজমালা : শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত : পৃঃ ৪৭১।
৬০। Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal : Vol. 2 : James Wise : 1883: London : P. 309.
৬১। ঢাকার ইতিহাস : ২য় খণ্ড : শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায় : ১৩১৯-১৩২২ : কলিকাতা : পৃঃ ৪৪০-৪৪২।
৬২। Muslim Architecture in Bengal : Dr. A. H. Dani : 1961 : Dacca : P. 238.
৬৩। ঢাকার ইতিহাস : ২য় খণ্ড : যতীন্দ্রমোহন : পৃঃ ৩৫২।
৬৪। Vallala Charita : Ananda Bhatta : Eng.Tran. by H. Shashtri : 1901 : Calcutta : PP. 13,86.
৬৫। সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস : শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায় : ১৮৯১ : কলিকাতা : পৃঃ ৬৫-৬৭।

৬৬। বিক্রমপুরের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড : শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : পৃঃ ৩৫১-৩৫২।

৬৭। বাংলাদেশের ইতিহাস : ড.আব্দুর রহিম গং : পৃঃ ২৪৮।

৬৮। History of Burma : A. P. Phayre : 1884 : London : P. 177; ইতিহাস : বাইপপ : ৩য় বর্ষ: ১ম সংখ্যা : ১৩৭৬ : পৃঃ ৫৫; প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী : আব্দুল হক চৌধুরী : ১৯৯৪ : ঢাকা : পৃঃ ৫৭, ৬৮।

৬৯। ঢাকার ইতিহাস : প্রথম খণ্ড : শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায় : পৃঃ ৪৯২।

৭০। Burma Research Society Fiftieth Anniversary (BRSFA) Publications No. 2 : Pe Maung Tin : 1960 : Rangoon : PP. 485-490.

৭১। The Cambridge History of India (M.I.) : Vol. IV : Haig & Burn : P. 478.

৭২। History of Aurongzib : Vol. III : Sarkar : P. 132.

৭৩। History of Burma : G. E. Harvey : 1925 : London : P. 145 ; প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী : আব্দুল হক : পৃঃ ৮২।

৭৪। History of Burma : Harvey : P. 145.

৭৫। The Cambridge History of India (M.I.) : Vol. IV : P. 479-480.

৭৬। The Provinces of Bihar and Bengal under Shah Jahan : Khondokar Mahbubul Karim: P. 116.

৭৭। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : আব্দুল হক : পৃঃ ৮২-৮৩।

৭৮। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : PP. 331-332.

৭৯। The Provinces of Bihar and Bengal under Shah Jahan : Karim : P. 116.

৮০। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : P. 331-332.

৮১। The Romance of an Eastern Capital : B. Birt : P. 108.

৮২। The Provinces of Bihar and Bengal under Shah Jahan : Karim : P. 116 ; Badshahnama: Vol. II : Abdul Hamid Lahori : Bibliotheca Indica Series : PP. 117-125.

৮৩। History of Bengal : Charles Stewart : 1910 : Calcutta : PP. 115, 155.

৮৪। ইসলামাবাদ : সৈয়দ মুর্তাজা আলী : ১৯৬৪ : ঢাকা : পৃঃ ৬০।

৮৫। Glimpses of old Dhaka : S. M. Taifoor : 1956 : Dacca : P. 146 ; ঢাকার ইতিহাস : প্রথম খণ্ড : শ্রীযতীন্দ্র মোহন : পৃঃ ৪৯২।

৮৬। Glimpses of old Dhaka : Taifoor : P. 146.

৮৭। ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে : হাকীম হাবীবুর রাহমান : বঙ্গানুবাদ : হাশেম সূফী : ১৯৯৫ : ঢাকা: পৃঃ ১৪২।

৮৮। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : P. 335.

৮৯। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক : ড. মমতাজুর রহমান তরফদার : ১৯৯৫ : ঢাকা: পৃঃ ৭০,৭৩।

৯০। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন : আব্দুল করিম : ২০০১ : ঢাকা : পৃঃ ৩৮৫।

৯১। মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস : কে. আলী : ১৯৯০ : ঢাকা : পৃঃ ১১৮।

৯২। রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস : এন. এম. হাবিব উল্লাহ : ১৯৯৫ : ঢাকা : পৃঃ ১৮, ৩২-৩৩।

৯৩। The Provinces of Bihar and Bengal under Shah Jahan : Karim : P. 116.

৯৪। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : P. 332.

৯৫। BRSFA Publications No. 2 : Tin : PP. 490-500 ; রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস : হাবিব উল্লাহ : পৃঃ ৬৬।

৯৬। বিক্রমপুরের নবাব বল্লাল সেন ও ঢাকেশ্বরী মন্দির : জয়নাল আবেদীন খান : ১৯৯৭ : ঢাকা : পৃঃ ৩০-৬৬।

৯৭। প্রাচীন আরাকান ও রোয়াইঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ : আব্দুল হক : পৃঃ ৩৪, ৫৬-৫৭।

৯৮। বিক্রমপুরের নবাব বল্লাল সেন ও ঢাকেশ্বরী মন্দির : জয়নাল আবেদীন খান : পৃঃ ৩৩-৬৬।

৯৯। Journal of the Asiatic Society of Bengal (JASB) : Vol. XV : 1846 : PP. 233-234.

১০০। History of Burma : Phayre : P. 177.

১০১। বাংলা ভাষা : শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য : ১৯৭৬ : কলিকাতা : পৃঃ ১৪১।

১০২। JASB : Vol. XLI : 1872 : P. 107.

১০৩। আধুনিক বাংলা অভিধান : মোসলেম উদ্দিন : ১৯৮৫ : ঢাকা : পৃঃ ২১১।

১০৪। SAMSAD English-Bengali Dictionary : 1995 : Calcutta : P. 598.

১০৫। ঢাকার ইতিহাস : ২য় খণ্ড : শ্রীযতীন্দ্র মোহন : পৃঃ ৩৪৮ ; Notes on the Antiquities of Dacca: Said Awlad Hasan : 1904 : Dacca : P. 29.

১০৬। চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল : পৃঃ ৮১-৮২।

১০৭। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : আব্দুল হক : পৃঃ ১৫৪-১৫৫ ; Bangladesh District Records : Chittagong : Vol. I : Sirajul Islam : 1978 : Dacca : P. 160.

১০৮। History of Burma : Harvey : P. 137.

১০৯। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : নীহার রঞ্জন রায় : ১৪০০ : কলিকাতা: পৃঃ ৪৪।

১১০। A Short History of South-East Asia : D.G.E.Hall : 1968 : New York : P. 328.

১১১। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : নীহার রঞ্জন : পৃঃ ৩০৫।

১১২। বাংলা দেশের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : শ্রীরমেশচন্দ্র : পৃঃ ১১৬-১১৯।

১১৩। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : আব্দুল হক : পৃঃ ৩৮-৪৭।

১১৪। A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca : Vol. I : James Taylor : 1840 : PP. 65-66.

১১৫। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ৫৫।

১১৬। বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : শ্রীযোগেন্দ্রনাথ : পৃঃ ২৫৯।

১১৭। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ২১১-২১৫; A Sketch of the Topography and Statistcs of Dacca : Vol. I : James Taylor : PP. 56-66.

অধ্যায় ৮

আরাকান ও আরাকানী, মগরাজা নরমেখলা ওরফে সোলেমান খান, আরাকানে ইসলামী প্রভাব, মগ রাজাদের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য

খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত আরাকান ছিল একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় হিন্দু রাজ্য, দশম শতাব্দীর শেষভাগে আরাকানে মোঙ্গল রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে আরাকান এক সংকর ইন্দোচৈনিক রাজ্যে পরিণত হয়, আরাকান রাজারা বুদ্ধের জ্ঞাতি ও সূর্যদেবতার বংশধর, আরাকানরাজ নরমেখলার সিংহাসনচ্যুত হয়ে ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের রাজসভায় আশ্রয় প্রার্থনা, নিজেকে গৌড়ের সুলতানের অধীনে আরাকানের করদ রাজা বলে ঘোষণা, মুহম্মদ সোলেমান খান এই নাম গ্রহণ, ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতানের সহায়তায় সোলেমান খান ওরফে চিলমানের আরাকান রাজসিংহাসন পুনরুদ্ধার, নরমেখলা ওরফে চিলমান গাজীর আরাকানে মসজিদ নির্মাণ, ইসলামী মুদ্রা প্রবর্তন, ফারসীকে রাজসভার ভাষা হিসেবে গ্রহণ, মুসলমান রাজদরবারের অনুকরণে আরাকান রাজসভা পুনর্গঠন। এই সময় থেকে আরাকানীরা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুরাগী ও অনুসারী হয়ে যায়, আরাকানীদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সমৃদ্ধির কারণ যুদ্ধ বা জেহাদ, আরাকানীরাও সমৃদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের অহিংসবাদী বৌদ্ধ ধর্মকে যুদ্ধবাদী ধর্মে রূপান্তরিত করে নেয়, আরাকান রাজাদের ঐশ্বর্য ও পরাক্রম, আরাকান রাজারা নিজেদেরকে বঙ্গদেশের বৈধ অধিপতি বলে মনে করতেন, মোগলদেরকে মনে করতেন জবরদখলদার, আরাকান সম্বন্ধে পর্যটক বারবোসার বিবরণ।

আরাকান ও আরাকানী বা মগ

মোগল সম্রাট শাহজাহানের এই করদ মগ রাজা মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ও তার সুমহান কীর্তিসমূহ সম্বন্ধে যদি আমরা সম্যক ধারণা লাভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সর্বাগ্রে আরাকান সম্পর্কে জেনে নিতে হয়। তাই আরাকানের ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং ত্রিপুরার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর উপকূলে দীর্ঘ এক ফালি ভূখণ্ড উত্তরে চট্টগ্রাম সীমান্তের নাফ নদী থেকে দক্ষিণে ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের ব্যাসেইন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভূখণ্ডটির নাম আরাকান বা রাক্ষাইঙ।[১] এই আরাকানের অধিবাসীরাই মগ এবং তাদের রাজারা মগ রাজা নামে পরিচিত।[২] ইতিহাস থেকে প্রমাণ মিলে খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৬৬ অব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বর্মীরাজ বোধফায়া আরাকান জয় করে প্রথম ব্রহ্মদেশভুক্ত করেন। সেই থেকে আজ অবধি আরাকান ব্রহ্মদেশেরই (বর্তমান মিয়ানমার) একটি প্রদেশ।[৩]

আরাকান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুইজারল্যাণ্ড ও শস্যভাণ্ডার

সাগর-নদী-পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন আরাকান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুইজারল্যান্ড নামে পরিচিত। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পার্বত্য অঞ্চল গহীন অরণ্যে আবৃত। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আরাকান মূলত একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ধান উৎপাদনে আরাকান বরাবরই একটি উদ্বৃত্ত এলাকা বলে পরিচিত। কেউ কেউ এ কারণে আরাকানকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধানের গোলা বা শস্যভাণ্ডার বলে উল্লেখ করে থাকেন।[৪] বাঙালীরা যেমন মাছে-ভাতে বাঙালী আরাকানীরাও তেমনি মাছে-ভাতে আরাকানী। এই বিষয়ে আরাকান জগতের মহাকবি আলাউল লিখেন,

ক্ষিতি তলে অনুপম রোসাঙ্গ শহর নাম।
শস্য-মৎস্য সতত পূর্ণিত ॥[৫]

আরাকানে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বাস

আরাকানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এসেছে। নানা বিদেশী নর-গোষ্ঠীর আগমনের ফলে আরাকানে আমদানি হয়েছে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি। বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম ও গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করে আরাকানী সংস্কৃতি পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে মোঙ্গলীয়, তিব্বতী, বর্মী, ইন্দোচৈনিক, ভারতীয় ও আরবীয় স্রোতধারা উল্লেখযোগ্য। আরাকানে বৌদ্ধ, ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছাড়াও মুরুং, খুমী, চাক, সেন, সেন্দুজ, ম্রো, ডইনাক, খ্যাং প্রভৃতি জড়োপাসক জনগোষ্ঠী রয়েছে। একটি সাংস্কৃতিক নর-গোষ্ঠীর সঙ্গে আরেকটি নর-গোষ্ঠীর রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন। একাধিক সাংস্কৃতিক নর-গোষ্ঠীর এই সহ-অবস্থানই আরাকানী সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৬]

আরাকান একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় হিন্দু রাজ্য ছিল

মুদ্রা, লিপিপ্রমাণ এবং জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে দশম শতকের পূর্ব পর্যন্ত আরাকান ছিল বাংলার পূর্ব সীমান্ত সংলগ্ন একটি ভারতীয় হিন্দু রাজ্য। রাজধানী ছিল তার বৈশালী। সরকার ও জনগণ ছিল সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয়। ধর্ম ছিল বাংলার মতই মহাযানী বৌদ্ধ। তবে তান্ত্রিক মতের ছিল প্রাবল্য। তখন অবশ্য মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল এবং বুদ্ধ হিন্দু দেবদেবীর অনেকের মধ্যে একজনে পরিণত হয়েছিলেন। "Wesali was an easterly Hindu Kingdom of Bengal, following the Mahayanist form of Buddhism and that both government and people were Indian ...Hinayanism had vanished ; Mahayanism had compromised with original Hinduism to such a point that Buddha has become one of many gods; even the sexual magic of Tantricism was no anomaly." মহাযানী বৌদ্ধ বাংলার মত আরাকানের মুদ্রাও ছিল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য মুদ্রা। মুদ্রায় নাগরী লিপি উৎকীর্ণ ছিল। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য প্রতীক বৃষ, শিবের ত্রিশূল, শঙ্খ ইত্যাদি অঙ্কিত ছিল।[৭] ফলে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে, সংস্কৃতের ব্যবহারে, নাগরী হরফের প্রয়োগে, চুণ্ডাদেবীর প্রতিষ্ঠায় ও মহাযান মতের প্রাবল্যে বাংলা (সমতট) ও আরাকানে কোন পার্থক্য ছিল না।[৮]

আরাকান একটি সঙ্কর ইন্দোচৈনিক রাজ্যে পরিণত হয়

কিন্তু ৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানে মোঙ্গল আক্রমণ হল। মিউ গোত্রপ্রধান অম্যহতু (যিনি চুণ্ডাদেবীর পুত্র বলে পরিচিত) বৈশালীর চন্দ্র রাজবংশের রাজা সুলাতইঙ্গ চন্দ্রকে অপসারিত করে আরাকান সিংহাসন দখল করলেন।[৯] ফলে আরাকানে ভারতীয় রাজবংশের বিলুপ্তি ঘটল। প্রতিষ্ঠিত হল মোঙ্গল রাজবংশ। মোঙ্গলরা আরাকানকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল এবং বর্তমান ভারত-বর্মা বিভক্তির পূর্বদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যায় মিশে সৃষ্টি করল এক নতুন জাতির ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর যারা এখন থেকে আরাকানী নামে পরিচিত হল। "They cut Arakan away from India and mixing in sufficient number with the inhabitants of the east side of the present Indo-Burma divide, created that Indo-Mongoloid stock now known as the Arakanese." বর্বর মোঙ্গলদের অধিকারের ফলে আরাকানে অন্ধকার যুগের সূচনা হল। তবে আক্রমণকারীরা অচিরকালের মধ্যেই বিজিত দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। ফলে আরাকানে মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন এক সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটল। এভাবে আরাকান একটি বিশুদ্ধ ভারতীয় রাজ্য থেকে একটি সঙ্কর ইন্দোচৈনিক রাজ্যে পরিণত হল। নতুন যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে আরাকান এখন পশ্চিম দিকের বদলে পূর্ব দিকে ফিরে তাকাল। পূর্ব দিকে পর্বতমালার ওপারে মূল বর্মী ভূখণ্ডে ছিল পঁগা নামে একটি পরাক্রমশালী রাজ্য। খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী

থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই পাঁচ শত বছর একমাত্র পঁগার সঙ্গেই ছিল আরাকানের সম্পর্ক। এই পাঁচ শত বছরের নিরবচ্ছিন্ন বৈবাহিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে আরাকানের অধিবাসীরা ভারতীয়দের থেকে অনেকখানি আলাদা হয়ে যায় এবং বর্মীদের অধিকতর সদৃশ হয়ে পড়ে। "It was with Pagan alone Arakan had any considerable dealings ...Thus during these five centuries the inhabitants of Arakan became more similar to the inhabitants of Burma and less like Indians. Their religion became less Mahayanist and more Hinayanist."[১০]

আরাকানের ইতিহাস-ঐতিহ্য অনেকটাই ভারতীয় হিন্দু

তবে আরাকানীরা মোঙ্গল জাতীয় হয়ে গেলেও তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য কিন্তু মোঙ্গল তথা চৈনিক হয়ে যায় নি, বরং অনেকাংশেই ভারতীয় হিন্দুই থেকে যায়।[১১] তাদের বর্ণমালা, তাদের সাহিত্য, তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞান, তাদের ধর্ম-দর্শন-শিল্প-লোকগীতি সবই ভারতীয় এবং হিন্দু। তাদের প্রতিটি শহরেরই দুটি করে নাম আছে। একটি দেশীয় বর্মী। অন্যটি পৌরাণিক ভারতীয়। "The Burmese are the Mongolian race. Yet their traditions, instead of harking back to China refer to India. Their chronicles read as if they were descended from Buddha's clansmen and lived in Upper India. Even their folk-lore is largely Hindu. Most of their towns have two names, one vernacular, the other classical Indian. ...The surviving traditions of the Burmese are Indian because their own Mongolian traditions died out."[১২] সামাজিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রেও তারা ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ বর্ণাশ্রম প্রথা অনেকটা মেনে চলে।[১৩]

আরাকান রাজারা আদিশূর তথা সূর্যদেবতার বংশধর

আরাকান ও বর্মী রাজাদের রাজইতিবৃত্ত 'রাজোয়াঙ' ও 'মহারাজোয়াঙ' সূত্রে জানা যায় যে আরাকান রাজারা আদিশূর (Aditsa)-এর বংশধর।[১৪] তারা সূর্যবংশী।[১৫] তারা ক্ষত্রীয় বংশসম্ভূত এবং বুদ্ধের জ্ঞাতি।[১৬] তাদের পূর্বপুরুষরা রাজত্ব করতেন উত্তর ভারতের বেনারসে। পরবর্তীকালে এই ক্ষত্রীয় ও বেনারসী রাজাদেরই এক রাজপুত্রকে আরাকানের রাজা বানিয়ে দেয়া হয়। তিনি এবং তার বংশধরেরা বংশপরম্পরায় আরাকানে রাজত্ব করেন।[১৭]

আরাকানরাজ নরমেখলার গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ

১৪০৪ খ্রিষ্টাব্দে মগধ বংশের যুবরাজ নরমিখলে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে পিতা অযুথো ও পিতৃব্য থিনকাথুর পর আরাকানের রাজা হলেন। নরমিখলা বর্মার ইউ এবং লোংসি

অঞ্চল লুণ্ঠন করেন।[১৮] উপরন্তু তিনি সেখানকার এক সামন্ত রাজ্য ডালকার রাজা অননথিউর পরমা সুন্দরী ভগ্নী চৌরঙ্গীওকে অপহরণ করে এনে বিয়েও করেন। ফলে আভারাজ মেঙ শোয়ে ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান আক্রমণ করলেন। নরমেখলে পরাজিত হয়ে রাজ্য ছেড়ে আশ্রয়প্রার্থী হলেন গৌড়ের ধর্মনিষ্ঠ পাঠান সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শার (রাজত্বকাল ১৩৮৯-১৪১০ খ্রিঃ) রাজসভায়। নরমিখলে নিজেকে গৌড়ের সুলতানের অধীনে একজন সামন্ত রাজা বলে ঘোষণা করলেন। সুলতানও তাকে সসম্মানে গ্রহণ করে সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদে নিয়োগ করলেন।[১৯] গৌড়ের রাজসভায় নরমিখলের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। গৌড়ে অবস্থান করে তিনি মুসলমানদের ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন।

নরমেখলার মুসলমানী নাম গ্রহণ

নরমিখলে গৌড়ের সুফী মুহাম্মদ জাকের নামে এক বুজুর্গ দরবেশের শিষ্য হলেন। নরমিখলের মুসলমানী নাম হল মুহাম্মদ সোলেমান শাহ বা সোলেমান খান।[২০] আরাকানী ভাষায় মেঙৎ চৌ মৌন, মং সৌ মৌন, মঙ সাউ মঙ, মেঙ সমুম, মেং সোমোয়ান, মিন সাউ মান, সামাউন, সমনান, সিমনান, চিলমান, সমঅন, সমনঅ ইত্যাদি।[২১] নরমিখলা ওরফে সোলেমান শাহ আরাকান রাজসিংহাসন পুনরুদ্ধারে গৌড়ের সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তৎকালীন গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ ওরফে যদু সেন (যিনি রাজা গণেশের পুত্র এবং যিনি মুদ্রায় নিজেকে "ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী"[২২] হিসেবে প্রচারিত করেন) ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান রাজসিংহাসনের জবরদখলকারীদেরকে উৎখাত করে নরমিখলে ওরফে সোলেমান খানকে আরাকানের সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। ফলে আরাকান বাংলার করদ রাজ্যে পরিণত হল।[২৩] নরমেখলা মোহাম্মদ সোলেমান শাহ নাম ধারণ করে ম্রাউক-উ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করলেন।[২৪]

নরমেখলার মসজিদ নির্মাণ

রাজা নরমেখলা ওরফে সোলেমান খান ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে আরাকান রাজসিংহাসন ফিরে পাওয়ায় আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ রাজধানী ম্রাউক-উ নগরীতে নিজেই একটি মসজিদ নির্মাণ করালেন।[২৫] মসজিদটি ম্রাউক-উ রাজপ্রাসাদের আড়াই মাইল পূর্ব-দক্ষিণ দিকে নির্মিত হয়। এই অঞ্চলটি গৌড়ীয় মুসলমানদের অবস্থানের কারণে কোয়ালং বা গৌ লঙ্গী (গৌড়ের বিকৃত আরাকানী উচ্চারণ) নামে পরিচিতি লাভ করে। অনেকটা গৌড়ীয় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এই মসজিদটি সান্দিখান মসজিদ নামে সুবিখ্যাত। শান বাঁধানো পাড়সহ দুটি জলাশয়ের মাঝখানে কিছুটা নীচু এলাকায় পাথরের দেয়াল ঘেরা জায়গায় মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৪৭ ফুট এবং

প্রস্থ ৩৩ ফুট। সামনে বারান্দা। বারান্দার ছাদ ধনুকাকৃতির। মূল মসজিদের ছাদ সিত্তাওয়াং ও ডাককানথিয়েন প্যাগোডার গম্বুজের মতই অর্ধবৃত্তাকার বর্গাকৃতির গম্বুজ। সম্পূর্ণ মসজিদটি সুন্দরভাবে সাইজ করে কাটা প্রস্তরখণ্ডে তৈরী।[২৬]

নরমেখলার গৌড় ও দিল্লীর বাদশাহদের অনুকরণে রাজদরবার প্রতিষ্ঠা

রাজা নরমেখলা আরাকান রাজদরবার গড়ে তুললেন গৌড় ও দিল্লীর অনুকরণে। রাজদরবারে আমীর-ওমরাহ, জেনানা মহল বা হারেম, পর্দা প্রথা, খোজা, জল্লাদ ও ক্রীতদাস প্রথা প্রবর্তন করলেন। নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কন করলেন। মুদ্রার এক পিঠে বর্মী অক্ষরে নিজের বর্মী নাম এবং অপর পিঠে আরবী হরফে মুসলমানী নাম ও ইসলামী কলিমা উৎকীর্ণ করলেন।[২৭] "From this time (1430 A.D.) the strange anomaly occurs of Buddhist kings, using in addition to their own names, Mohamedan designations and titles and even issuing coins bearing the Kalima."[২৮] ফারসীকে আরাকান রাজদরবারের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করলেন।[২৯]

রাজা নরমেখলা সম্ভবত মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। আর মুসলমানই যদি না হন তাহলে তার মুসলমানী নাম হবে কেন? কেন তিনি ইসলামী কলিমা সম্বলিত মুদ্রা জারি করবেন? আর গৌড়ের ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান সুলতানরাইবা কেন তাকে রাজসভায় আশ্রয় দান, সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদে নিয়োগ এবং হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবেন?

নরমেখলা ও তার পারিষদবর্গ ইসলামী সভ্যতার অনুসারী হয়ে যান

গৌড়ের রাজসভায় সুদীর্ঘ ২৪ বছর নির্বাসিত জীবন যাপনের ফলে আরাকানরাজ নরমেখলা ওরফে সোলেমান খান ও তার পারিষদবর্গ ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুরাগী ও অনুসারী হয়ে যান।[৩০] এই সময়ে তারা ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা ও রাজনীতি অধ্যয়ন করেন। তবে নতুন সভ্যতার উপযোগী হওয়ার জন্য তাদেরকে অবশ্য পুরনো ধ্যানধারণা বর্জন করতে হয়। এই সময়ে সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব দিক থেকেই মুসলিম রাষ্ট্র ছিল আধুনিকতার প্রতীক ঠিক আজকের দিনে যেমন এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীর নিকট শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপ। আরাকানীরা উপলব্ধি করে যে আধুনিক সভ্যতার যারা প্রধান নায়ক তারা সকলেই মোঙ্গলীয় মুসলমান। তারা কৌতূহলের সঙ্গে আরো লক্ষ করে যে যখন দূরপ্রাচ্যের সরকারসমূহ মোঙ্গলীয় বৌদ্ধ তখন ভারত ও তার পশ্চিমদিকস্থ সরকারসমূহ মোঙ্গলীয় মুসলমান। আরাকান এই দুই ব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত হওয়ায় সুযোগ পায় এই দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুঁজে বের করার। তারা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে মুসলমানদের সমৃদ্ধির প্রধান কারণ হল যুদ্ধ। দূরপ্রাচ্যের বৌদ্ধ সরকারসমূহের জন্য যখন যুদ্ধ ছিল অন্যায় ও নিষিদ্ধ তখন মুসলিম সরকারসমূহের জন্য যুদ্ধ ছিল ফরজ। "They had to learn the history

of recent events, the meaning of the triumph of Islam and how it arrived that the chief Moslem protagonists were Mongolian. For it was a curious fact that while the government of Further India was Mongolian Buddhist, that of India and westward beyond was Mongolian Mohamedan.

Situated as they were between the two, the Arakanese had opportunities of detecting their fundamental difference. That basic distinction centred in the matter of war and aggrandisement. While for Further India war was wrong and only happened by the way, for the Moslem block it was the first preoccupation of government. It took the Arakanese a hundred years to learn that doctrine from the Moslem Mongolians."[৩১]

মুসলমানদের উন্নতি ও রাজ্য জয়ে আরাকানীদের মনে জাগে যুদ্ধবাদী চিন্তা। বিজয়ীর আদলে আত্মোন্নয়নের স্পৃহাই এই চিন্তা-চেতনার উৎস।

আরাকানে নবযুগের সূচনা

আধুনিক সভ্যতার উপযোগী ধ্যানধারণা গ্রহণ করায় আরাকানে নবযুগের সূচনা হল। তার মহান যুগ শুরু হল। "Force of circumstances made him prefer to call himself a feudatory of the Sultans of Bengal than of the kings of Ava. He turned away from what was Buddhist and familiar to what was Mahomedan and foreign. In so doing, he loomed from the mediaeval to the modern... Contact with a modern civilisation resulted in a renaissance. The country's great age began." আরাকানীরা তাদের অহিংসবাদী বৌদ্ধ ধর্মকে যুদ্ধবাদী তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করে নেয়। শতেক বছরের মধ্যেই যখন এই যুদ্ধমতবাদ উত্তমরূপে রপ্ত হয়ে গেল তখন তারা প্রতিষ্ঠা করল এক পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য যা আরাকান সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হল। "When it was well understood, they founded what was known as the Arakanese Empire ...In 1531 Minbin (Zabauk Shah) ascended the throne. With him the Arakanese graduated in their Moslem studies and the empire was founded."[৩২]

দেবাসুরের সংগ্রামে দৈবশক্তির জয় এই হল আরাকানীদের সাধনা

আমরা জানি আরাকানীরা ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর মানুষ।[৩৩] ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর মানুষের রাষ্ট্রীক ও সামাজিক সমগ্র জীবন বুদ্ধ অনুপ্রাণিত। দেবাসুরের সংগ্রামে দৈবশক্তির জয় এই হল তাদের সাধনা।[৩৪] তাদের তান্ত্রিক ঠাকুর বা ব্রাহ্মণদের নিকট অভীষ্ট লাভের আশায় মানুষের চেয়ে আচার ও মন্ত্র অনেক বড়। তারা মন্ত্র পড়তে পড়তে মানুষের মৃতদেহকে তরবারি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটেন এবং শৃগাল-শকুন যখন সেগুলো ভোজন করে তখনও তারা মন্ত্র পাঠ করতে থাকেন।[৩৫] আচার পালনের জন্য তাদের

খড়্গ চাই, রক্ত চাই, বলির পশু চাই। মৎস্য, মাংস, মদ্য, তন্ত্রমন্ত্র, ভূতপ্রেত-পিশাচ সবই পাওয়া চাই। তাই অনার্য শিব, মহিষমর্দিনী, ছিন্নমস্তা, চণ্ডী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবী তাদের উপাস্য।[৩৬] এমনকি দৈত্য-দানবরাও তাদের উপাস্য।[৩৭]

আরাকান রাজাদের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য

১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই এক শত বছর ছিল আরাকানের ইতিহাসে অতীব গৌরবোজ্জ্বল। তখন বঙ্গোপসাগর এলাকায় মোগল শক্তির পরেই ছিল আরাকানের স্থান। "But during the short years of its greatness the century from 1540 to 1640, it was brilliant and imposing. Copying the imperial court of Delhi, its kings adopted the title of Padshah. The French traveller Fyiard who was in India at the time sums up its position in the Bay as second only to that of the Mogul."[৩৮] মির্জা নাথনের বাহারিস্তান-ই-গইবী ও বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেও আরাকান রাজাদের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যের কথা জানা যায়। তাদের বিবরণ থেকে জানা যায় আরাকান রাজ্য বিশাল এলাকা- ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। তাদের রাজ্য ছিল খুবই পরাক্রমশালী ও ঐশ্বর্যপূর্ণ। সৈন্যবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল বেশুমার। মগ রাজার ছিল দশ লাখ পদাতিক সৈন্য, পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দেড় হাজার রণহস্তী ও দশ হাজার যুদ্ধ জাহাজ। কামান ছিল অসংখ্য। আর ছোট ছোট নৌযানের সংখ্যা ছিল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতই গণনাতীত। "The Baharistan, the Fathiya and Bernier's Travels all testify to the spacious country, political preeminence, great splendour and large forces of the Arakan kings (termed as the Magh Raja). According to the Baharistan, the Arakan king possessed one million infantry, fifteen hundred elephants and ten thousand war-boats, while the Fathiya says - their cannon are beyond numbering, their flotilla exceeds the waves of the sea in number."[৩৯]

আরাকান রাজারা নিজেদেরকে বঙ্গদেশের বৈধ অধিপতি বলে মনে করতেন

আরাকান এবং বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে মোগল আমলে আরাকানের মগ রাজারা নিজেদেরকে অভিহিত করতেন বঙ্গদেশের আইনানুগ অধিপতি হিসেবে। মোগলদেরকে মনে করতেন বঙ্গদেশে জবরদখলদার।[৪০] আরাকান রাজ মেঙ রাজাগ্যি ওরফে সলিম শাহ (রাজত্বকাল ১৫৯৩—১৬১২ খ্রিঃ) নিজেকে "আরাকান, বাংলা ও ত্রিপুরার নৃপতি বলে অভিহিত করতেন।"[৪১] মেঙ রাজাগ্যি ওরফে সলিম শাহের পৌত্র আরাকানরাজ থিরি থুধম্মা ওরফে ২য় সলিম শাহ বাটাভিয়ার ওলন্দাজ গভর্নর অ্যাডামের নিকট ১৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের এক পত্রে নিজেকে বাংলা ও আরাকানের নৃপতি বলে অভিহিত করে লিখেন, "The Moguls are our enemies ...I, king in the midst of these great

countries of the great empire of Bengal, over which I rule, and of Arakan, invincible and almighty ruler of the golden house and of the red and the white elephant, ruler of my race, by name Maha Sirisudhama Raja."[৪২]

সমগ্র বর্মী জগৎও আরাকান রাজাদেরকে বাংলার ন্যায়সঙ্গত অধিপতি বলেই মনে করত। তাই পরবর্তীকালে বর্মীরা আরাকান দখলের পর আরাকান রাজাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে তারা চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ তাদের হাতে সমর্পণের জন্য ইংরেজদের নিকট দাবী জানায়। এই বিষয়ে স্মীথ লিখেছেন, "As successors of the kings of Arakan the Burmans called on Lord Hastings to surrender Chittagong, Dacca and Murshidabad in 1818 A.D."[৪৩]

মোগলদের বিরুদ্ধে আরাকান রাজাদের অবিরাম যুদ্ধ

আরাকান রাজারা জবরদখলকারী মোগলদের হাত থেকে বাংলা রাজ্য উদ্ধারের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। এই উদ্দেশ্যে ফিরিঙ্গী ও ওলন্দাজদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। "In the early part of the 17th century kings of Arakan, aware of the naval strength of the Dutch, sought their aid as allies, against the Great Mogal, with whom the Arakanese were in a continual state of war."[৪৪]

আরাকান রাজাদের চট্টগ্রাম দখল

এক পর্যায়ে পরাক্রমশালী মগ রাজারা তাদের শক্তিশালী নৌ ও স্থল বাহিনী পরিচালনা করে নিম্নবঙ্গ বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চল সরাসরি দখল করে নেন।[৪৫] দেখতে পাই, ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চল আরাকান রাজাদের শাসনাধীনেই থাকে। তখন এর শাসনভার ১২ জন স্থানীয় সামন্ত রাজার ওপর অর্পণ করা হয়। এই ১২ জন করদ রাজার নিকট থেকে চট্টগ্রামে অবস্থানরত মগ বড়লাট নিয়মিত বার্ষিক কর আদায় করতেন।[৪৬] আর রাজস্ব আধাআধি ভাগাভাগির ভিত্তিতে ফিরিঙ্গীদেরকে নিয়োগ করেন বাংলার অবশিষ্ট অংশের জায়গিরদার হিসেবে। "Many Feringis living at Chatgaon used to visit the imperial dominions for plunder and abduction. Half their booty they gave to the Rajah of Arrakan, and the other half they kept.....The king considered the Feringi pirates in the light of his servants and shared their booty ...The Feringi pirates considered the whole of Bengal as their Jagir."[৪৭]

আরাকান সম্বন্ধে বারবোসার বিবরণ

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ পরিব্রাজক দোয়ার্তে বারবোসার বর্ণনা থেকে মগ রাজাদের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। বারবোসা ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দ

থেকে ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত সফর করেন। তার বিবরণ থেকে জানা যায় মগ রাজা পৌত্তলিক ও খুব পরাক্রমশালী। তার অসংখ্য শহর ও নগর আছে। তিনি প্রায়ই তার প্রতিবেশী রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এদের অনেকেই তার বশ্যতা স্বীকার করে তাকে কর প্রদান করেন। মগ রাজা অতিশয় বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তার অসংখ্য সুন্দর সুন্দর রাজপ্রাসাদ আছে। কোন জায়গায় স্বল্পকালের জন্য অবস্থান করলেও সে জায়গায় তার জন্য থাকবে অনেকগুলো পুকুর-দীঘি ও মনোরম উদ্যানসম্বলিত রাজনিবাস। তার রাজ্যের ১২টি প্রধান নগরীর প্রত্যেকটিতে তার জন্য রয়েছে অত্যন্ত জমকালো রাজপ্রাসাদ এবং প্রতিটি প্রাসাদের দায়িত্বে আছেন একজন করে প্রাসাদাধ্যক্ষ বা গভর্নর। "The king thereof is a heathen also, and a great lord. They say that he possesses towns and cities in great number, he has also many horses and elephants to boot, which come from the kingdom of Pegu. His folk are tawny ...They are given to the use of bows (ornaments) of gold and precious stones.They worship idols and have great houses of prayer. The king is oftimes at war with the kings his neighbours, of whom some do him obeisance and some pay him tribute ...The king lives luxuriously in very good houses and wherever he may be sojourning he has many tanks of water and right pleasant gardens, for the more part in twelve chief cities of the kingdom, in each he has a very fine palace and a governour in charge thereof."[৪৮] প্রতি বছর প্রত্যেক গভর্নর তার নিজ নগরী থেকে ১২ জন কুমারীকে (যারা ঐ বছরই ১২ বছরে পদার্পণ করেছে) রাজার সমীপে পাঠান— রাজা পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে যেখানেই অবস্থান করুন না কেন। রাজা পছন্দমত কয়েকজন কুমারীকে রেখে অবশিষ্টদেরকে বিতরণ করেন উপস্থিত সভাসদদের মধ্যে। "...in twelve chief cities of the kingdom in each he has a very fine palace and a governour in charge thereof, and each one of these takes every year from his own city twelve maidens born in that year. ...These are brought up in luxury ...and every year they take to the king twelve who have reached the age of twelve years, wheresoever he may be, all are sent well washed and clean with very thin garments, in a white robe ...Early in the morning they are sent to an open space and there seated in the sun, and must stay there fasting till noon in the full force of the sun."[৪৯]

অধ্যায় ৯

মগ রাজাদের কুমারী পূজা ও সূর্য পূজা

আরাকান রাজাদের কুমারী পূজা, কুমারীদের সূর্যপূজা, সূর্যপূজকদের নিকট ১২ সংখ্যাটি অতি পবিত্র, কুমারীরা সূর্যপূজা করলে সকল বিপদ দূর হয়, কুমারী পূজা মহাদেবীর উপাসনারও অনুষঙ্গ, কোলাসুরকে বধ করার জন্য মহাকালী কুমারীরূপে আবির্ভূত হন।

আরাকান রাজাদের কুমারী পূজা ও সূর্য পূজা

আরাকান রাজারা সূর্যবংশীয়। তারা আদিশূর তথা সূর্যদেবতার বংশধর। সূর্য- দেবতার সঙ্গে কুমারী কন্যার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং দেবতাও কুমারী নারীর পূজাতেই তুষ্ট হন বেশী। কেননা পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক আদিম জাতির মধ্যেই সূর্য উর্বরতা বা উৎপাদন বৃদ্ধির দেবতা বলে কল্পিত হন। কুমারীরা দেবতার নিকট নানা ঐহিক বর প্রার্থনা করে। দেবতা বর দেন। এই উপলক্ষে মাঘমণ্ডল ব্রত উদযাপিত হয়। কুমারী ব্রতিনীগণ পুকুর বা নদীর ধারে সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত রৌদ্রে বসে থেকে ব্রতের বিভিন্ন আচার পালন করে। সূর্যমঙ্গল বা আদিত্য-চরিত নামক মঙ্গলকাব্য সূত্রে আমরা অবগত হই যে পার্বতীপুরের রাজা অনঙ্গশেখর বনে শিকারে গিয়ে সূর্যউপাসক দুই কুমারীকে লাভ করেন। একজনকে নিজের জন্য রেখে অন্যজনকে কোটালের হাতে সম্প্রদান করেন। সূর্য উপাসক এই নারীর জীবনে অনেক অঘটন ঘটে। দুঃখ আসে। কিন্তু সূর্যপূজায় অবিচল থাকায় সূর্যের কৃপায় সকল বিপদ দূর হয়। সুখ আসে। প্রথমে রাজা অনঙ্গশেখর ঘোরতর সূর্যপূজা- বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সূর্য দেবতার মৃতের প্রাণদান প্রভৃতি অলৌকিক ক্ষমতা দেখে সূর্যদেবতার প্রতি তার বিশ্বাস হয়। তিনিও তখন থেকে ভক্তিভরে সূর্য পূজা শুরু করেন এবং বাকী জীবন পরম সুখে রাজত্ব করে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে স্বর্গারোহণ করেন।[৫০]

দ্বাদশ সংখ্যাটির ওপর (কেননা সূর্য বা আদিত্যরা সংখ্যায় দ্বাদশ জন এবং দ্বাদশ সংখ্যাটি সূর্য উপাসকদের নিকট পবিত্র)[৫১] আরাকান রাজাদের অত্যধিক গুরুত্ব

আরোপ, প্রতি বছর দ্বাদশ বর্ষীয়া কুমারীদের শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়ে (কেননা সূর্য নিজে যেমন সর্বশুক্ল ঠিক তেমনি শুক্ল উপহারে তিনি তুষ্ট হন)[৫২] অভুক্ত অবস্থায় সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রখর সূর্যের নীচে বসিয়ে রাখা এবং পরে এই কুমারীদেরই কিছু রাজার নিজের জন্য রেখে বাকীদেরকে পাত্রমিত্রের হাতে সম্প্রদান করা প্রভৃতি বিষয়াদি যে সূর্যবংশীয় সূর্যোপাসক আরাকান রাজাদের রাজকীয় তথা রাষ্ট্রীয় সূর্য উপাসনারই বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি যে সূর্য উপাসকদের বিশ্বাস, কুমারীরা সূর্য-পূজা করলে সকল বিপদ দূর হয় এবং রাজ্যের রাজাও পরম সুখে রাজত্ব করে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে স্বর্গারোহণ করতে পারেন। তদুপরি এই কুমারীরা সম্ভবত আরাকান রাজাদের 'মহাদেবীর উপাসনা'-র অনুষঙ্গ 'কুমারী পূজা'র সঙ্গেও সম্পর্কিত।

আমরা সকলেই জানি যে আরাকান রাজারা তান্ত্রিক ধর্মের পরম অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তান্ত্রিক ধর্ম মহাদেবীর উপাসনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মহাদেবী জগজ্জননী, জগদ্ধাত্রী।[৫৩] বঙ্গীয় শব্দকোষে (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত) কুমারী শব্দ-সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা। সম্প্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে কুমারীত্য বিধীয়তে। কুমারী পূজা সম্পর্কে অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরাণিক অভিধানে আছে, 'কুমারী পূজা হল ষোল বছরের কম বয়সের অবিবাহিতা, অমার্তবা কন্যার পূজা। দেবী বুদ্ধিতে যে-কোন জাতির কুমারী কন্যা পূজনীয়। কুমারী পূজা ব্যতীত দেবতার পূজা বা হোম সফল হয় না। এই পূজায় কোটিগুণ ফল লাভ হয়, বিপদ দূরীভূত হয়।' পূজায় কুমারীকে খাওয়ালে ত্রিলোক ভোজন ফল হয়। তন্ত্রসার ও প্রাণতোষিণীতে কুমারী পূজার বিবরণ আছে। যোগিনীতন্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, অতীতে কোলা নামক মহাসুর সব দেবতাদের জয় করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। ত্রিদেবের কাতর আহবানে মহাকালী বললেন, 'কুমারীরূপম আস্থিতা হম্মি কোলান সবান্ধবান' অর্থাৎ কুমারীর রূপ ধারণ করে সবান্ধব কোলাকে বধ করব। তারপর ব্রাহ্মণ মেয়ের রূপ ধরে মহাদেবী কোলাপুরে গিয়ে কোলাসুরকে বললেন, 'আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে খেতে দিন।' কোলাসুর আদর করে তাকে খেতে দিলেন। বহু খাদ্যেও তিনি তুষ্ট হলেন না। তখন কোলাসুর বললেন, 'যথা তৃপ্তি ভবেৎ বালে, তাবৎ ত্বং তৎ তথা কুরু।' অর্থাৎ তোমার যাতে তৃপ্তি, বালিকা, তুমি তা-ই কর। কুমারীরূপিনী মহাকালী তখন সসৈন্য, সপারিষদ কোলাসুরকে ভোজন করলেন। সেই আনন্দে নিবাতঙ্ক দেবকুল কুমারীর পূজা করলেন। ক্রমে মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে গেল। দাশু রায়ের পাঁচালিতে একটি পঙক্তি আছে, 'কুমারী করিলে পূজা, সে পূজা পান গিরিরাজ কুমারী।' দেখা যায় কুমারী পূজা ব্যতীত দেবতার পূজা বা হোম সম্পূর্ণ সফল হয় না। এই পূজায় কোটিগুণ ফল লাভ হয়, বিপদ দূর হয়।[৫৪] এমতাবস্থায় আমাদের আলোচ্য ঐ দ্বাদশ বর্ষীয়া কুমারীরা যে তান্ত্রিক ধর্মাচরণকারী আরাকান রাজাদের দেবতার পূজায় পরিপূর্ণ সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে কুমারী পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অধ্যায় ১০

মগ রাজারা মুসলিম ভাবাপন্ন হয়ে যান

মগ রাজাদের মুসলমানী নাম ধারণ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, আরাকান রাজাদের পুকুর-দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ, গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দান।

আরাকান রাজাদের মুসলমানী নাম ধারণ

১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দে নরমেখলার মৃত্যুর পর তার ভাই মিনখরী ওরফে আলী খান রাজা হয়ে গৌড়ের অধীনতা ছিন্ন করে স্বাধীন হয়ে যান। স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরও আরাকান রাজারা সিংহাসনে আরোহণ কালে নিজেদের বর্মী নামের সঙ্গে একটি মুসলমানী নাম গ্রহণ করেন। তাদের প্রচারিত মুদ্রার এক পিঠে আরবী হরফে সে নাম এবং ইসলামী কলেমা উৎকীর্ণ করেন এবং এই রীতি ১৪০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ বছর অক্ষুণ্ন থাকে। রাজত্বকাল ও মুসলমানী নামসহ আরাকান রাজাদের নামের একটি তালিকা নীচে দেয়া হল।[৫৫]

বর্মী নাম	ভূতপূর্ব রাজার সঙ্গে সম্পর্ক	মুসলমানী নাম	রাজত্বকাল
১। নরমেখলা	রাজা থুর পুত্র	সোলেমান খান	খ্রিঃ ১৪০৪–১৪০৬ ১৪৩০–১৪৩৪
২। মিনখারী	ভাই	আলী খান	১৪৩৪–১৪৫৯
৩। বাসপিউ	পুত্র	কলিমাশাহ	১৪৫৯–১৪৮২
৪। মিন দৌলিয়া	পুত্র	মোখোশাহ	১৪৮২–১৪৯২
৫। বসনিউ	চাচা	মোহামোকশাহ	১৪৯২–১৪৯৪
৬। মিন রনৌ	মিন দৌলিয়ার পুত্র	নূরী শাহ	১৪৯৪–১৪৯৪
৭। সলিং গথু	চাচা	থেটকউক দৌলা শাহ	১৪৯৪–১৫০১

৮। মিন ইয়াজা	পুত্র	ইলিয়াসশাহ	১৫০১–১৫২৩
৯। কাসাবদি	পুত্র	ইলি শাহ	১৫২৩–১৫২৫
১০। মিন সৌও	সলিং গথুর ভাই	জলা শাহ	১৫২৫–১৫২৫
১১। থাটাসা	মিন দৌলিয়ার পুত্র	আলী শাহ	১৫২৫–১৫৩১
১২। মিন বিন	মিন ইয়াজার পুত্র	জৌবৌকশাহ	১৫৩১–১৫৫৩
১৩। ডেক-খা	পুত্র	দুস্পাঠ্য	১৫৫৩–১৫৫৫
১৪। সৌহলা	পুত্র	দুস্পাঠ্য	১৫৫৫–১৫৬৪
১৫। মিন সিথিয়া	ভাই	দুস্পাঠ্য	১৫৬৪–১৫৭১
১৬। মিন পালং	মিন বিনের পুত্র	সিকান্দরশাহ	১৫৭১–১৫৯৩
১৭। মিন ইয়াজগ্যি	পুত্র	সলিম শাহ	১৫৯৩–১৬১২
১৮। মিন খামং (মলহন)	পুত্র	উসাংশিয়া (হুসেন শাহ)	১৬১২–১৬২২
১৯। তিরিথুদম্মা (শ্রীসুধর্ম)	পুত্র	সলিম শাহ (২য়)	১৬২২–১৬৩৮
২০। মিন সানি	পুত্র	জানা যায় নি	১৬৩৮–১৬৩৮
২১। নরপতিগ্যি	জবরদখলকারী	সিকান্দর শাহ (২য়)	১৬৩৮–১৬৪৫

রোয়াইঙ্গা মুসলমানদের মতে আরাকান রাজারা মুসলমান ছিলেন

এখানে উল্লেখ্য যে আরাকান রাজাদের মুদ্রায় ফারসী অক্ষরে ইসলামী কলেমা ও মুসলমানী নাম উৎকীর্ণ করা এবং তাদের দরবারে মুসলমান মন্ত্রী নিযুক্তি থেকে আরাকানের রোয়াইঙ্গা মুসলমানদের বদ্ধমূল ধারণা যে আরাকানের উপরোক্ত মুসলমান নামধারী মগ রাজারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন।[৫৬]

আরাকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা

আরাকান রাজাদের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক রাজকর্মচারী এবং নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালী, শ্রীহট্ট-চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমীর-ওমরাহদের প্রায় সবাই ছিলেন সুফী মতাবলম্বী মুসলমান।[৫৭] এই সময়ে বাংলা ভাষাকে আরাকানীরা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। আরাকান রাজা ও তার রাজসভার সভাসদবৃন্দ বাংলা কাব্যানুরাগী ছিলেন এবং বাংলার মুসলমান কবিদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রচুর বাংলা কাব্য রচিত হয়। এদের মধ্যে সতীময়না ও পদ্মাবতী কাব্য দুটিই শ্রেষ্ঠ। এই সময়ে আরাকান রাজসভায় দুজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি কাজী দৌলত ও আলাওলের আবির্ভাব হয়। আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা

সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "চট্টগ্রাম সংলগ্ন অঞ্চল আরাকানও তখন বাঙ্গালী সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত ছিল। সেখানকার মগ রাজা ও মন্ত্রীগণ আরবী ফার্সী ভাষা হইতে বাংলা অনুবাদের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। তাদের নিকট উৎসাহ ও আনুকুল্য লাভ করিয়া আরাকান বাংলা সাহিত্য চর্চায় সেদিন একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল।"[৫৮] এই প্রসঙ্গেই ড. এনামূল হক লিখেছেন, "যেই মগেরা আজও বাঙ্গালীর নিকট বর্বর, অসভ্য ও জলদস্যু বলিয়াই পরিচিত, সেই মগ রাজাদের রাজসভায় সে সময়ে বঙ্গ-ভারতী অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। ...সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজসভায় বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ নানা দিক দিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার আপন ভূমিতে ইহা তেমনটি হয় নাই।"[৫৯] আবার প্রাবন্ধিক ও গবেষক হাবিব উল্লাহ এই বিষয়েই লিখেছেন, "বর্তমানে বার্মার অধীনে আরাকান প্রদেশটাই সেকালে রোসাঙ্গ রাজ্য হিসাবে খ্যাত ছিল। বাঙালি জাতির অনেক দুঃখ, বেদনা, আশা আকাঙ্খার আবেগী স্মৃতির সঙ্গে এখনো মিশে আছে রোসাঙ্গ রাজ্য ও রোসাঙ্গ রাজসভা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রাণকেন্দ্র এই রোসাঙ্গ রাজ্য। বাঙালি জাতির স্বকীয় ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম রোসাঙ্গ রাজ্য। স্বাধীন রোসাঙ্গ রাজ্যের শিল্প সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী বাঙালি মুসলিম সমাজ।"[৬০]

আরাকান রাজাদের পুকুর-দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ

কীর্তিলিপ্সু আরাকান রাজারা প্রজাহিতে পুকুর-দীঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ করেন এবং মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করেন। কীর্তিলাভের উদ্দেশ্যে আরাকান রাজারা গ্রন্থ রচনায়ও প্রচুর উৎসাহ যোগান। এই বিষয়ে আরাকান প্রধানমন্ত্রী নবরাজ মজলিশ বলেন,

মসজিদ পুষ্কর্ণী নাম নিজ দেশে রহে।
গ্রন্থকথা যথাতথা ভক্তিভাবে কহে ॥
গ্রন্থ পড়ি সকলের দীপ্ত হয় মন।
নাম স্মরি মহিমা করয়ে কত জন ॥[৬১]

আরাকান রাজ জৌবক শার অভিনব স্থাপত্য শৈলী প্রবর্তন

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকে আরাকানরাজ মিনবিন ওরফে জৌবক শাহ রাজধানী ম্রোহাউং নগরীকে দুর্ভেদ্য দুর্গনগরীতে পরিণত করেন। তিনি সর্বাধুনিক নৌযুদ্ধবিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগীজদেরকে নিয়োগ করে নগরীর বেষ্টনপ্রাচীর ও দুর্গপরিখা সুবিন্যস্ত করেন এবং নগরীকে শক্তিশালী কামানশ্রেণীতে সুসজ্জিত করেন। ফলে ম্রোহাউং নগরী বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য দুর্গনগরীতে পরিণত হয়। "When Minbin came to the throne he turned Mrauk-U into the strongest fortified city of the Bay, employing the Portuguese to lay out his walls and moats and to forge

and mount his cannon."[৬২] মিনবিন ম্রাকউ নগরীর সৌন্দর্য্যও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। তিনি ভারতীয় নির্মাতাদের সহায়তায় রাজধানী নগরীকে বিশাল বিশাল মন্দির ও মঠ দিয়ে সুশোভিত করে তোলেন। তবে এই সব মন্দিরের নির্মাণকৌশলে তিনি এক অভিনব রীতির প্রয়োগ করেন যে রীতি খাঁটি বৌদ্ধও নয় আবার পুরোপুরি মুসলিমও নয়, বরং অনেকাংশেই হিন্দু। তিনি হিন্দু ভিত্তির ওপর মুসলিম, বৌদ্ধ ও ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির উপাদানসমূহকে সংমিশ্রিত করে এই অভিনব স্থাপত্যশৈলীর প্রবর্তন করেন। "Minbin embellished Mrauk-U with its greatest temples and pagodas. But the architecture of the former is neither Mohamedan nor Buddhist. It is Hindu, but of so unique a design as almost to constitute a particular style. This architecture was the work of Indian builders employed by Minbin and working to his general specifications."[৬৩]

আরাকানে বিভিন্ন জাতির লোকের আগমন ও বসতি স্থাপন

রাজধানী ম্রোহাউং নগরী তখন জনবহুল সমুদ্রবন্দরে পরিণত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন জাতির লোক এসে এখানে বসতি স্থাপন করে। খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রাজধানী মিহং নগরীতে বসবাসকারী প্রসিদ্ধ বাঙালী কবি আলাউল বিরচিত পদ্মাবতী কাব্যে এই বিষয়ে আছে ঃ

নানাদেশী নানা লোক শুনিয়া রোসাংগ ভোগ,
আইসন্ত নৃপ ছায়াতল ॥
আরবী, মিসরী, সামী, তুরকী, হাবসী, রুমী,
খোরাসানী উজবেগী সকল।
লাহোরী, মুলতানী, সিন্ধী, কাশ্মিরী, দক্ষিণী, হিন্দী,
কামরূপী, আর বংগদেশী ॥
অহপাই, খোটানচারী, কর্ণলী, মলয়াবারী,
আচি, কচি, কর্ণাটকবাসী ॥
বহু শেখ, সৈয়দজাদা, মোগল, পাঠানযোদ্ধা,
রাজপুত হিন্দু নানাজাতি ॥
আতাই, বরমা, শ্যাম, ত্রিপুরা, কুকির নাম,
কতেক কহিমু ভাতিভাতি ॥
আরমানী ওলন্দাজ, দিনেরমার, ইংরাজ,
কাস্তিলান আর ফরাঙ্গিস ॥
হিসপানী, আলমানী, ছোলদার নছরানী,
নানা জাতি আছে পুত্তকিস ॥[৬৪]

জেরবাদী মুসলমান

আরাকান রাজারা বিদেশীদেরকে আরাকানী মহিলাদের সঙ্গে অস্থায়ী বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে উৎসাহিত করেন। তবে শর্ত থাকে যে তারা আরাকান ত্যাগের সময়ে স্ত্রী ও সন্তানদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না, আরাকানেই রেখে যাবে। এই সব বিদেশীদের ঔরসজাত সন্তানেরা সাধারণত জেরবাদী মুসলমান নামে পরিচিত। "Foreign residents and even visitors to Burma and Arakan were encouraged to form temporary alliance with the women of the country, but on the strict understanding that when they left the country their wives and children might not be taken away with them. ...The pious Dutch Calvinists were also not a little worried because their children left in Arakan were brought up to be Muslims."[৬৫]

আরাকান রাজধানী মিহং নগরী সম্বন্ধে মরিস কলিসের বর্ণনা

১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্ট ধর্মযাজক ফাদার ম্যানরিক আরাকানে আসেন এবং বহু বছর রাজধানী মাকু নগরীতে অবস্থান করেন। তার দিনপঞ্জীকে ভিত্তি করে লেখা মরিস কলিসের The Land of Great Image নামক গ্রন্থে আরাকান রাজধানী মাকে নগরীর সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এই গ্রন্থে আছে, "The Capital (city of Mrauk-U) was crowded too with visitors from the towns and villages and a large number of foreign merchants from the countries of the Bay— Siam, Burma, India and the Spice Islands, took the opportunity of what was expected to be a lively market and arrived in ships laden with every sort of merchandise, food, medicines, scented woods, minerals, silk, carpets, metal-work and porcelain. The goods were allowed in dutyfree.

It should be formed in mind that Mrauk-U though less substantially built was comparable in size and wealth to such western cities as Amsterdam and London. Schouten declares it the richest city in that part of Asia exceeding in its resources both Pegu and Ayudhya, the capital of Siam."[৬৬]

এই বর্ণনায় দেখা যায় যে আরাকান রাজধানী মিহং নগরী তখন আয়তন ও সম্পদে পাশ্চাত্য নগরী আমস্টারড্যাম ও লন্ডনের সমতুল্য ছিল এবং এশিয়া মহাদেশের এই অঞ্চলে এটিই ছিল সবচেয়ে সম্পদশালী নগরী। আর আরাকানী সভ্যতা-সংস্কৃতি যে তখন এক উচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল তার প্রমাণ পাই আরাকানে জাহাজ বোঝাই শুল্কমুক্ত বিলাসদ্রব্য আমদানী থেকে।

মিহং কসমপলিটান নগরীতে পরিণত হয়

মিহং নগরীতে গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ও ধর্মের লোক বসবাস করায় এই নগরী পরিণত হয় কসমপলিটান নগরীতে এবং ফলে আরাকানে জাতীয় সংস্কারমুক্ত এক

রাষ্ট্রের পত্তন হয় যা উপাদান সংগ্রহ করে যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছ থেকে ঠিক তেমনি মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের কাছ থেকেও। "It illustrates the cosmopolitan origin of the State of Mrauk-U which derived from the Hindu and the Buddhist as well as from the Portuguese and the Moslem."[৬৭]

আরাকানীরা এক সুসভ্য জাতি

আসলে আরাকানীরা এক সুসভ্য জাতি ছিল। তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যই এর সাক্ষী। এই বিষয়ে গবেষক আব্দুল মাবুদ খানের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "এ কথা সত্য যে মধ্যযুগে আরাকানের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উপর ভীষণ উৎপীড়ন করেছিল। আরাকানী জলদস্যুদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে 'মগের মুলুক' বা 'অরাজকতার দেশ' নামে একটি প্রবাদ বাক্যও চালু হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আরাকানীরা একটি সুসভ্য জাতি ছিল। আরাকানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে এই সত্য নিহিত আছে। ... সুতরাং আরাকানের সমগ্র জনগোষ্ঠী কতিপয় জলদস্যুর দুষ্কর্মের অংশীদার হতে পারে না।"[৬৮] অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে কতিপয় মগ জলদস্যুর দুষ্কর্মের জন্য গোটা মগ জাতিটাকেই ঢালাওভাবে মোগল ভারতে বিশেষ করে বঙ্গদেশে অসভ্য-বর্বর-অত্যাচারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।[৬৯] পর্তুগীজদেরকে কিন্তু করা হয় নি। এর কারণ কী?

অধ্যায় ১১

মগ রাজসভায় সুফী ও হিন্দু আধ্যাত্মিক সাধনার সম্মেলন, আরাকানী মুসলমানেরা প্রতিমা পূজক

আরাকান রাজসভায় মুসলিম ও হিন্দু আধ্যাত্মিক সাধনার সম্মেলন, হিন্দুর দেবতা হন মুসলমানের পীর, মুসলমানের পীর-নবীরা হন হিন্দুর দেবতা, ফলে আরাকানে ইসলাম একটি দেশজ ধর্মে পরিণত হয়, আরাকানী মুসলমানেরা প্রতিমা পূজক হয়ে যায়। মহামুনি প্রতিমার ওপর অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ, মহামুনি বুদ্ধ ও সূর্য অভিন্ন, মহামুনির পূজার জন্য চট্টগ্রাম থেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার ও তাদের সেবার জন্য হিন্দু শূদ্র পরিবার আনয়ন, এই ব্রাহ্মণরা সামবেদী ও বৈষ্ণব, মহামুনি ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন, আরাকান তথা মগ রাজাদের রাজ্যাভিষেক, আরাকান রাজাদের রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠান তদারকের ভার বেনারসী ব্রাহ্মণদের ওপর অর্পণ।

আরাকানে সমন্বয়পন্থী ধর্মমত ও মিশ্রদেবতাদের উদ্ভব

এই সময়ে মুসলিম ভাবাপন্ন আরাকান রাজাদের রাজসভায় ধর্মসংস্কারমুক্ত সুফী ও হিন্দু আধ্যাত্মিক সাধনার সম্মেলন ঘটে। উদ্ভব হয় সমন্বয়পন্থী ধর্মমত ও মিশ্রদেবতাদের। ফলে হিন্দুর দেবতা যেমন হয়ে যান মুসলমানের পীর ঠিক তেমনি মুসলমানের পীর-নবীরাও হয়ে যান হিন্দুর দেবতা। তাই মগ রাজদরবারের বাঙালী মুসলমান কবি অবতার হিসেবে নবীদের পাশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বুদ্ধ, রাম, কৃষ্ণকেও আপনার করে গ্রহণ করেন। এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ করেন না। কবির ভাষায়,

হিন্দুর দেবতা হইল মুসলমানের পীর।
দুই কুলে লয় সেবা হইয়া জাহির ॥[৭০]

অথবা

ব্রহ্ম হৈলা মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম
দেখিয়া চণ্ডিকাদেবী তেঁহ হইল হায়াবিবি।[৭১]

তারা হিন্দুর ধর্মদর্শন ও হিন্দুর দেবদেবীকে হিন্দুর মতই শ্রদ্ধা করেন। কৃষ্ণলীলাকে তাদের আধ্যাত্ম-সাধনার অর্থাৎ সুফী সাধনার প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গোপাল হালদার লিখেছেন, "শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের সুফী প্রভাবিত অভিজাতরাই আরাকানের আমীর-ওমরাহ নিযুক্ত হতেন। আরাকান রাজসভায় আরবী-ফারসী বিদগ্ধ এবং সুফী মতবাদের অনুরক্ত কবিদের আবির্ভাব তাই সম্ভব হয়। ...আরাকানীদের ...একটা রাজকীয় গুণ ছিল ...ধর্মসংকীর্ণতাবর্জিত অনুগ্রহ বিতরণের ব্যবস্থা। অন্তত কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ— এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল বলে মনে হয় না। ...সুফী মতবাদের ইসলাম হিন্দু প্রেমধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত ও মিলিত হয়ে তাদের নিকট অনুগ্রহমনোহররূপেই উপস্থিত হয়েছিল। ...এমনি সময়ে রোসাঙ্গের রাজসভায় ধর্মসংস্কারমুক্ত সুফী ও হিন্দু আধ্যাত্মিক সাধনার স্বাভাবিক সন্মেলন সহজ হয়ে উঠল। ...পরাগলপুরের সৈয়দ সুলতান ...সুফী সাধক আবার তিনিও রাধাকৃষ্ণের পদাবলী-গায়ক। একই সময়ে তিনিও মুসলমান ধর্মের নিয়ম-নীতি নিয়ে কাব্য লিখছেন, সংস্কৃত হরিবংশের অনুকরণে তিনি নবীবংশ লিখছেন। ..ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণও তার সেই নবীদের অন্তর্গত। ...আর তার অন্য গ্রন্থ জ্ঞানপ্রদীপ বা জ্ঞানচৌতিশা তান্ত্রিক যোগ-রহস্যের কাব্য।"[৭২]

দেখি জেবল মুলুক শামারোখ কাব্যে কবি সৈয়দ মুহম্মদ আকবর হিন্দুর দেবতাকে মুসলমান পীর-নবীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। তার মতে ফিরিস্তা হচ্ছেন নারদ, তেমনি আল্লাহ = ঈশ্বর, পয়গম্বর = দেবতা, আদম = অনাদি নর, মা হাওয়া = কালী, হজরত মুহম্মদ = চৈতন্যদেব, খাজাখিজির = শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব, আসহাবগণ (মহম্মদের সঙ্গীসাথী) = দ্বাদশ গোপাল, আওলিয়া আম্বিয়া (মুসলমান সন্তসাধক) = মুনিঋষি। কবির ভাষায় ঃ

বিনএ করিয়া বন্দি ফিরিস্তার পদ।
ছুন্নিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুতে নারদ ॥
ভক্ত সিংহাসনে বন্দি আল্লার দরবারে।
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে ॥
****
আদম বন্দি জগতের বাপ।
হিন্দুকুলে অনাদি নর প্রচার প্রতাপ ॥
মা হাওয়া বন্দম জগত জননী।
হিন্দুকুলে কালীনাম প্রচারে মোহিনী ॥
হজরত রছুল বন্দি প্রভু নিজ সখা।
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা ॥
খোয়াজখিজির বন্দম জলেত বসতি।
হিন্দুকুলে বাসুদেব শূন্যে যে প্রকৃতি ॥[৭৩]

শ্রীসুধর্ম ওরফে ২য় সলিম শাহের রাজত্বকালে রচিত কাজী দৌলতের সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী কাব্যের প্রারম্ভিক দুই তিন সর্গ বাদ দিলে এতে তার মুসলমান মানসিকতা ও সংস্কৃতির বিশেষ কোন পরিচয় নেই। এই কাব্যের আধ্যাত্ম ভাবপ্রতিবেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই হিন্দু শাস্ত্রসম্মত। তার উপমা ও দৃষ্টান্তসমূহ প্রায় সমস্তই হিন্দু পুরাণ থেকে আহৃত। তার বার মাস্যা অংশ সম্পূর্ণভাবেই বৈষ্ণব কল্পনা প্রভাবিত। হিন্দুর সামাজিক আচার-ব্যবহার, জীবনাদর্শ ও শাস্ত্রসংহিতালব্ধ নানা তথ্য তিনি যেভাবে কাব্যে রূপ দিয়েছেন তাতে তাকে হিন্দু কবি বলেই মনে হয়। সুফীসাধক মহাকবি আলাওলও যোগ-তন্ত্র-জ্যোতিষ প্রভৃতি হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ হিন্দুর নিষ্ঠা ও মন নিয়েই অনুশীলন করেন।[৭৪] মহাকবি হিন্দুর যোগতন্ত্র সাধকও ছিলেন। তিনি তার পদ্মাবতী কাব্যে যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেন

তথাত কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রারত।
সর্পরূপ ধরি রহে সুষুম্নার পথ ॥
অধোমুখ চন্দ্র তথা অমিয়া বরিষে।
উর্দ্ধমুখী হৈয়া কুণ্ডলী সব চোষে ॥
দরশন নহে পুণি শক্তি আর শিব।
এই সে কারণে মরে সংসারের জীব ॥[৭৫]

আরাকানে ইসলাম একটি লৌকিক ধর্মে পরিণত হয়

এভাবে দেখা যায় আরাকানে খ্রিষ্টান-মুসলমানের নবীবাদ হিন্দু-বৌদ্ধের অবতারবাদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায় এবং ফলে আরাকানে ইসলাম সম্পূর্ণভাবেই একটি দেশজ ধর্মে, একটি লৌকিক ধর্মে পরিণত হয়।[৭৬] "There is...intermarriage between Muslims and Burmans and this fact has given rise to a numerous Zerabadi population, the term being applied to progeny of Muslim-Burman marriages who usually profess Mohamedanism. More than one half of the Muslims live in the coastal areas, principally Arakan, where Mohamedanism has long been established as an indigenous religion."[৭৭]

বদরমোকান

এই সময়ে আরাকানের জায়গায় জায়গায় এক ধরনের অদ্ভুত যৌথ উপাসনালয় গড়ে ওঠে। এদেরকে বুদ্ধের মসজিদ বা বদরমোকান বলে।[৭৮] এই সব মসজিদকে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকলেই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। "After the 10th century the country was professedly Buddhist, notwithstanding the spread of Mohamedanism which reached Achin in 1206 and dotted the coast from Assam to Malaya with the curious mosque known as Buddermokan

(Temple) reverenced by Buddhists and Chinamen as well as Mohamedans."[৭৯]

আরাকানী মুসলমানেরা দেবীপূজক

রাজধানী ম্রোহাউং-এর নিকট কতগুলো প্রস্তরমূর্তি বিশেষত দেবীমূর্তি স্থাপন করা হয়। আরাকানী মুসলমানরা এদের সেবা করে। এদের সামনে সুরা ফাতেহা পাঠ করে। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক মাহবুব উল আলম লিখেন, "রাজধানী মাকের নিকট কতগুলি প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত করা হয়। এদের নাম সাহেবানী, মা, নানী প্রভৃতি। মুসলমানেরা এদের সেবা করিত। এখানে মানত আনিত, ফাতেহা পড়িত, বাতি জ্বালাইত, সোনার জলে এদেরকে স্নান করাইত, ডিম ও পয়সা ভেট দিয়া এদের প্রসন্নতা লাভ করিত।"[৮০] অর্থাৎ আরাকানীরা বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করেছে বটে কিন্তু কোন ধর্মই সে অবিকৃত রাখে নি। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মকে সে নিজের পছন্দমত রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে। এই দিক দিয়ে আরাকানীদের অনেকটা মিল আছে সিংহলীদের সঙ্গে। সিংহল দেশে অর্থাৎ শ্রীলঙ্কায় নানা জাতীয় লোকের বাস ও নানা ধর্মের প্রাদুর্ভাব হলেও সিংহলীরা বৌদ্ধই থেকে যায়। যদি কেউ অন্য ধর্ম গ্রহণ করল, সে মসজিদে যায়, গির্জায় যায়, মন্দিরে যায় কিন্তু আর সব বিষয়ে সে সিংহলী ও বৌদ্ধ।[৮১] ধর্মান্তর গ্রহণ করলেও সিংহলীদের মত আরাকানীরাও আর সব বিষয়ে মগ ও বৌদ্ধই থেকে যায়। সুতরাং এখান থেকে পরিষ্কার প্রমাণ মিলে যে আরাকানে ইসলাম হিন্দু ভিত্তির ওপর তথা মূর্তিপূজার ওপর গড়ে ওঠে এবং আরাকানী দেবদেবীরা সর্বজনীন হয়ে যান অর্থাৎ তারা হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সকল আরাকানীর উপাস্য হয়ে যান।

আরাকান সালতানাতে পরিণত হলেও পৌত্তলিকই থেকে যায়

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি আরাকানের মগ রাজারা গৌড় ও দিল্লীর মুসলমান বাদশাহদের অনুকরণে বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন। মুসলমানী নাম ধারণ করেন। ইসলামী কলেমা-সম্বলিত মুদ্রা জারি করেন। রাজদরবার গড়ে তোলেন গৌড় ও দিল্লীর অনুকরণে– খোজা-হারেম-দাস-জল্লাদ সমন্বয়ে। ফলে আরাকান পরিণত হয় এক সালতানাতে। তবে সালতানাতে পরিণত হলেও আরাকানের ধর্মের ভিত্তি পৌত্তলিকই থেকে যায়। তখনও রাজধানী মাকে-র মহামুনি মূর্তিটি অতিশয় উৎসাহ ও শ্রদ্ধাভরে পূজা পেতে থাকে। "Copying the imperial court of Delhi, its kings adopted the title of Padshah ...So Arakan had turned into a Sultanate. The court was shaped on Gour and Delhi; there were the eunuchs and seraglio, the slaves and the executioners. But it remained Hinayanist Buddhist. Mahamuni was still there, still fervently worshipped."[৮২]

আরাকানে মহামুনি প্রতিমার পূজা

আরাকানীদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধের দুটি নির্দিষ্ট রূপ আছে। একটি তার সাকার রূপ। অন্যটি তার নিরাকার বা শূন্য রূপ। শূন্য রূপটির নাম সুলামুনি (Sula mani) বা সুলাগিরি। সুলামুনির অবস্থান সমস্ত শহর-নগর-জনপদের বাইরে তুষিতভবন নামক স্বর্গে। বুদ্ধের শূন্য রূপ সুলামনির যারা উপাসক তারা ৬০ হাত উঁচু বাঁশ স্থাপন করে তার পূজা করে বাদ্যযন্ত্রের বিবিধ তাল-লয়-মান সহযোগে।[৮৩] বুদ্ধের সাকার রূপটির নাম মহামুনি বা মহাগিরি (Mahagiri) যা রাজা চন্দ্রসূর্য নির্মাণ করান। সমগ্র বৌদ্ধ জগতের কাছে সর্বাপেক্ষা পূজ্য এই মহামুনি প্রতিমাটি (The most revered image of all Buddhism) আরাকানের বিখ্যাত রাজধানী মাকে নগরী থেকে ১৫ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে মহামুনি নামক স্থানে একটি উঁচু ঢিবির উপর অনেক হিন্দু দেবদেবী পরিবৃত্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে এই মূর্তিটি এত বিখ্যাত হয় যে এর ওপর অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করা হতে থাকে। সমস্ত বৌদ্ধ জগতের বিশ্বাস, এই প্রতিমাটি মহাপ্রভু বুদ্ধের জীবদ্দশায় ঠিক তার অনুরূপ করে গঠন করা হয়, এবং এইটিই তার আদি সাকার রূপ। আরাকানসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকদের একটা প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে এই প্রতিমাটি আরাকান ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই মগ জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। যত দিন এই মূর্তিটি আরাকানে থাকবে তত দিন দেশটি স্বাধীন থাকবে। তাই আরাকান যখন দুর্বল ছিল তখন আক্রমণকারী বা বিনষ্টকারীর হাত থেকে মূর্তিটিকে রক্ষা করার জন্য ইন্দ্রজাল প্রয়োগ করে মূর্তির স্থানটি শত্রুর অনধিগম্য করে দেয়া হয়। এই মূর্তিটির আরাকানে অবস্থানের ফলে আরাকান সমস্ত বৌদ্ধ জগতের তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। "But the Arakanese had an old belief that if it left their country, it would synchronise with the ruin of their race. As they were not strong enough to guard it by force of arms, they employed that peculiar system of magical astrology, known as Yadaya, to protect it. They attempted to render its site unapproachable for invaders or spoilers by enveloping it in a magical net ...Arakan became a Holy Land, ...a place of Pilgrimage for the Buddhist world."[৮৪] মহামুনি প্রতিমাটি আরাকান ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই আরাকান জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে— এই প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাসই সম্ভবত আরাকানী মুসলমানদেরকে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পৌত্তলিক থেকে যেতে বাধ্য করে।

মহামুনির উদ্দেশ্যে শ্বেত পশু-পাখী বলি

বুদ্ধ মহামুনির উদ্দেশ্যে শ্বেত পশুপাখি বলি হয়। এই সব পশুপাখির মাংসে বার্ষিক ভোজ হয়। বলিদানকৃত পশুপাখির মাথার খুলি দড়িতে গেঁথে মালার আকারে ঝুলিয়ে রাখা হয় মন্দিরের চতুর্দিকে। ভোজে উপাসকরা মাদকদ্রব্য পান করে। রাষ্ট্রীয় উপাসনার অনুষঙ্গ হিসেবে প্রতি বছর একবার রাজা ও তার সভাসদবর্গ এই ভোজ ও উপাসনায় অংশগ্রহণ করেন। "The sacrifice of white animals ...to the Mahagiri Spirit...; these

animals had been killed for a feast, and their skulls were hung in strings all round the shrine; the worshippers drank intoxicants at the feast, and once a year the king and court shared in it as an act of State Worship."[৮৫] উল্লেখ থাকে যে ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মদ্যপানে বেশ অভ্যস্ত। এমনকি ভিক্ষু তথা সন্ন্যাসীরা পর্যন্ত পূজা-আচ্চার সময় দেবতার প্রসাদ মনে করে মদ গ্রহণ করে থাকেন। অন্যথায় দেবতা ক্রুদ্ধ হন বলে তাদের বিশ্বাস।[৮৬] মহামুনি বুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্বেত পশুপাখি বলি থেকে প্রমাণ হয় যে মহামুনি বুদ্ধ সূর্যদেবতার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছেন। কেননা আমরা সকলেই জানি, 'সূর্যের উদ্দেশ্যেই শ্বেত পশুপাখি বলি দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে।'[৮৭] দেখি ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ভাগ্যের লিখন খণ্ডন করার জন্য আরাকানরাজ শ্রীসুধর্ম ওরফে ২য় সলিম শাহও হাজার হাজার শ্বেত পশুপাখি বলি দেন। "Thiri Thudamma (1622-1638 A.D.) deferred his coronation twelve years because the wise assured him he would die a year after. To avert this fate, just before his coronation he sacrificed 6000 human hearts, 4000 hearts of white cows and 2000 hearts of white doves."[৮৮]

ইয়াক্ষাইং পওনা ও ইয়াক্ষাইং সত্তা

কথিত আছে যে রাজা চন্দ্রসূর্যের আমলে আরাকানের এই সুপ্রসিদ্ধ মহামুনি ফায়ার সেবা বা পূজার জন্য চট্টগ্রাম থেকে একটি হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবার ও তাদের সেবকরূপে একটি হিন্দু শূদ্র পরিবারকে আরাকানের রাজধানী ধান্যবতীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরা যথাক্রমে ইয়াক্ষাইঙ্গ পওনা ও ইয়াক্ষাইঙ্গ সত্তা নামে খ্যাত হয়। ইয়াক্ষাইঙ্গ শব্দটি রাক্ষাইন বা আরাকানের বর্মী উচ্চারণ। পওনা বা পোনা শব্দটি হিন্দু ব্রাহ্মণ শব্দের বর্মী প্রতিরূপ। সত্তা শব্দটি হিন্দু শূদ্রের বর্মী প্রতিরূপ। সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবার মহামুনির পূজারী বা সেবকরূপে আরাকানে বসবাস করতে থাকেন। মহামুনির পূজারী উক্ত ব্রাহ্মণরা মগ রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরা সামবেদী ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব। এদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ও বিগ্রহের সামনে আছে নাটমন্দির। বাঙালী ব্রাহ্মণদের পূজাপদ্ধতি অনুসারেই আরতি, ভোগ ও স্তোত্রপাঠাদি হয়। রাস, ঝুলন, জন্মাষ্টমী ও দোলের সময় পওনারা সকলে মিলে নামকীর্তন কৃষ্ণলীলাদি অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন। এরা বাঙ্গালী বৈষ্ণব হলেও নবদ্বীপে এদের গুরুপাট নেই। কুরুক্ষেত্র বা অযোধ্যাবাসী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ এদের দীক্ষাগুরু। পওনারা বাঙালীদের মতই কেউবা নিরামিষভোজী, কেউবা মৎস্যাশী। বৃথা মাংস ভোজন করেন না। রাস ও দোলের সময় প্রতি বৎসরই কৃষ্ণলীলার অভিনয় হয়। অভিনয়ের পাত্র ও পাত্রীগণ সকলেই বঙ্গদেশীয় যাত্রাওয়ালাদের মত বাদলা ও চুমকির কাজযুক্ত বিচিত্র বসন এবং তদনুরূপ চুড়া, মুকুট, কুণ্ডল, মালা, নূপুর ও বাজু প্রভৃতি অলঙ্কার পরিধান করে। কৃষ্ণ, রাধা ও সখীদের মুখমণ্ডল অলকাতিলকায় সুশোভিত করা হয়।

রাক্ষাইঙ শ্রীকৃষ্ণ

রাক্ষাইঙ শ্রীকৃষ্ণ বঙ্গদেশীয় শ্রীকৃষ্ণের মতই কিশোর, কৃষ্ণবর্ণ এবং অঙ্গাবরণশূন্য। তার শিরে সিঁথিপুচ্ছযুক্ত স্বর্ণচূড়া, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে কণ্ঠমালা ও কটিদেশে শীতবসন।[৮৯] মহামুনি বুদ্ধ প্রতিমার সেবা বা পূজার ভার বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের ওপর ন্যাস্ত হওয়ায় প্রমাণ হয় মহামুনি বুদ্ধ কৃষ্ণের সঙ্গেও অভিন্ন হয়ে যান।

আরাকান রাজাদের ব্রাহ্মণ পোষণ

মহামুনি বুদ্ধ প্রতিমার পূজারী এই সব ব্রাহ্মণ ব্যতীত আরাকান নৃপতিরা তাদের রাজ্যাভিষেক, রাজপরিবারস্থ লোকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠানে তদারকের জন্য একদল ব্রাহ্মণ পোষণ করতেন। পবিত্র ও সৌভাগ্যের প্রতীক শ্বেতহস্তীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাদের ওপর অর্পিত হয়। তা ছাড়া রাজপরিবারের আনন্দ-উৎসব, শুভ কাজের দিন-ক্ষণ-তিথি নির্ধারণ ও ভাগ্যফল গণনা করার কাজও তারা করতেন।[৯০] এই সব হিন্দু ব্রাহ্মণকে সাধারণত উত্তর ভারতের বেনারস থেকে আনয়ন করা হত।[৯১]

তথ্যনির্দেশ

১। ইতিহাস : বাইপপ : পঞ্চবিংশ বর্ষ : ১ম-৩য় সংখ্যা : ১৩৯৮ : পৃঃ ১১৬।
২। প্রাগুক্ত : পৃঃ ১১৭-১১৯।
৩। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ১-৪।
৪। ইতিহাস : বাইপপ : ত্রয়োদশ বর্ষ : ১৩৮৬ : পৃঃ ৯৫।
৫। পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি : মুস্তাফা মজিদ : ১৯৯২ : ঢাকা : পৃঃ ৯৭।
৬। ইতিহাস : বাইপপ : ত্রয়োদশ বর্ষ : ১৩৮৬ : পৃঃ ৯৫ ; প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৩।
৭। BRSFAP No.2 : PP. 485-490.
৮। ইতিহাস : বাইপপ : প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা : ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ : পৃঃ ১৬৯।
৯। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ১৩, ১৭০।
১০। BRSFAP No. 2 : PP. 485-495.
১১। Ibid : PP. 307-310.
১২। History of Burma : Harvey : P. 6.
১৩। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ২৩৩-২৩৪।
১৪। History of Burma : Phayre : PP. 19-20.
১৫। Bangladesh District Records : Chittagong : Vol. I : Serajul Islam : 1978 : Dacca : P. 105.
১৬। Journal of the Burma Research Society(JBRS) : Vol. 42 : 1959 : P. 175.
১৭। History of Burma : Phayre : P. 39 ; প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৪-৬ ; ইতিহাস: বাইপপ : ত্রয়োদশ বর্ষ : ১৩৮৬ : পৃঃ ৯৬-৯৯।
১৮। BRSFAP No. 2 : PP. 485-490.
১৯। Nalini Kanta Bhattasali Commemoration Volume : A. B. M. Habibullah : 1966 : Dacca : P. 355.
২০। মহাকবি আলাওল : নুরুল ইসলাম মানিক : ১৯৯৫ : ঢাকা : পৃঃ ৫।
২১। History of Burma : Phayre : PP. 7-9 ; প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৩৫, ৪৭-৪৯; পটুয়াখালীর রাখাইন উপজাতি: পৃঃ ১৯৪।
২২। বাংলাদেশের মসজিদ : সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : ১৯৮৭ : ঢাকা : পৃঃ ৩৪।
২৩। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ২৬-২৮ ; মুসলিম বাংলার ইতিহাস : ২য় খণ্ড : কে. আলী: ১৯৭৭ : ঢাকা : পৃ. ১২২-১৩৬ ; East Pakistan District Gazetteers (EPDG) : Chittagong : S. N. H. Rizvi : 1970 : P. 62.
২৪। প্রাগুক্ত ।
২৫। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ১২৭ ;EPDG : Chittagong : Rizvi : P. 62.
২৬। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৯০।
২৭। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৩৫, ৯৫, ১০৭ ; মহাকবি আলাওল : নুরুল ইসলাম মানিক: পৃঃ ৬; History of Burma : Phayre : PP. 7-18.
২৮। History of Burma : Phayre : PP. 7-18.
২৯। ইতিহাস : বাইপপ : ৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্যা : ১৩৭৬ : পৃঃ ৫৪।
৩০। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃ. ৩৫।
৩১। BRSFAP No. 2 : PP. 485-490.
৩২। Ibid : PP. 485-495.
৩৩। ইতিহাস : বাইপপ : পঞ্চবিংশ বর্ষ : ১ম-৩য় সংখ্যা : ১৩৯৮ : পৃঃ ১১৭।
৩৪। দেবতাত্মা হিমালয় : ১ম ও ২য় খণ্ড : প্রবোধকুমার সান্যাল : ১৯৭২ : কলিকাতা : পৃঃ ৪২১।

৩৫। দেবতাত্মা হিমালয় : ১ম ও ২য় খণ্ড : পৃঃ ৪১৩।
৩৬। প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৩৯।
৩৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ : ৪র্থ খণ্ড : সত্যজিৎ চৌধুরী : ১৯৮৯ : কলিকাতা : পৃঃ ১৮১।
৩৮। BRSFAP No. 2 : PP. 485-495.
৩৯। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : P. 243.
৪০। ইতিহাস : বাইপপ : ৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্যা : ১৩৭৬ : পৃঃ ৫৪ ; BRSFAP No. 2 : PP. 68, 75 ; History of Bengal (M.P.) : Sarkar : P. 243 ; History of Aurongzeb : Vol. III : P. 131.
৪১। ইতিহাস : বাইপপ : ৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্যা : ১৩৭৬ : পৃঃ ৫৪।
৪২। BRSFAP No. 2 : PP. 68, 75.
৪৩। The Oxford History of India : Vincent Smith : 1996 : P. 597.
৪৪। BRSFAP No. 2 : PP. 68, 75.
৪৫। Ibid : PP. 485-490.
৪৬। Ibid.
৪৭। History of Aurongzeb : Vol. III : PP. 128-132.
৪৮। BRSFAP No. 2 : P. 62.
৪৯। Ibid.
৫০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : ১৯৭০ : কলিকাতা: পৃঃ ৮৪১-৮৫১।
৫১। প্রাগুক্ত : পৃঃ ৬৫৭-৬৫৯ ; সূর্যবাদ : আতোয়ার রহমান : ১৯৯২ : ঢাকা: পৃঃ ৬৬।
৫২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য : পৃঃ ৬৪৬।
৫৩। Iconography of the Hindus, Buddhists and Jains : Gupte : P. 28 ; Erotic Sculpture of Khajoraho : Kanwar Lal : P. 28.
৫৪। সানন্দা : ১৩ জুন, ১৯৯১ : ৫ম বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা : পৃঃ ২০-২৪।
৫৫। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৩২-৪২ ; রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস: এম. এন. হাবিব উল্লাহ: ১৯৯৫ : ঢাকা : পৃঃ ৫৯।
৫৬। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৩২-৪২।
৫৭। প্রাগুক্ত : পৃঃ ৯৫ ; বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা : ১ম খণ্ড : গোপাল হালদার : ১৩৮০ : কলিকাতা: পৃঃ ১৬-১৭৩।
৫৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ১০৩।
৫৯। আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (প্রবন্ধ) : এনামূল হক : পৃঃ ২; মুসলিম বাংলা সাহিত্য : এনামূল হক : ১৯৬৫ : ঢাকা : পৃঃ ২৩৪, ২৩৯।
৬০। রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস : হাবিব উল্লাহ : পৃঃ ৫৮।
৬১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৬২: কলিকাতা : পৃঃ ৭৬০।
৬২। BRSFAP No. 2 : PP. 485-490 ; History of Burma : Phayre : PP. 7-8.
৬৩। BRSFAP No. 2 : PP. 485-490.
৬৪। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৩০-৩২।
৬৫। BRSFAP No. 2 : P. 71.
৬৬। পটুয়াখালীর রাাইন উপজাতি : পৃঃ ১৯২-১৯৪।
৬৭। BRSFAP No. 2 : PP. 486-490.
৬৮। ইতিহাস : বাইপপ : ১৫শ—২০শ বর্ষ : ১৩৮৮-১৩৯৩ : পৃঃ ৮৫।
৬৯। ইতিহাস : বাইপপ : পঞ্চবিংশ বর্ষ : ১৩৯৮ : পৃঃ ৩৫।

৭০। বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি : শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য : ১৯৬২: কলিকাতা : পৃঃ ৩৫-৩৭।

৭১। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ৭১০।

৭২। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা : ১ম খণ্ড : গোপাল হালদার : পৃঃ ১৬-১৭৩।

৭৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৭১৯-৭২৪, ৭৫৯-৭৬০, ৭৬৮-৭৬৯; বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত : ওয়াকিল আহম্মদ : ১৯৯৮ : ঢাকা : পৃঃ ১১১-১৩৯, ২১৭-২৩৮ ; বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি : পৃঃ ৩৫-৩৭।

৭৪। প্রাগুক্ত।

৭৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৭৪০, ৭৫৯।

৭৬। BRSFAP No. 2 : P. 71 ; South East Asia Race, Culture and Nation: Guy Hunter : P. 16.

৭৭। Modern Burma : J.L.Christian : P. 208.

৭৮। আরাকান রাজসভায় বাঙলা সাহিত্য : এনামূল হক : পৃঃ ৩।

৭৯। History of Burma : Harvey : P. 137.

৮০। চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল : মাহবুব উল আলম : ১৯৬৫ : চট্টগ্রাম : পৃঃ ৮১-৮২।

৮১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ : ৪র্থ খণ্ড : পৃঃ ৭১৬।

৮২। BRSFAP No. 2 : PP. 485-490.

৮৩। Ibid : PP.38, 485-490 ; দৈনিক সংবাদ : ১১ কার্ত্তিক ১৩৯২ : পৃঃ ৭ : প্রবরণা পূর্ণিমা : আব্দুল মাবুদ খান।

৮৪। BRSFAP No. 2 : PP. 38, 485-498.

৮৫। The Cambridge History of India (Mughal India) : Vol. IV : Haig & Burn : P. 487.

৮৬। তিব্বতে সওয়া বছর : রাহুল সাংকৃত্যায়ন : ১৯৮৯ : কলিকাতা : বঙ্গানুবাদ: মলয় চট্টোপাধ্যায় : পৃঃ ১৪৭।

৮৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ২৫৭।

৮৮। History of Burma : Harvey : P. 144.

৮৯। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ১৫৭-১৬৪।

৯০। প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৫৭; Modern Burma : J. L. Christian : P. 208.

৯১। History of Burma : Harvey : P. 249.

অধ্যায় ১২

আরাকানীরা তান্ত্রিক ধর্মের অনুসারী, তারা নাথ ও প্রতীক পূজক, মগ রাজা সোলেমান শার বিধবা রানী মগেশ্বরীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান

আরাকানীরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ, তারা বুদ্ধের সাকার ও শূন্য মূর্তির উপাসক, তারা নাথপূজক, আরাকানীদের প্রধান দুজন নাথের একজন পুরুষ, অন্যজন স্ত্রী, স্ত্রী নাথটি আরাকান রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আরাকানী দেব-দেবীরা সার্বজনীন, রাজা নরমেখলা ওরফে চিলমান গাজীর বিধবা রানী 'মা মগিনী' ওরফে 'মগেশ্বরী'র সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান, বাঙ্গালী হিন্দুরা মা মগিনীকে কালী দেবী হিসেবে পূজা করে, তান্ত্রিক ধর্মের প্রধান দেবতা নারী।

আরাকানীরা তান্ত্রিক ধর্মের অনুসারী

আরাকনীরা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। শৈশবকাল থেকেই তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক বালককে জীবনে অন্তত একবার মস্তক মুণ্ডিত করে কমপক্ষে এক সপ্তাহ ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করতে হয়। হলুদ বস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে থেকে ব্রতপালন করতে হয়। ফলে পরবর্তী জীবনে তারা এমন কোন ধর্মের কথা ভাবতেই পারে না যে ধর্মে প্রধান ঈশ্বর হিসেবে বুদ্ধ নেই। "From a tender age Burmese boys and girls take an active part in their religion and this feeling of Belonging lasts throughout their lives ...the Burmans were not only suspicious of foreigners but intensely hostile towards anyone who dared to preach another religion of which God, not Buddha was the founder and head."[১] তাই বাহ্যিক চাপে বা পরিবেশগত কারণে পরবর্তী সময়ে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হলেও পূর্ব সাধনার সংস্কার তারা সহজে বিস্মৃত হতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগ তাদের সারা জীবন ধরে থেকেই যায়।[২]

আরাকানীরা নাথ ও প্রতীক উপাসক

মগদের এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম মূলত লৌকিক ধর্ম। বিশেষত যাদুবিদ্যা ও লিঙ্গ-যোনী পূজা থেকে এর উদ্ভব। অবশ্য এর মধ্যে তন্ত্র থাকলেও বৌদ্ধত্ব প্রায় কিছুই ছিল না।[৩] তারা বুদ্ধের সাকার ও শূন্য মূর্তির উপাসনা করে।[৪] তারা অসংখ্য বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাবতার মূর্তির উপাসনা করে।[৫] বুদ্ধ-স্মারক ও বুদ্ধ-প্রতীকের পূজা করে। এই সব প্রতীক ও স্মারকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃত্রিম বুদ্ধপদ, পাদুকা, স্তুপ, বোধিবৃক্ষ, চক্র, চৈত্য, শূন্য রাজছত্র, সিংহাসন, থালা, নখ, অস্থি, চুল, দাঁত, পদ্মফুল ইত্যাদি।[৬] তারা পবিত্রজ্ঞানে বিভিন্ন সংখ্যারও পূজা করে। এই সব পবিত্র ও অতিন্দ্রীয় সংখ্যাকে রত্ন বলে।[৭] এ ছাড়া মগেরা বিভিন্ন নাথের আরাধনা করে। নাথ বলতে প্রেতাত্মা বা অশরীরী জীবকে বোঝায়। এরা কেউবা গোত্র বা উপগোত্রের আদি পুরুষ, কেউবা পৌরাণিক কোন রাজা বা বীরপুরুষ আবার কেউবা হিন্দু ধর্মের কোন দৈত্য-দানব-ভূত-প্রেত।[৮] মগরা বিশ্বাস করে নাথরা পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, বাড়ী-ঘর ইত্যাদির ওপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এরা কৃষি, পশুপালন ও মৎস্যশিকারে তাদের জীবনকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। তাই পূজোপচার দিয়ে এদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। আর অসন্তুষ্ট হলে রোগ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি করে মানুষকে শাস্তি দেয়।[৯] নাথের পূজা সার্বজনীন।[১০] প্রত্যেক গ্রামেরই তার নিজস্ব নাথের মন্দির আছে। ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল নাথের রানী হলেন বুদ্ধের মা মায়াদেবী।[১১] "To Burmans all nature is alive with spirits whom they call Nats. ...Every village has its Nat shrine in which food, water and flowers are placed every day.

Although strict Buddhists do not approve of Nats they had to bow to the will of the people and a definite link between Buddhism and belief in Nats was established when the mother of Buddha was proclaimed Queen of the Nats."[১২]

আরাকানীরা যুগল দেবতার উপাসক তাদের প্রধান দেবতা উমা (মাউ)

আরাকানীদের প্রধান দুজন নাথের মন্দির অতি সুন্দর বৃক্ষের ছায়ার নীচে দেখতে পাওয়া যায়। এদের একজন পুরুষ। অন্যজন স্ত্রী। সাধারণত দুটি নুড়ি পাথর এদের প্রতীক। পাথর দুটির একটি পুরুষ লিঙ্গের এবং অন্যটি স্ত্রী যোনির অনুরূপ। পূজার সময় হলুদ সুতো দিয়ে পাথর দুটির গা জড়ানো হয়। কেননা হলুদ বর্ণ হল বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র ও রাজকীয় বর্ণ। স্ত্রী নাথটিকে সর্বশক্তিমতী বলে বিশ্বাস করা হয়। তার নাম মাউ (উমা) নাথ। তিনি সমস্ত শক্তির উৎস। আরাকান রাজ্য ও রাক্ষাইং জাতির অভিভাবিকা, রক্ষাকর্ত্রী। সমস্ত বিপদাপদে তিনিই ত্রাণকর্ত্রী। আকিয়াব থেকে চট্টগ্রামগামী সড়কটি যেখানে গিয়ে মাউ নদীর মোহনা অতিক্রম করেছে, সেখানটাতে সমস্ত রাক্ষাইং জাতি

ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে এই মহাদেবীর উদ্দেশ্যে ভোগ দেয়া তাদের জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে। "Under the shade of the comeliest tree may be seen the shrine of their two Nats, one male, the other female... They are represented by two pebbles picked up from the banks of the river... Around each stone is wound some coloured thread, coloured yellow with turmeric... they are rough representations of the Lingum and Yoni... Yellow is the sacred and royal colour of Boodhism... The female is considered the most powerful and is meant to represent the Mayoo Nat, or Spirit which presides over the mouth of the Mayoo river. She is believed to be a most powerful spirit, the Guardian of Arracan from all the dangers from the sea... The road from Akyab to Chittagong crosses the mouth of the Mayoo river here all natives, whatever may be their faith, invariably make their offerings to this powerful spirit by letting loose fowls etc."[১৩] পুরুষ নাথটির নাম ওয়াৎসুং নাথ। ইনি গ্রাম দেবতা। গ্রামের রক্ষার ভার তার ওপরে অর্পিত। "The other or male spirit is styled Rwatsaung Nat or the village guardian to whom... is intrusted the care of the village."[১৪] এখান থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে রাক্ষাইং দেবদেবীরা একান্তই সার্বজনীন। তাদের নিকট হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কিংবা সাদা-কালো-স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যে কোন পার্থক্য নেই। আরো দেখা যায় রাক্ষাইং সমাজে দেব অপেক্ষা দেবীর আসন উচ্চতর। অবশ্য তান্ত্রিক ধর্মে স্ত্রী দেবতার স্থান পুরুষ দেবতার চেয়ে উচ্চতরই হয়ে থাকে।

মগেশ্বরীর পূজা

আমরা জানি, আরাকানরাজ নরমেখলা ওরফে সোলেমান শাহ ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পর ১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।[১৫] তার বিধবা রাণী অতিশয় সফল ও ন্যায়বতী রাণী ছিলেন। তাই প্রজারা তাকে এত ভক্তিশ্রদ্ধা করত যে তারা তাকে চণ্ডী দেবী তথা তারা দেবীর সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে সনাক্ত করে মা মগিনী (Ma Magini) বা মগেশ্বরী নামে তার উপাসনা করে। সাধারণত কৃষ্ণা চতুর্দশীর শনি-মঙ্গলবারে তার পূজা হয়। পূজায় কাল পাঠা বলি হয়। রক্তজবা দেয়া হয়। বাঙালী হিন্দুরা তাকে কালী দেবীর সঙ্গে অভিন্ন ভেবে তার পূজা করে। "The goddess Phra Tara or Magheswari is worshipped in many places in Chittagong by the Hindus who identify her with Kali."[১৬]

বুদ্ধ হিন্দু দেবতায় পরিণত হন

আমরা অবগত আছি যে বৌদ্ধ ধর্মে মহাযান মতবাদের উদ্ভব হলে হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বহুলাংশে দূরীভূত হয়।[১৭] বুদ্ধদেব সম্পূর্ণ হিন্দু দেবতায় পরিণত

হন। তিনি শিব, বিষ্ণু, সূর্য, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি হিন্দু দেবতার অবতাররূপে বিবেচিত ও পূজিত হতে থাকেন। হিন্দু দেবদেবীর উপাসনায় যে-সকল অনুষ্ঠান ও মন্ত্র-তন্ত্রাদি পাঠ করা হয় বুদ্ধের পূজায়ও সেরূপ করা হতে থাকে। তদুপরি বৌদ্ধ ধর্মে তান্ত্রিকতা দেখা দিলে হিন্দু ধর্মের মুদ্রা, মণ্ডল, ক্রিয়াকাণ্ড, ব্রত, নিয়ম, জপ, মন্ত্র, হোম প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মে স্থান লাভ করে।[১৮] ফলে বৌদ্ধ ধর্ম বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক শাখা হিন্দু ধর্মের তান্ত্রিক শাখার সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায়।[১৯]

তান্ত্রিকদের বিশ্বাস কলি যুগের জন্য তান্ত্রিক ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম

মুসলিম ভাবাপন্ন আরাকান রাজারা তান্ত্রিক ধর্মের পরম অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[২০] তান্ত্রিক ধর্ম মহাদেবীর পূজা-অর্চনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। "The Tantric cult, as a faith, is based upon the worship of the Great Mother." এই মহাদেবী বিশ্বের সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্যের উৎস। সৃষ্টির মূল কারণ। তিনি জগদ্ধাত্রী, জগজ্জননী। তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে দেবগণকে অসুরের অত্যাচর থেকে উদ্ধার করেন। তিনি বহুরূপা। হাজারটা রূপ তার। তিনি নর ও নারী এই উভয় রূপই ধারণ করতে পারেন। নর রূপে তিনি যেমন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-সূর্য-রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ ঠিক তেমনি নারীরূপে তিনি উমা-দুর্গা-কালী-চণ্ডী-তারা-মহেশ্বরী-মহামায়া-পার্বতী। তবে তার নর ও নারী এই উভয় রূপ থাকলেও তান্ত্রিক ধর্মের অনুসারীরা তাকে নারীরূপেই সাধারণত অর্চনা করে থাকে। "Devi...has both male and female forms. But it is in Her female forms that She is chiefly contemplated."[২১] তান্ত্রিক ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে এই কলিযুগের জন্য একমাত্র তান্ত্রিক ধর্মই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এই ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন ও এর আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন ছাড়া কারোর পক্ষেই মোক্ষ লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়। "For the earlier and better ages, (from the dialogue of Siva and Parvati) the Satyug, the Treta and the Dwapar, other scriptures like the Vedas, the Smiritis and the Purans were the right dogma. For this age, the Kalijug, the Tantric System alone was the most suitable ; and liberation was not possible except through faith in its tenets and practice of its injunctions. 'Now the sinful Kali age is upon us', says the goddess Parvati, 'when Dharma is destroyed..."[২২]

আমরা দেখতে পাই, মগ রাজা মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল রাজার ঢাকায় এসে আশ্রয় গ্রহণের সময়ে এই তান্ত্রিক ধর্মই ছিল পূর্ববঙ্গ, আরাকান এবং কামরূপের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আচরিত ধর্ম।[২৩]

অধ্যায় ১৩

মগ রাজার পালনীয় কর্তব্যসমূহ, মগ রাজা তার রাজ্যের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র অধিপতি

মগ রাজারা প্রত্যেকে এক একজন বুদ্ধাবতার, বুদ্ধাবতার হিসেবে মগ রাজার জন্য ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ, মগ রাজা আরাকান রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অভিভাবক, মগ রাজাদের 'খাতা' অনুষ্ঠান।

আরাকান রাজারা বুদ্ধাবতার

আমরা জানি আরাকান রাজারা সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তারা প্রত্যেকে একেকজন বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাবতার। একজন বুদ্ধাবতারের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হল সমগ্র মানবসমাজকে বুদ্ধের তথা ঈশ্বরের সত্যিকার পথে পরিচালিত করা। "The Bodhisattava is one who has become enlightened, acquired the Bodhi Knowledge, but who refuses to enter Nirvana since he desires to guide all mankind to the True Path of the Buddha (God)."[২৪]

আরাকান রাজার অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ

আবার বৌদ্ধদের বিশ্বাস, যিনি বুদ্ধ হন তাকে কোটিকল্পকাল বুদ্ধাঙ্কুর বা বোধিসত্ত্বরূপে জন্ম- জন্মান্তর গ্রহণপূর্বক দান-শীলাদি দশপারমিতায় পরাকাষ্ঠা লাভ করে চরিত্রের চরমোৎকর্ষ লাভ করতে হয়। এভাবে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হওয়ার অধিকারী হন।[২৫] একজন বোধিসত্ত্ব তথা একজন মগ রাজার জন্য কতগুলো অবশ্যপালনীয় আছে। এগুলো হল মঠ-মন্দির-গুহা-সড়ক-সেতু নির্মাণ, মূর্তিসংস্থাপন, গ্রন্থাগার-বিশ্রামাগার-শিক্ষালয়-বাগান প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ, রথদান, জলাশয় খনন, বাতিদান, শাস্ত্রানুশাসন মেনে চলা ইত্যাদি।[২৬] বৌদ্ধ তথা আরাকানীদের বিশ্বাস এই ধরনের দাতা ও ত্রিরত্নের পৃষ্ঠপোষককে কখনও পার্থিব কোন অমঙ্গলই স্পর্শ করতে পারে না এবং এমনকি তিনি

তার জীবদ্দশাতেই বিশ্ববিজয়ী সম্রাটও হয়ে যেতে পারেন। "Such benefactors and worshippers of the Buddha, Dharma and the Sangha shall never feel troubled by any ills of the world and they may even become ...powerful universal rulers in their lives."[২৭]

আরাকান রাজা প্রধান কুলপতি ও কুলদেবতার জিম্মাদার

বর্মী রীতি অনুযায়ী মগ রাজা ছিলেন আরাকান রাজ্যের সকল প্যাগোডা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ছিলেন মগ জাতির প্রধান কুলপতি এবং কুলদেবতার জিম্মাদার। সমগ্র রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল তার। প্রজাদের সামাজিক পদমর্যাদার মানক্রম নির্ধারণ ও বর্ণবিশুদ্ধতা সংরক্ষণ ছিল তার এখতিয়ারভুক্ত। "The king was the patriarch of the clan ; he decided questions of social precedence and caste purity, made religious sacrifices for the good of the entire tribe, and was....the custodian of the tutelary god (or goddess) of the tribe."[২৮]

খাতা অনুষ্ঠান

রাজা আইনসম্মত ধারা মোতাবেক বিচারকার্য সম্পাদন ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এভাবে রাজা প্রজাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য লাভে সমর্থ হন। আনুগত্য প্রয়োগের লক্ষে রাজা রাজকীয় আদালতের মাধ্যমে সর্বস্তরের রাজপদগুলোর মেয়াদ নবায়নের জন্য খাতা (Kadaw) নামক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। অমাত্যবর্গ, বিভিন্ন রাজকর্মচারী, মাইযুগী (উত্তরাধিকারযুক্ত ও উত্তরাধিকারমুক্ত ভূস্বামী) এবং অন্যান্যরা রাজার জন্য বিশেষ উপঢৌকনের বিনিময়ে উক্ত অনুষ্ঠানে তাদের মেয়াদ নবায়ন করে নিতেন। যারা অতি গুরুত্বপূর্ণ এই খাতা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্যর্থ হতেন, তারা রাজদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হতেন।[২৯]

অধ্যায় ১৪

যাত্রা ও যাত্রার বিষয়বস্তু, বার মাসে তের পার্বণের দেশ আরাকান, সাইংগ্রাইং উৎসব

বার মাসে তের পার্বণের দেশ আরাকান, মগ তথা আরাকানীরা যাত্রাপাগল জাতি, চতুর্দিক খোলা বর্গাকার মঞ্চকে আরাকানী ভাষায় 'যায়াতরা' বলে, যাত্রার কাহিনী ও নীতিবাণী, যাত্রার অপরিহার্য অনুষঙ্গ জুয়াখেলা, কাছিটানা উৎসব, মিছিল আর মেলার দেশ হল আরাকান, আলোর উৎসব, পিঠা উৎসব, সাইংগ্রাইং বা নববর্ষ উৎসব।

আরাকানে যাত্রা ও যাত্রার বিষয়বস্তু

আরাকানীরা অতিশয় উৎসবপ্রিয়। তারা বারো মাসে তেরো পার্বণ উদযাপন করে। এই সব পালাপার্বণের মূল আকর্ষণ হিসেবে থাকে মিছিল, মেলা, ঘোড়দৌড়, জুয়া ইত্যাদি। আরাকানীরা যাত্রাপাগল জাতি। যুগ যুগ ধরে জাঁকজমকপূর্ণ যাত্রাপালা এবং সুন্দর পোশাক তাদেরকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে আসছে। সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীতে তাদের মত এত যাত্রাপ্রিয় জাতি আর দ্বিতীয়টি নেই। "Throughout the ages pageantry and fine clothes have appealed strongly to Burmans and there is probably no race in the world so fond of theatrical shows. Performances are usually held at night in the open air and are known as Pwes. Any and every important occasion in a Burman's life is celebrated by holding a pwe ...And each religious festival... is celebrated by pwes ...all over the country. Most pwes start about 9 p.m. and last all night... The entertainment varies from slap-stick clowning to serious religious drama, based on tales of the life and teachings of Buddha... The stage (Zayat) is often no more than a square platform, about the size of a boxing ring without ropes, surrounded on all sides by a dense throng of spectators who smoke, laugh and keep up a constant buzz of chatter... But the turn for which everyone waits is the

minthami (female dancer)." যাত্রা পোয়ে নামে পরিচিত। পোয়ে সাধারণত হয়ে রাতের বেলা খোলা আকাশের নীচে যায়াত্র নামক চতুর্দিক খোলা বর্গাকার মঞ্চে। একজন আরাকানী তথা বর্মীর জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্মরণীয় করে রাখার জন্য যাত্রার আয়োজন হয়। ধর্মীয় উৎসবগুলোও যাত্রার মাধ্যমে উদযাপিত হয়। বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে যাত্রার কাহিনী রচিত হয়। যাত্রায় প্রচুর চটুল ভাঁড়ামিও থাকে। আরাকানী তথা বর্মী সাহিত্য পৌরাণিক কাহিনী, লোকগীতি এবং রূপকথায় খুবই সমৃদ্ধ। এদের ওপর ভিত্তি করে এক ধরনের মূকাভিনয় হয়, যাতে রাজা-রাণী, রাজকুমার-রাজকুমারী, দৈত্য-দানব, পরী ও নাথ অলৌকিক ও অদ্ভুত পোষাক পরে গান গায়, নাচে এবং লম্ফঝম্ফ-সহকারে দ্রুত কথা বলে যায় এবং ভয়প্রদর্শক অঙ্গভঙ্গি করে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাল মন্দকে, সত্য অসত্যকে জয় করে নেয় এবং প্রত্যেক দর্শকই খুশি হয়। প্রধান প্রধান অভিনেতা যখন বিশ্রাম গ্রহণ করেন তখন গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী, ভাঁড় ও যাদুকরেরা অর্কেস্ট্রা সহযোগে তাদের নিজ নিজ পালা করে যান। তলোয়ার হাতে মল্লযোদ্ধারা যুদ্ধের অভিনয় করেন। তবে দর্শকরা যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে সে হল বাঈজী বা মানচমী। মানচমী ধীরপদক্ষেপে মঞ্চে প্রবেশ করে নানা রকম অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য করে এবং কখনও-সখনও মুখের চুরুট কোন বন্ধুর উদ্দেশে ছুড়ে মারে। যাত্রার অনুষঙ্গ হিসেবে জুয়ার আড্ডা বসে। জুয়ায় মহিলা এমনকি শিশুরা পর্যন্ত অংশ নেয়। Women and children gamble too. তাদের মধ্যে ঘোড়ার দৌড়, মোরগের লড়াই প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয়। রাজা এবং সামন্ত প্রভুরা রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য জুয়া খেলাকে উৎসাহিত করেন।[৩০]

বার মাসে তের পার্বণের দেশ আরাকান

আরাকানীরা অতিশয় আমোদপ্রিয়। তারা বারো মাসে তেরো পার্বণের যেসব উৎসব-অনুষ্ঠান উদযাপন করে তার বিষদ বিবরণ জানা যায় আরাকানরাজ মিনইয়াজগ্যি ওরফে ১ম সলিম শার পুত্র ও উত্তরাধিকারী মলহন ওরফে হুসেন শার গুরু উগ্যা বায়ান রচিত রাতু নামক কবিতা থেকেও। এই কবিতায় আছে আরাকানে সারা বছর ধরেই উৎসব লেগে থাকে। আরাকানীরা নানা ধরনের পূজাপার্বণকে উপলক্ষ করে আমোদ-প্রমোদে মেতে ওঠে। হৈ হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। বসন্ত ঋতুতে কাছিটানা উৎসব হয়। এই উৎসব উপলক্ষে রঙবেরঙের পোশাক পরে স্বর্ণালঙ্কারে সেজেগুজে অবসরভোগী জনগণ পুরনো দিনের গান পুরনো সুরে গাইতে গাইতে দলে দলে রাজধানী মাকে নগরীতে প্রবেশ করে। ফলে সমস্ত নগরী হাসি-আর-গান ঢাক-আর-ঢোলের বাদ্যে মুখরিত হয়ে ওঠে। শরৎ হল সবচেয়ে উৎসবমুখর ঋতু। সমগ্র দেশে তখন উৎসব আর উৎসব। মিছিল আর মিছিল। মেলা আর মেলা। নতুন পোশাক পরে মূল্যবান অলঙ্কারে সেজেগুজে পরিবার-পরিজন নিয়ে দলে দলে পূজার্থীরা আসে মন্দিরে। নিবেদন করে অর্ঘ্য। অন্যরা শহরের বাইরে গিয়ে দল বেঁধে আকণ্ঠ মদ্যপান

করে মাতাল হয়ে মাতলামি করে।[৩১] এই ঋতুর শেষের দিকে হয় আলোর উৎসব। এই উপলক্ষে সারি সারি প্রদীপ জ্বেলে বাড়ীঘর আলোকিত করা হয়। আতশবাজি পোড়ানো হয়। আগুনে বেলুন আকাশে ছোড়া হয়।[৩২] হেমন্তে হয় পিঠা উৎসব। এই সময়ে পাড়ায় পাড়ায় নতুন ধানের গুড়ি কোটার ধুম পড়ে যায়। আরাকানী মেয়েরা মনের আনন্দে তখন পিঠা বানানোর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে।[৩৩]

সাইংগ্রাইং উৎসব

গ্রীষ্মে হয় সাইংগ্রাইং (সংক্রান্তি) উৎসব। এই উৎসবের মধ্য দিয়েই আরাকানীরা পুরাতন বছরকে বিদায় আর নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। আরাকানী বছরের শেষ দিন (আমাদের চৈত্রসংক্রান্তি)-এর আগের দিন থেকে শুরু এই উৎসবই হল আরাকানীদের বার্ষিক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সার্বজনীন আনন্দ উৎসব। মধ্য এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এই উৎসব তিন দিন স্থায়ী হয়।[৩৪] এই বিষয়ে লেফ্রয় লিখেছেন, "The Burman's capacity for enjoyment can best be seen during the THINGYAN festival which marks the end of the Burmese year. Thingyan always occurs in mid-April and lasts for three days."[৩৫] এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই পরবেই তারা তাদের সবচেয়ে সুন্দর ও বর্ণাঢ্য পোশাক পরে নাচে-গানে, হৈ-হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। মিষ্টি ও ভাল খাবার-দাবারের আয়োজন করে। সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ মেহমানদারি হয়। এই তিন দিনব্যাপী উৎসবের অপরিহার্য ও আকর্ষণীয় বিষয় হল, এরা দল বেঁধে নারী-পুরুষ সবাই নেচে-গেয়ে পরস্পরের প্রতি পানি ছিটায়— উদ্দেশ্য, বিগত বছরের দোষত্রুটি সব ধুয়েমুছে ছাফ করে ফেলা।[৩৬]

সাইংগ্রাইজা

আরাকানী বর্ষপঞ্জিকার ঘোষণাপত্র সাংগ্রাইজা অনুযায়ী নববর্ষের জলবায়ু , আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, মহামারী, অর্থসম্পদ, কৃষিক্ষেত্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পূর্বাভাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। সতর্কতা অবলম্বন ও নৈতিক চরিত্র সংশোধনের জন্য আহ্বান করা হয় জলে-স্থলে-গগনে। ব্যাধি-মহামারী-দুর্যোগ-দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সমবেত প্রার্থনা করা হয় মন্দিরে মন্দিরে। বিভিন্ন শক্তি-অপশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তিকে পূজা অর্পণ করা হয় রাজকীয় কায়দায় সদর রাজধানীতে। উদ্যোক্তা হন রাজা স্বয়ং। আর বিভিন্ন গ্রামে হন গ্রামের মোড়ল।[৩৭]

সাইংগ্রাইং উৎসবের আগমনে কর্মচাঞ্চল্য

সাইংগ্রাইং উৎসবের দিনগুলোতে অবিরাম বেড়ে যায় মন্দিরে আসা-যাওয়ার চাঞ্চল্য, পূজা-আর্চার ব্যস্ততা, দান-দক্ষিণা, প্রার্থনাকর্মে আত্মনিয়োগের প্রবণতা, বয়স্ক বৃদ্ধ

অক্ষম ব্যক্তিদের সেবা-শুশ্রুষা-পরিচর্যা, পরম পূজনীয় ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শনের রেওয়াজ। সমাজের বিত্তবান সম্পদশালীগণ বহুজনের সুখের আশায় দানকার্য ও মহৎ কর্মসম্পাদনে উদ্যোগী হন। গ্রামের সাধারণ মানুষেরাও সাইংগ্রাইং-এর আগমনী বার্তার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত হয়ে একত্রে রাস্তাঘাট সংস্কার, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান মন্দির-টোল-শ্মশান ঘাট-স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদির পরিচর্যা ও সংস্কারের কাজে লেগে যায়। গৃহকর্ত্রীরা নিজ নিজ ঘরের আসবাবপত্র ও বসত- বাড়ীর আঙিনা পরিষ্কারের আয়োজনে নেমে পড়ে।[৩৮]

সাইনগাইক

পাড়াগাঁয়ে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তালে তালে সাইনগাইক নামক এক ধরনের সমবেত জারিগান গেয়ে আরাকানী যুবসমাজ পুরনো বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে বরণ করে নেয় এবং সমাজকে সংশোধন-সংরক্ষণ-সৎকর্মের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। গ্রামে গ্রামে পালাগান, গীতিনাট্যের আসর বসে কয়েক রাত অবধি। বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা যেমন নৌকা বাইচ, কুস্তিখেলা ইত্যাদির আয়োজন হয় ও অন্যান্য লোকজ খেলাধুলার আসরে তারা আনন্দে মেতে ওঠে।[৩৯] সবচাইতে জমকালো নৌকা বাইচ হয় রাজধানী মাকে নগরীর দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তঙ্গা নদীতে (Thinga naddi)।[৪০]

সাইংগ্রাইং মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেতনা জাগায়

অতীতের সকল দুঃখযন্ত্রণা, হিংসাক্ষোভ, বিদ্বেশ-শত্রুতা, অভাব-অভিযোগ, উঁচুনীচু শ্রেণী-বৈষম্যের সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মনের পবিত্রতায় আত্মশুদ্ধির সঙ্গে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধন এবং পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রী-সম্প্রীতি-ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেতনা জাগ্রত করে এই সাইংগ্রাইং উৎসব।

অধ্যায় ১৫

রাজা স্বরাহণ মগী সন প্রবর্তন করেন, মগী সন একটি সৌর সন

পগাঁরাজ পোপা স্বরাহণ ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মগী সন প্রবর্তন করেন, স্বরাহণের 'আরি মতবাদ', আরি মতবাদ জনপ্রিয় করার জন্য পুরোহিতেরা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করে তা দৈববাণীর আদেশ বলে প্রচার করেন, মগী সনের দিন-ক্ষণ গণনারীতি ভারতীয় হিন্দু পঞ্জিকার অনুরূপ, সূর্য যেদিন মেষ রাশিতে প্রবেশ করে সেদিন মগী সনের নতুন বছর শুরু হয়।

রাজা স্বরাহণ বর্মী তথা আরাকানী সন প্রবর্তন করেন

বর্মী তথা আরাকানী সন ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়। প্রবর্তন করেন ব্রহ্মদেশের জবরদখলকারী পুরোহিত পোপা স্বরাহণ ওরফে ছেঙ্গা রাজা। তিনি ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পঁগা শাস করেন।৪১

আরি মতবাদ

রাজা স্বরাহণ শিন আরি নামক এক সন্ন্যাসীর নিকট আরি মতবাদে দীক্ষা নেন। আরি মতবাদ হল তিব্বতীয় গুরুবাদী মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতেরই শাখা বিশেষ, যার সঙ্গে বাংলার বামাচারী মতবাদের অনেকটা মিল আছে। আরি মতবাদ আসলে নাগ পূজাপদ্ধতি, যাতে বুদ্ধ (শিব) ও তার শক্তির মূর্তি গঠন করে পূজা হয়। স্বরাহণ নতুন ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মন্দির স্থাপন করে নাগ পূজার ব্যবস্থা করেন। সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা হয়। ভাত-তরকারি-মাদকদ্রব্য ভোগ হিসেবে দেয়া হয়। নাগ পুরোহিতেরা আরি নামে পরিচিত। আরিরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মত মন্দিরে বসবাস করেন। তারা দাড়ি রাখেন। চার আঙ্গুল দীর্ঘ চুল রাখেন। গাঢ় নীল রঙ্গের ঢিলাঢালা পোশাক পরেন। ঘোড়ায় চড়েন। মুষ্টিযুদ্ধ অনুশীলন করেন। যুদ্ধে যান এবং মাদকদ্রব্য সেবন করেন। তাদের ধর্ম যাতে জনগণ সহজেই

সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে জন্য হস্তলিখিত ধর্মশাস্ত্র রচনা করে তা বিশেষ বিশেষ বৃক্ষের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দৈববাণীর আদেশ বলে প্রচার করেন। এই কৌশল অবলম্বন করেই তারা আরি মতবাদ সমগ্র পঁগা সাম্রাজ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন।[৪২]

আরাকানী সন একটি সৌর সন

পোপা স্বরাহণ সরকার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও জনগণের ব্যবহারের জন্য বিশেষত নতুন ধর্মের পালাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র অনুযায়ী পালনের সুবিধার্থে একটি সৌর সন হিসেবে বর্মী তথা আরাকানী সনের প্রবর্তন করেন। প্রবর্তন করেন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সহায়তায়।

আরাকানী বর্ষ গণনার রীতি হিন্দু পঞ্জিকার অনুরূপ

উল্লেখ থাকে যে বর্মী তথা আরাকানীদের দিন-ক্ষণ গণনার রীতি সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয় হিন্দু পঞ্জিকার অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে এ. পি. ফেয়ার লিখেছেন, "He (Thenga Raja) introduced many improvements in the administration... The common era which he established commenced in A.D. 639 on the day when the Sun is supposed to enter the first sign of the Zodiac... This era is now observed in Burma. The reformation of the Calendar was probably brought about by the assistance of Indian astronomers. The Burmese system of astronomy and method of computing time are essentially those of the Hindus."[৪৩]

ভারতীয় হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে এক রাশি থেকে সূর্য যে সময়ে পরবর্তী রাশিতে প্রবেশ করে তাকে সংক্রান্তি বলে। সূর্য রাশিচক্র বা ক্রান্তিবৃত্তের ওপর দিয়ে চলতে চলতে যেদিন মেষ রাশিতে প্রবেশ করে, সে দিন থেকে আরাকানী নতুন বছর শুরু হয়। এই দিনটিই আরাকানীদের নববর্ষ। আর আমাদের পয়লা বৈশাখ।[৪৪] ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র সূর্যসিদ্ধান্তে আছে 'মেষাদয়ো দ্বাদশৈতে মাসাস্তৈরেব বৎসরঃ'। এই বচন অনুসারে সূর্যের মেষাদি দ্বাদশ রাশির ভোগকাল দ্বাদশ মাসাত্মক এক সৌর- বৎসর। এর পরিমাণ ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপল। জ্যোতিঃশাস্ত্রে রেবতী নক্ষত্র ভোগচক্রের অন্ত এবং অশ্বিনী নক্ষত্র ভোগচক্রের আদি বলে স্বীকৃত। সে জন্য অশ্বিনী নক্ষত্রে অর্থাৎ মেষ রাশিতে সূর্যের সঞ্চার হলে নতুন সৌর বৎসর আরম্ভ হয় এবং বৎসরের শেষ হয় সূর্যের মীন রাশিতে এসে।[৪৫] এই গণনা রীতি প্রবর্তন করেন ৪০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র সূর্যসিদ্ধান্তের জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ।[৪৬]

তথ্যনির্দেশ

১। The Land and People of Burma : C.M.Lefroy : 1963 : London : P. 19-21; বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন : ভিক্ষু সুনীথানন্দ : ১৯৯৫ : ঢাকা : পৃঃ ২৪৩, ২৫৪।

২। বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন : পৃঃ ৮৩।

৩। বিক্রমপুরের নবাব বল্লাল সেন ও ঢাকেশ্বরী মন্দির : পৃঃ ৪৪-৪৭ ;BRSFAP No. 2 : PP. 62-63.

৪। BRSFAP No. 2 : PP. 38, 485-490 ; The Cambridge History of India: Vol. IV : P. 487.

৫। History of Burma : Harvey : P. 13 ; অপরূপা অজন্তা : নারায়ণ সান্যাল : ১৯৭৩ : কলিকাতা: পৃঃ ১৫-৬০; সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্স : তীর্থপতি দত্ত : ১৯৮৪: কলিকাতা : পৃঃ ৩৬৩-৪৩৭।

৬। Essays Presented to Sir Jadunath Sarkar : II Volume : H. R. Gupta: 1958 : PP. 260-267 ; অপরূপা অজন্তা : পৃঃ ১০-১১।

৭। Journal of the Burma Research Society : Vol. 42 : 1959 : P. 49 ; Journal of the Asiatic Society of Bengal : Vol. XIII : 1844 : P. 573.

৮। The Buddhist Way of Life : Smith : P. 93.

৯। History of Burma : Phayre : PP. 1-12.

১০। BRSFAP No. 2 : PP. 529-530.

১১। বিক্রমপুরের নবাব বল্লাল সেন ও ঢাকেশ্বরী মন্দির : পৃঃ ৪৪-৪৬।

১২। The Land and People of Burma : Lefroy : P. 69.

১৩। JASB : Vol. XV : 1846 : PP. 60-62.

১৪। Ibid.

১৫। Nalini Kanta Bhattasali Comm. Volume : Habibullah : P. 335.

১৬। History of Chittagong : S. M. Ali : 1964 : Dacca : PP. 99, 140.

১৭। ভারতের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : ড. অতুলচন্দ্র রায় : ১৯৭৩ : কলিকাতা : পৃঃ ১৪৬।

১৮। ভারতের ইতিহাসকথা : ১ম খণ্ড : ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী : পৃঃ ২৪৩।

১৯। বাঙলা ও বাঙালী : অজয় রায় : ঢাকা : পৃঃ ১৭২।

২০। বিক্রমপুরের নবাব বল্লাল সেন : পৃঃ ৪৭।

২১। Erotic Sculpture of Khajoraho : Kanwar Lal : 1970 : Delhi : PP. 28, 64 ; An Iconography of the Hindus, Buddhists and Jains : Gupte : 1972 : P. 113.

২২। Erotic Sculpture of Khajoraho : PP. 62-64.

২৩। History of Bengal (M. P.) : Sarkar : PP. 227-228.

২৪। An Iconography of the Hindus, Buddhists and Jains : Gupte : P. 110.

২৫। ভারতকোষ : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৪৮৮।

২৬। Studies in Buddhism : Beni Madhab Barua : 1974 : Calcutta : P. 265; JBRS : Vol. 42 : 1959 : P. 71.

২৭। Mahavastu Avadana : Dr. Radha Govinda Basak : 1963 : Calcutta : P. Iiii .

২৮। History of Aurongzeb : Vol. III : PP. 97-98.

২৯। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা : ৩য় খণ্ড : ১৯৮৫ : ঢাকা : পৃঃ ১৩৪-১৫২।

৩০। The Land and People of Burma : Lefroy: PP. 13, 19, 22, 24-27, 57.
৩১। BRSFAP No. 2 : PP. 35-40.
৩২। The Land and People of Burma : Lefroy : PP. 25-27, 56-57.
৩৩। পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি : পৃঃ ৬৮।
৩৪। প্রাগুক্ত : পৃঃ ৬৭-৬৮।
৩৫। The Land and People of Burma : Lefroy : PP. 26-27.
৩৬। পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি : পৃঃ ৬৭।
৩৭। দৈনিক জনকণ্ঠ : ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৪ : সাংগ্রাইং ও মারমা সমাজ।
৩৮। প্রাগুক্ত।
৩৯। প্রাগুক্ত।
৪০। BRSFAP No. 2 : PP. 35-40.
৪১। প্রাচীন আরাকান ও রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৪৫।
৪২। History of Burma : Harvey : P. 17.
৪৩। History of Burma : Phayre : P. 21.
৪৪। লোকনাথ ডাইরেক্টরী : ১৩৯৯ সনের নতুন পঞ্জিকা : পৃঃ ৭, ৪৫৮ ; EPDG : Chittagong : Rizvi : PP. 118-119.
৪৫। লোকনাথ ডাইরেক্টরী, ১৩৯৯ : পৃঃ ৩।
৪৬। A Standard Calendar for India : S. K. Chatterjee : 1980 : New Delhi: P. 12.

অধ্যায় ১৬

মঙ্গৎ রায়ের আগমনের পূর্বে নিম্নবঙ্গ, মঙ্গৎ রায়ের আগমনের পর নিম্নবঙ্গ

মঙ্গৎ রায়ের ঢাকায় আগমনের পূর্বে নিম্নবঙ্গ বিরান ছিল, বাংলার সমাজে হিন্দু ধর্মের কোন একক আদর্শ ছিল না, নিম্নতর সমাজে ছিল স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্য আর উচ্চতর সমাজে ছিল পুরুষ-দেবতার প্রাধান্য, পূর্ববঙ্গে কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা বৈদিক অনুষ্ঠান ছিল না, নিরক্ষর তান্ত্রিক পুরোহিতেরা পূজাপার্বণ পরিচালনা করতেন, এই পটভূমিতেই তান্ত্রিক ধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক মঙ্গৎ রায় ঢাকায় এসে আশ্রয়প্রার্থী হন, মঙ্গৎ রায় মোগল সম্রাটের মনসবদার-জায়গীরদার-করদ রাজা হন, অশান্ত নিম্নবঙ্গে শান্তি ফিরে আসে, সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দেখা দেয়, ঢাকা শহরে সুরম্য বালাখানা ও বিক্রমপুরে জমকালো রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়।

মঙ্গৎ রায়ের আগমনের পূর্বে নিম্নবঙ্গ বিরান ছিল

১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের আইনানুগ রাজা মঙ্গৎ রায় ওরফে ধরম শাহ ওরফে বল্লাল রাজা জবরদখলদার নরপতি ও নাৎসিনমির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হাজার হাজার আরাকানী-তৈলং-ফিরিঙ্গী অনুচর নিয়ে ঢাকায় এসে আশ্রয়প্রার্থী হন। নিজ রাজ্য আরাকানের সার্বভৌমত্ব মোগল সম্রাটের হাতে সমর্পণ করে নিজেকে মোগল সম্রাট শাহজাহানের অধীনে করদ রাজা বলে ঘোষণা করেন। মোগল সম্রাটও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে মনসব ও জায়গির প্রদান করেন এবং ঢাকা নগরীতে পুনর্বাসিত করেন।

আমরা দেখতে পাই ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ মঙ্গৎ রায়ের ঢাকায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মগ-ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অবিরাম লুণ্ঠন ও ধর্ষণের কারণে নিম্নবঙ্গ সম্পূর্ণ বিরান হয়ে যায়। তখন এই অঞ্চলে সন্ধ্যা বাতি জ্বালানোর মতও কোন প্রজা অবশিষ্ট ছিল না। এই বিষয়ে স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "The Arakan pirates, both Mag and Feringi, used constantly to come by the water route and plunder Bengal. They carried off the Hindus and Muslims that they could

seize... As they continually practised raids for a long time Bengal daily became more and more desolate and less able to resist them. Not a house was left inhabited on either side of the rivers lying on their track from Chatgaon to Dacca. The district of Bakla(Bakarganj and part of Dacca) ...was swept so clean with their broom of plunder and abduction that none was left to tenant any house or kindle a light in that region."[১] অতিশয় উর্বর নিম্নবঙ্গ বিশেষ করে, দক্ষিণবঙ্গ জনশূন্য বিরান হয়ে বনে-জঙ্গলে ঢেকে যায়। "The frontier of Bengal increased the desolation, thickened the jungle, destroyed the Al and closed the road so well that even the snake and wind could not pass through."[২] উল্লেখ থাকে যে নিম্নবঙ্গ বলতে তখন পশ্চিমে ভাগীরথী-হুগলী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা, উত্তরে পদ্মা (গঙ্গা) এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর —এই চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ভূখণ্ডটিকে বোঝাত।[৩]

এই সময়ে বাংলার সমাজে হিন্দু ধর্মের একক আদর্শ ছিল না

এই সময়ে বাংলার সমাজে হিন্দু ধর্মের কোন একক আদর্শ ছিল না।[৪] নিম্নতর সমাজে ছিল নারী দেবতা চণ্ডীর প্রাধান্য। আর উচ্চতর সমাজে ছিল পুরুষ দেবতা শিবের প্রতিষ্ঠা, সেখানে নারী দেবতার কোন প্রতিষ্ঠা ছিল না।[৫]

পূর্ববঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল না

তখন পূর্ববঙ্গের মানুষ হিন্দু ছিল ঠিকই। তবে তাদের হিন্দু ধর্মের সঙ্গে রাঢ় ও গৌড়ের হিন্দু ধর্মের মিল ছিল সামান্যই। পূর্ববঙ্গের হিন্দু ধর্ম ছিল আরাকান ও কামরূপের তান্ত্রিক ধর্মেরই অনুরূপ। তখন পূর্ব বঙ্গে কোনো শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল না। কোনো সংস্কৃত ধর্মপুস্তক ছিল না। ছিল না কোন বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানও। সর্বত্রই নিরক্ষর তান্ত্রিক পুরোহিতেরাই পূজা-পার্বণ পরিচালনা করতেন। এদেরকে শাস্ত্রজ্ঞ আর্য ব্রাহ্মণেরা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। "But at the time of the Muslim conquest (1203 A.D.) and for some centuries before it, the religion of the masses in East Bengal, and indeed of many of the gentry too was Tantrik Hinduism, which could be hardly distinguished from the spirit-worship and magic of later Buddhism, as still found in Tibet. In the Hindu period, Sanskrit scholars, Hindu physicians, and eminent Brahman priests from the west freely crossed the river barrier and settled in East Bengal ; and, in the opposite direction, pilgrims from East Bengal used to visit the courts and famous shrines of West Bengal. But they represented only the thin upper crust of the society, and were concentrated in the large towns and rich monasteries of Banga-desh. But on the fall of Nadia and Gour to the Muslims even this little interchange of cultures ceased. For some time after, the mass of the people

east of the Tista and the Brahmaputra remained Hindus, but their religion was not akin to that of the Hindus of Gour or Rarh. They had no learned Brahman priesthood, no Sanskrit scriptures, no Vedic ritual. Their worship was almost everywhere conducted by illiterate animistic priests or more properly witch-doctors. Despised and neglected by the educated Aryan priesthood, with no resident Brahman clergy to look after their religious instruction or conduct their rites properly, the Hindu masses of East Bengal remained as sheep without a spiritual shepherd, just like their Mongoloid Buddhistic brethren of Kamrup and Arakan."[৬]

পশ্চিম বঙ্গেও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল

এই সময়ে রাঢ় ও গৌড়ের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও যে বৈদিক আচার পালন ও বেদের চর্চা খুব বেশী ছিল, তা নয়। তারা খুব অল্প পরিমাণেই বেদ পাঠ করতেন। অর্থাৎ সে সময়ে রাঢ় ও গৌড়েও সদাচারী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল। ঐ সময়ে সমাজে সবর্ণে বিয়ে সাধারণ নিয়ম হলেও উচ্চ বর্ণের বর ও নিম্ন বর্ণের কনের বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল না। এই বিষয়ে বিস্তৃত জানা যায় খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র রচিত স্মৃতিরত্নহার নামক গ্রন্থ থেকে।[৭]

বাংলায় কোন উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান ছিল না

এই সময়ে বাঙালীদের কোন উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানও ছিল না, একমাত্র উড়িষ্যার জগন্নাথ ভিন্ন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "গিয়াসুদ্দিন বলবনের সময় কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, মথুরা, অযোধ্যা এমনকি কাশী পর্যন্ত বড়ো বড়ো তীর্থ লোপ হইয়াছিল। প্রায় দুই শত বৎসর এ সমস্ত তীর্থ লুপ্ত ছিল। তাহার পর সেগুলিকে উদ্ধার করিতে আরো একশত বৎসর লাগে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালীরা বিশেষ রাঢ় দেশের লোকে একমাত্র জগন্নাথকেই আপনাদের তীর্থস্থান বলিয়া মনে করিত। ...আমাদের বঙ্গদেশের স্মৃতিতে অন্য তীর্থের কথা বড়ো নাই, কেবল পুরুষোত্তম তীর্থ। রঘুনন্দনের ২৮ তত্ত্বে পুরুষোত্তম তত্ত্ব একটা। তাহাতে কাশী তত্ত্বও নাই, গয়া তত্ত্বও নাই।"[৮]

মুসলিম বিজয়ের পর হিন্দু ধর্ম ম্রিয়মান হয়ে যায়

আমরা সকলেই জানি মুসলিম বিজয়ের পর খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে সুদীর্ঘ তিন-চার শত বৎসর ধরে কোন রাষ্ট্র বা রাজবংশই সমসাময়িক হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির কোন পোষকতা করে নি। ফলে মুসলমান আধিপত্যে রাজকীয় পোষকতার অভাবে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি পঙ্গু, দুর্বল ও ম্রিয়মান হয়ে যায়।

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম

এদিকে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকে মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মত দেখা দেয় শ্রীচৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম।[৯] চৈতন্যদেব হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে সমগ্র হিন্দু সমাজকে চণ্ডাল-মুচি-ম্লেচ্ছ-যবন-বৈশ্য-কায়স্থ-ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের ও ধর্মের মানুষকে কৃষ্ণের প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক সমতলে এক কাতারে দাঁড় করাতে চান। তিনি জোর গলায় প্রচার করেন :

মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।

হিন্দু সমাজের জাত-বর্ণ-মত-পথের বিভেদ তুলে দেয়ার জন্য তিনি বলেন :

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে ॥[১০]

বর্ণাশ্রম প্রথা তুলে দেয়ার জন্য এই সময়ে অসবর্ণ বিয়ে পর্যন্ত উৎসাহিত করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচারের ফলে তখন বঙ্গদেশ অসংখ্য মহান্ত, বৈরাগী, বৈষ্ণবী, দেবালয়ের সেবক ও অনুসেবকে ভরে যায়।[১১]

ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের ত্রাণকর্তারূপে বল্লালের আবির্ভাব

এই সময়ে এই ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা রক্ষা করার জন্য একজন ত্রাণকর্তা বা সংস্কারকের আবির্ভাব প্রকটভাবে অনুভূত হয়। আর তাই সেই ত্রাণকর্তারূপে কলিযুগে আবির্ভূত হন তান্ত্রিক ধর্মের পরম অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক বল্লাল সেন (ওরফে মঙ্গৎ রায়)। এই বিষয়ে দানসাগর গ্রন্থের উপসংহারে একটি শ্লোকেও বলা হয়েছে— "কলিযুগে বল্লাল সেন-নামা শ্রী ও সরস্বতী পরিবৃত প্রত্যক্ষ নারায়ণের আবির্ভাবই হইয়াছিল ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য এবং নাস্তিকদের (বৌদ্ধ, নাথপন্থী প্রভৃতিদের) পদোচ্ছেদের জন্য।"[১২] গবেষক ড. অঞ্জলি চ্যাটার্জির ভাষায়— "Ballal Sen is said to have come as a great reformer of this decadent Hindu Society of Bengal. In order to revitalise the moribund society he introduced Kaulinya."[১৩] এ কারণেই আমরা দেখতে পাই খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার রুদ্ধ হয়ে যায় এবং মাতৃদেবতার পূজা প্রাধান্য লাভ করে। "The very spirit of Vaishnavism with which Chaitanya embraced the Chandalas and Muslims and admitted them as his disciples vanished in the post Chaitanya period."[১৪] শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে লিখেছেন, "সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি বাঙালীর মানস চেতনায় বৈষ্ণব ভাবপ্লাবন অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিল ও তাহার ভক্তিরসধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইল। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা জাতীয়

জীবনে উহার পূর্বপ্রভাব হারাইল ও উহার পরিবর্তে মাতৃদেবতার পূজা প্রাধান্য লাভ করিল।"[১৫] এই সময়ে বাঙালী হিন্দুর সামাজিক জীবনে নব সংস্কার প্রবর্তিত হয়।[১৬] বর্ণাশ্রম প্রথার ভিত্তিতে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম পুনর্গঠিত হয়। কেননা বর্ণাশ্রমই আর্য সমাজের ভিত্তি, শুধু ব্রাহ্মণ্য সমাজেরই নয়, জৈন ও বৌদ্ধ সমাজেরও।[১৭]

মঙ্গৎ রায়ের ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ঐতিহ্যগতভাবেই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক-পৃষ্ঠপোষক মগ রাজা মঙ্গৎ রায় (ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল কাশেম) এবং তার বিপুল সংখ্যক আরাকানী ও তৈলং অনুচর তাদের বাসভূমি চট্টগ্রাম-আরাকান মুল্লুক ছেড়ে শরণার্থী হয়ে ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করেন। স্বভাবতই তাদের উপাস্য দেবদেবীরাও ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে শরণার্থী হয়ে এসে উপস্থিত হন। মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল সেন ঢাকায় এসে মোগলদের করদ রাজা হন। হন মোগলদের মনসবদার ও জায়গিরদার। তার নেতৃস্থানীয় মগ অনুচরেরাও তাদের স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে হন ছোট বা বড় মনসবদার ও জায়গিরদার অর্থাৎ বঙ্গে তারা হন শাসক। এমতাবস্থায় তাদের আর্থসামাজিক শক্তি নিঃসন্দেহেই স্থানীয় হিন্দু সমাজের চেয়ে অনেক অনেক বেশী ছিল। শুধু তা-ই নয়, তাদের সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসও ছিল স্থানীয় জনগণের থেকে অনেক প্রবল, উদার ও সমন্বয়মূলক। তাদের দেবতারা ছিলেন মিশ্রদেবতা। তাদের ধর্ম ছিল সুসংগঠিত যুদ্ধবাদী তান্ত্রিক ধর্ম যে ধর্ম মহাদেবীর পূজা-অর্চনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যে ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল নানা জীববলি বিশেষ করে নরবলি এবং যে ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মগ রাজা স্বয়ং।

শরণার্থী আরাকানরাজ মঙ্গৎ রায় (ওরফে বল্লাল রাজা) ও তার হাজার হাজার আরাকানী ও তৈলং অনুচর তাদের মিশ্র স্থাপত্যরীতি, মিশ্র ধর্ম, মিশ্র সংস্কৃতি, মিশ্র দেবদেবী, তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি বিশেষ করে নারী দেবতার পূজাপদ্ধতি, কৃষ্ণলীলা, জন্মাষ্টমী, রাস, ঝুলন, দোল, নববর্ষ, চৈত্রসংক্রান্তি, হালখাতা, মিছিল, মেলা, যাত্রা, বাঈজী নৃত্য, ঘোড়দৌড়, মোরগের লড়াই, জুয়া, রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠান ইত্যাদির ঐতিহ্য ও রীতিনীতি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ঢাকায়। রাজা মঙ্গৎ রায় এসেছেন এখানে 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পোষকতা ও ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থা অর্থাৎ বর্ণাশ্রম প্রথা বা বর্ণবিশুদ্ধতা রক্ষণ ও পালন রাজার কর্তব্য'[১৮] এবং 'সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পবিত্র গ্রন্থসমূহ স্থানীয় জনগণের ভাষায় অনুবাদ করলে পাপ হয় না বরং পুণ্য হয়' এই মগ ঐতিহ্যগত মানসিকতা ও বিশ্বাস নিয়ে।[১৯] মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল সেন মোগলদের মনসবদার, জায়গিরদার ও করদ রাজা হয়ে তার শত সহস্র আরাকানী ও তৈলং অনুচর সমেত বঙ্গদেশে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করেন। ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় এই শরণার্থীরা আর কখনও আরাকানে ফিরে যেতে পারেন নি। ফলে যদিও প্রথমে তারা

এসেছিলেন সাময়িকভাবে তবু তাদের এই আগমন পরিণত হয় প্রত্যাবর্তনহীন এক যাত্রায় এবং তারা পরিণত হন এই অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীতে। ফলে স্থানীয় জনগণের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন হয়ে যায়।

মঙ্গৎ রায় পূর্ববঙ্গকে জনবহুল ও আবাদী করে তুলেন

এমতাবস্থায় তিনি ও তার আরাকানী ও তৈলং অনুচরেরা মিলে যে ঢাকাকে কেন্দ্র করে জনবিরল ও পতিত নিম্নবঙ্গ তথা পূর্ববঙ্গকে জনবহুল ও আবাদী করে তুলবেন, নিম্নবঙ্গে নতুন নতুন গ্রাম ও জনপদ গড়ে তুলবেন, রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়াসে গ্রামে গ্রামে তান্ত্রিক তথা লৌকিক দেবদেবীর মূর্তি বিশেষত মাতৃদেবতাদের মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন (অর্থশাস্ত্রে আছে মৌর্য রাজারা অতিরিক্ত টাকার দরকার হলে কোন মূর্তি খাড়া করে দিয়ে রটিয়ে দিতেন যে, ইনি বড় জাগ্রত দেবতা। লোকে মানত করে টাকা-পয়সা দিলে সেগুলো রাজকোষে জমা হত।)[২০], স্থানে স্থানে জমিদারের কাছারী বা খাজনা আদায়ের কার্যালয় স্থাপন করবেন, মন্দির নির্মাণ ও দেবদেবীর পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূমিদান করবেন (মগ রাজার রাজ্যের সকল ধর্মের প্রজাদের জন্য ধর্মগৃহ নির্মাণ ও সংরক্ষণ ছিল মগ রাজার দায়িত্ব। এই সব ধর্মগৃহের সকল পুরোহিত/ইমাম/ মোয়াজ্জেন/খাদেম ছিলেন রাজার বেতনভুক কর্মচারী। বিভিন্ন শাস্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য রাজা পণ্ডিত নিয়োগ করতেন। এই সব পণ্ডিতরাও ছিলেন মগ রাজার বেতনভুক কর্মচারী।)[২১], ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তরের প্রলোভন দিয়ে গ্রামে গ্রামে অনুগত সব ব্রাহ্মণের বসতি প্রতিষ্ঠা করবেন (বাঙলাদেশে মদদ মাশগুলোর সংখ্যায় দেখা যায় বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক প্রদত্ত মদদ মাশের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী।)[২২], তান্ত্রিক তথা লৌকিক দেবদেবীর পূজাপার্বণ উচ্চতর হিন্দু সমাজে লোকপ্রিয় ও সর্বপ্লাবী করার জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ-পুরাণ-উপপুরাণ-মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায় রচনা করাবেন, উৎসব-মিছিল-মেলা-যাত্রার আয়োজন করবেন এবং এই সব পূজা-পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠান দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র অনুযায়ী পালনের সুবিধার্থে একটি সমন্বয়মূলক সন প্রবর্তন করবেন এটাই স্বাভাবিক। আমরা দেখি করেনও তিনি তাই। সে কারণেই খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের ঢাকার শাহী ঈদগাহ মসজিদ[২৩], বড় কাটরা[২৪], ছোট কাটরা, হুসেনী দালান[২৫], অসমাপ্ত লালবাগ কেল্লা, পরী বিবির মাজার ও এর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গুহা ও অনুচ্চ টিলা[২৬], আতিশখানা মহল্লার দ্বিতল মসজিদ, চুরিহাট্টার বুলা খানের মসজিদ[২৭], কলতাবাজার গাড়িখানা মসজিদ[২৮], লক্ষ্মীবাজারের লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর দ্বিতল মন্দির, ঢাকেশ্বরী মন্দির[২৯], রমনার কালী মন্দির[৩০], রমনার গেইট[৩০ক], ঠাটারী বাজারের জয়কালী মন্দির, সিদ্ধেশ্বরীর কালী মন্দির, কমলাপুরের কালী মন্দির, মনিপুরীপাড়ার মগ স্তম্ভ[৩১], শাঁখারীবাজার[৩২], শনির আখড়া, দিল্লীর রাজকীয় মিছিলের আদলে ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল-মুহররমের মিছিল-ঈদের মিছিল[৩৩], বিক্রমপুরের

রাজাবাড়ীর মঠ, চাচৈতলার কালী মন্দির, রামপাল দীঘি[৩৪], কোদাল ধোয়ার দীঘি[৩৫], কেশার মার দীঘি, পূর্ব-পশ্চিম দীঘালী ধামারণ দীঘি, কাচকীর দরজা সড়ক[৩৬], রাজনগরের রাজবাড়ী-বহরের রাজবাড়ী-জপসার রাজবাড়ী[৩৭], সোনারগাঁয়ের কারুকার্য্য খচিত প্রস্তরময় রথ[৩৮], তালতলার পুল-আব্দুল্লাপুরের পুল[৩৯], পাগলার পুল, টঙ্গির পুল, ইদ্রাকপুর কেল্লা[৪০], হাজীগঞ্জ কেল্লা[৪১], বাংলা সন, হাল খাতা, সন বলালি[৪২] ইত্যাদি বল্লাল রাজার অমর কীর্তি বলে জনশ্রুতি আছে।

মগ রাজা মিণ্ডনের কীর্তিসমূহ

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কোন কীর্তিলিপ্সু ও ধর্মপরায়ণ মগ রাজার পক্ষে তার রাজত্বকালে শত-সহস্র পুকুর দীঘি খনন ও মঠ-মন্দির-মূর্তি প্রতিষ্ঠা তেমন কোন অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মগ রাজা মিণ্ডনের কীর্তিসমূহও। এই বিষয়ে লেফ্রয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "The next twenty years passed in a whirl of frenzied building activity. An army of architects, sculptors, painters, carpenters, bricklayers, woodcarvers and stonemasons toiled without rest, day and night, and pagodas, monasteries, statues of Buddha and other monuments rose up from the barren ground like mushrooms after a shower of rain. Around the foot of Mandalay Hill the number of pagodas runs into so many hundreds that the mind boggles. It can't be true, you exclaim. I must be dreaming, and you give yourself a sharp pinch. But it is true enough and you descend from the hill marvelling at all the wealth and religious fervour lavished by king Mindon on Mandalay."[৪৩]

বল্লাল রাজা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করেন

মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল রাজা রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাংলার হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজকেও পুনর্গঠিত করেন। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, "বল্লাল সেন হিন্দু সমাজকে নূতনভাবে গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ...এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সামাজিক আচার ব্যবহার বিবাহ প্রভৃতি নানা বিষয়ে কুলীন শ্রেণীর লোকদিগকে কতগুলি বিশেষ রীতিনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইত। ন্যায়পরায়ণতা, জাতিগত পবিত্রতা, সততা প্রভৃতি সদগুণের বৃদ্ধি করাই ছিল এই সকল রীতিনীতির মূল উদ্দেশ্য। বল্লাল সেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই ধর্ম প্রচারের জন্য তাহার চেষ্টার অন্ত ছিল না এবং এই জন্য তিনি মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা ও নেপালে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিদ্যার প্রতিও তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।"[৪৪]

বল্লাল রাজার আমলে নিম্নবঙ্গে শান্তি ফিরে আসে

আমরা দেখতে পাই, মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল রাজার ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় এসে আশ্রয় গ্রহণের পর নিম্নবঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের লুণ্ঠন ও অত্যাচার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।[৪৫] "During this period of Arakanese hegemony they conducted systematic raids in the south-eastern areas of Bengal. The transfer of capital to Dacca partially checked this and was temporarily put to an end with defection of Matak rai, the Magh Governor of the Arakanese who acknowledged the Delhi Sultan in 1638 A.D."[৪৬] শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসে। প্রাচুর্য্য দেখা দেয়।[৪৭]

সুবাদার শাহ্ শুজা ও তার প্রতিনিধি নবাব আবুলের আমলের অকল্পনীয় সুখ-সমৃদ্ধি

এই সময়ে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ) বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা বাহাদুর গাজী।[৪৮] সুজা অতিশয় উদার, পরধর্মসহিষ্ণু, শিয়া ও সুফীমতাবলম্বী ছিলেন।[৪৯] দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই শাহ সুজা রাজধানী ঢাকা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত করে সেখান থেকেই রাজ্য শাসন করতেন। আর তার প্রতিনিধি মীর আবুল কাশেম তাবাতাবাই আল হুসেনইনী আল সমনী ঢাকায় অবস্থান করে নিম্নবঙ্গ শাসন করতেন। "During the Subadari of Shah Shuja the prince himself stayed at Rajmahal, but his agent Mir Abul Qasim lived at Dacca and ruled from this place."[৫০] এদের সত্যনিষ্ঠ শাসনে বৈদেশিক আক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এবং অভ্যন্তরীণ নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাংলার প্রজাসাধারণ এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, যা তারা এর আগে অন্য কোন মুসলমান শাসকের অধীনে লাভ করে নি।[৫১] এই সময়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে,

রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল সুজা,
পরম কল্যাণে যত আছিল প্রজা।[৫২]

এই সময়েরই ন্যায় বিচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে গদাধর দাস তার 'জগন্নাথ মাহাত্ম্য' নামক কাব্যে ১৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে লিখেন,

রাজা চক্রবর্তী শাহজাহাঁ দিল্লীপতি।
ধর্মন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতি ॥[৫৩]

এই সময়ে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিরও অভূতপূর্ব উন্নতি হয় এবং সরকারের রাজস্ব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। "The imperial peace maintained in Bengal during these twenty years led to a silent but steady growth of its wealth ; trade expanded vastly."[৫৪] ঢাকা অঞ্চল সমগ্র বাংলার শস্যভাণ্ডার বলে খ্যাতিলাভ করে।[৫৫]

নবাব আবুলের আমলে ঢাকায় অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ইমারত তৈরী হয়

দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্পকলা ও রুচিরও উন্নতি হয়। শুজার রাজদরবার ঢাকাতে না থাকা সত্ত্বেও এই যুগ ছিল ঢাকার জন্য অত্যন্ত সমৃদ্ধির যুগ। এই সময়ে ঢাকায় অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন ও গুরুত্বপূর্ণ ইমারত তৈরী হয়। "For nearly 20 years, with a short break, Shah Shuja ruled over Bengal. In spite of the absence of the viceregal court, this was apperantly a period of prosperity for the city of Dacca and several of its important buildings date from this time."[৫৬] এই সব ইমারত নির্মিত হয় ঢাকার তদানীন্তন নবাব মীর আবুল কাশেমের উদার পৃষ্ঠপোষকতায়। নবাব আবুলের আমলে নির্মিত স্থাপনাসমূহের মধ্যে মাত্র ৪টি ইমারতের পরিচয়-জ্ঞাপক শিলালিপি পাওয়া যায়। এই ইমারত ৪টি হল : ঢাকা নগরীর বড় কাটরা, হুসেনী দালান[৫৭], ধানমণ্ডির শাহী ঈদগাহ মসজিদ এবং চুরিহাট্টার বুলা খানের মসজিদ[৫৮]। এই ইমারত ৪টির মধ্যে নবাব আবুল স্বয়ং বড় কাটরা ও শাহী ঈদগাহ মসজিদ নির্মাণ করান। ১৬৪০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত শাহী ঈদগাহ মসজিদের ফারসী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির অংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

যে বংশ স্বর্গীয় সদ্ধর্মের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় কীর্তিমান,
সে বংশেরই বংশধর মীর আবুল কাশেম আল সিমনান।
তার যোগ্যতার বলে যে সব কার্য্য করেছেন সম্পাদন—
তা এই পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে আছে মুদ্রিত,
হয়েছে সকলের আলোচনার বিষয়ে পরিণত।[৫৯]

দেখা যায় নবাব আবুল তার এই বিখ্যাত শিলালিপিতে দাবী করেন যে তার পূর্বপুরুষেরা স্বর্গীয় সদ্ধর্মের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিও তার পূর্বপুরুষদের মত এই পৃথিবীতে স্বর্গীয় সদ্ধর্মের পথে যে-সকল কার্য সম্পাদন করেন তার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তার কীর্তিসমূহ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই একই শিলালিপিতে নবাব আবুল বলেন,

"Know all, that the power to build it was given
Solely to him as a gift by high Heaven."

—"সবাই জেনে রাখুন! এত বিশাল একটি মসজিদ নির্মাণের ক্ষমতা শুধুমাত্র তাকেই দেয়া হয়েছে এবং তা দেয়া হয়েছে স্বর্গের দান হিসেবেই।" শিলালিপিতে এমন দম্ভপূর্ণ উক্তি কে করতে পারেন? অতিশয় প্রতাপশালী ও কীর্তিমান কোন রাজা বা রাজপুরুষ ভিন্ন অন্য কারোর পক্ষে এমন দর্পভরে উক্তি করা কি সম্ভব?

আবার ১৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত ঢাকার বিখ্যাত বড় কাটরার ফারসী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ করলে পাওয়া যায় :

এই ইমারতের নির্মাণকাল আমি খোঁজার চেষ্টা করি যখন
আমার স্থপতি-মন বিস্ময়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে তখন।[৬০]

এখানে 'আমার স্থপতি-মন' এই কথা দিয়ে এটাই বোঝানো হয় যে নবাব আবুল স্থাপত্যশিল্পের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অর্থাৎ তার হাতে অসংখ্য ইমারত নির্মিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল এই যে জনশ্রুতি থেকে কিন্তু কোন কীর্তিমান শাসকের নাম হিসেবে 'আবুল' এই নামটি পাওয়া যায় না। যে নামটি অত্যন্ত কীর্তিমান ও জনপ্রিয় নাম হিসেবে পাওয়া যায় তা হল 'বল্লাল'। এই বিষয়ে শ্যাম পণ্ডিতের নিরঞ্জনমঙ্গল নামক মঙ্গলকাব্যে আছে :

বল্লাল সেনের গোষ্ঠী যার সৃষ্টি অনাসৃষ্টি
যার কীর্তি ঘোষে সর্বলোক ॥[৬১]

এই বিষয়ে ঐতিহাসিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' গ্রন্থেও আছে: "বাঙালাদেশে বল্লাল সেনের মত পরিচিত কোন হিন্দু রাজা নাই। বল্লালের ইতিহাস বাদ দিলে বঙ্গের হিন্দুর ইতিহাসে কিছু থাকে না।"[৬২]

নবাব আবুলের আমলে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়

দেখি এই সময়ে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য উদার পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। এই পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন বহিরাগত শাসকশ্রেণী। বিমল কুমার দত্তের ভাষায়— "Political and social conditions of Bengal during the time of Pala and Sena rulers compelled the people's art to be trampled down by the hieratic school. But the living tradition was pulsating with life and waiting for an opportune moment to express itself in all its vigour, richness and dynamic quality.

17th century of Bengal gave them the opportunity and along with the vernacular literature and pictorial art, the terracotta art also expressed itself in all vigour and joy of freedom. The art was patronised by the alien ruling class and a new born group of Hindu landlords and merchants. The art of the court was pushed to the background."[৬৩] এই সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনব সব মন্দির ও রথ নির্মিত হয়। মন্দিরগুলো পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, শতরত্ন, একুশরত্ন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। বিমল কুমার দত্ত এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "Among the above mentioned types five and nine towered temples were very common in the 17th and 1st half of the 18th century A.D. Besides the templestructures, Raths made of stone and brass were found in Assam and Bengal. On the bank of the Brahmaputra near Mograpara the ruined remains of a Ratha

made of stone is still existing. It is said that Maharaja Ballal Sen II, constructed the Ratha."[৬৪] রত্নমন্দিরের ইতিহাস আলোচনা করলে পরিষ্কার দেখা যায় যে মগদের দেশ আরাকান তথা বর্মায় বিপুল সংখ্যায় রত্নমন্দির নির্মিত হয় খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শত শত বছর পূর্ব থেকেই। মন্দির তো বটেই এমনকি এখানকার রাজপ্রাসাদসমূহ পর্যন্ত রত্নমন্দিরের আদলে নির্মিত হয়।[৬৫] কিন্তু বাংলায় রত্নমন্দির ব্যাপকভাবে নির্মিত হয় খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে[৬৬] যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত বিক্রমপুরের রাজনগর, বহর ও জপসার রাজবাড়ীর রত্নমন্দিরসমূহ।[৬৭]

কারা ঐ বহিরাগত শাসক শ্রেণী

আমরা সকলেই জানি, মোগল আমলে সুবাদার, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও মনসবদারগণ দিল্লী-আগ্রা-লাহোর থেকে নিযুক্ত হয়ে অল্প কয় বৎসরের জন্য বঙ্গদেশ শাসন করতে আসতেন। সঙ্গে ফারসী-উর্দুভাষী অনুচর কর্মচারী আসত। তাদের স্বল্পমেয়াদী কার্যকাল শেষ হলেই তারা বঙ্গদেশ ত্যাগ করে নিজ নিজ আস্তানায় ফিরে যেতেন।[৬৮] সভাস্থলে তারা উত্তরাপথের ওস্তাদ ও জ্ঞানীগুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মোগল তমদ্দুন মেনে চলতেন। এই দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না। সময়ও পেতেন না।[৬৯] এমতাবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যায় কারা ঐ 'বহিরাগত শাসকশ্রেণী' (the alien ruling class) যারা খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের বঙ্গদেশে মোগল তমদ্দুন ছাড়াও ব্যাপকভাবে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি ও রীতিনীতির চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করলেন? এরা কি খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে চট্টগ্রাম-আরাকান মুল্লুক থেকে শরণার্থী হয়ে ঢাকায় আগত মগ রাজা মঙ্গৎ রায় (ওরফে বল্লাল সেন ওরফে নবাব আবুল কাশেম তাবাতাবাইয়া আল হুসনেনী আল সমঅনী) ও তার শত সহস্র মগ ও বাঙ্গালী অনুচররা নন যারা ঐতিহ্যগতভাবেই ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি, রীতিনীতি ও পৌত্তলিকতার ধারক-বাহক-পৃষ্ঠপোষক?

তথ্যনির্দেশ

১। History of Aurongzeb : Vol. III : PP. 129-130.

২। Ibid. : PP. 129-132.

৩। বাংলা দেশের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার : পৃঃ ৬ ; মুসলিম বাংলা সাহিত্য : এনামুল হক : পৃঃ ২৭৫।

৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ৪-৫।

৫। প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৩৫-৪৩৬।

৬। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : PP. 227-228.

৭। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ২৫৪ ; বাংলার ইতিহাসের দু শো বছর: পৃঃ ২৫৪, ৫১৪, ৫৪৫।

৮। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ : ৪র্থ খণ্ড : পৃঃ ২৯০, ২৯৭।

৯। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা : ষষ্ঠ খণ্ড : ১৯৮৮ : ঢাকা : পৃঃ ২৫-৩৩।

১০। প্রাগুক্ত।

১১। বাংলার ইতিহাসের দু শো বছর : পৃঃ ৫৪৫।

১২। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ৫৫২-৫৫৩।

১৩। Bengal in the Reign of Aurongzeb : Anjali Chatterjee : PP. 204-205.

১৪। Ibid. : P. 210.

১৫। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা : শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৫৯ : কলিকাতা : পৃঃ ১১৯।

১৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ১৭১।

১৭। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ২০৯-২১০।

১৮। প্রাগুক্ত : পৃঃ ২৩৪।

১৯। মহাস্থবির শীলভদ্র : শহীদুল্লাহ মৃধা: ১৯৯৪: ঢাকা: পৃঃ ৩৯; History of Burma : Harvey: P. 28.

২০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ : ৪র্থ খণ্ড : পৃঃ ৩৭৩।

২১। Bangladesh District Records : Chittagong : Vol. I : Serajul Islam : 1978 : Dacca: PP. 105-106.

২২। রাজশাহীর ইতিহাস : ২য় খণ্ড : কাজী মোহাম্মদ মিছের : ১৯৯৫ : ঢাকা: পৃঃ ২৩৩।

২৩। বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ : আ.কা.মো যাকারিয়া : পৃঃ ৪৫৭-৪৫৮ ; Notes on the Antiquities of Dacca : S.A.Hasan : 1904 : Dacca : PP. 12, 20 ; Glimpses of old Dhaka : S.M.Taifoor : P. 126.

২৪। বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ : যাকারিয়া : পৃঃ ৪৪৯-৪৫২ ; Notes on the Antiquities of Dacca: S.A.Hasan : P. 12 ; Glimpses of old Dhaka : S.M.Taifoor : PP. 123-124.

২৫। বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ : যাকারিয়া : পৃঃ ৪৫৪-৪৫৫ ; Glimpses of old Dhaka : P. 125.

২৬। বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ : যাকারিয়া : পৃঃ ৪৪১-৪৪৬ ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা : ষোড়শ সংখ্যা: ডিসেম্বর ১৯৮২ : পৃঃ ২০৫-২৩৪ ; দৈনিক প্রথম আলো : ৫/১২/০৪ : পৃঃ ২১ : কোলাহলের মাঝে তিন শতকের সৌম্য স্তব্ধতা : এ. কে. এম.জাকারিয়া; মোগল রাজধানী ঢাকা : ড. আব্দুল করিম : ১৯৯৪ : ঢাকা : পৃঃ ৩০

২৭। ঢাকার ইতিহাস : ২য় খণ্ড : যতীন্দ্র মোহন রায় : পৃঃ ৩৪৫ ; ঢাকার কথাঃ রফিকুল ইসলাম : ১৯৮২: ঢাকা : পৃঃ ২৯; Notes on the Antiquities of Dacca : P. 29 ; JASB : Vol. XLI : 1872 : PP. 107-108.

২৮। ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে : হাকীম হাবিবুর রাহমান : বঙ্গানুবাদ : হাশেম সুফী : ১৯৯৫ : ঢাকা: পৃঃ ১৪২।

২৯। ঢাকেশ্বরী মন্দির ও নবাব বল্লাল সেন : জয়নাল আবেদীন খান : পৃঃ ১-১০৯।

৩০। স্মৃতিময় ঢাকা : মুনতাসীর মামুন : ১৯৮৯ : ঢাকা : পৃঃ ১৪ ; বাংলাদেশের মন্দির : রতনলাল চক্রবর্তী : পৃঃ ৬৮-৬৯ ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা : সরদার ফজলুল করিম : এপ্রিল ১৯৯৩ : ঢাকা : পৃঃ ১৭।

৩০ক। স্মৃতিময় ঢাকা : মুনতাসীর মামুন : পৃঃ ১৩।

৩১। ঢাকার ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ৪৯৩।

৩২। কর্নেল ডেভিডসন যখন ঢাকায় : মুনতাসীর মামুন : ১৯৯০ : ঢাকা : পৃঃ ২৩-২৫ ; পুরানো ঢাকা: উৎসব ও ঘরবাড়ি : মুনতাসীর মামুন : পৃঃ ৫৪-৫৫ ; Glimpses of old Dhaka : P. 54.

৩৩। পুরানো ঢাকা : উৎসব ও ঘরবাড়ি : মুনতাসীর মামুন : পৃঃ ১-৫০ ; বাংলাদেশের উৎসব : মুনতাসীর মামুন : ১৯৯৪ : ঢাকা : পৃঃ ১-৮০ ; Glimpses of old Dhaka : PP. 164-166.

৩৪। The Romance of an Eastern Capital : P. 33.

৩৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭, ৩৫৫।

৩৬। ঢাকার ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ৩৬২-৩৬৩ ; The Romance of an Eastern Capital : PP. 32-33.

৩৭। ঢাকার ইতিহাস : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৫০০-৫১০।

৩৮। প্রাগুক্ত : পৃঃ ৩৫২ ; Bengal Temples : Bimal Kumar Datta : 1975 : New Delhi : P. 50.

৩৯। ঢাকার ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ৩৬২-৩৬৩ ; বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : ঘাস ফুল নদী ১ম সংস্করণ : পৃঃ ২১ ; Muslim Architecture in Bengal : A. H. Dani : P. 238.

৪০। ঢাকার ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ৩৬১ ; Muslim Architecture in Bengal : Dani : P. 221.

৪১। ঢাকার ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ৩৬১; সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস : শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায় : পৃঃ ৭৯; Topography & Statistics of Dacca : Vol. I : James Taylor : P. 75.

৪২। মাসিক বিক্রমপুর : ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা : ১৯৭৮ ; ঢাকার ইতিহাস : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৩৯৪-৩৯৫ ; বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ২৯২ ; বাংলা দেশের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার : পৃঃ ১১৬-১১৯।

৪৩। The Land & People of Burma : Lefroy : PP. 37-41.

৪৪। ভারতের ইতিহাসকথা : ১ম খণ্ড : ড. কিরণচন্দ্র : পৃঃ ২২১।

৪৫। Topography & Statistics of Dacca : Vol. I : Taylor : P. 75.

৪৬। District Census Report : Chittagong : Parts : I-V : A.Rashid : 1961 : PP. 1-12.

৪৭। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : PP. 333-334.

৪৮। Inscriptions of Bengal : Vol. IV : S. Ahmed : 1960 : Rajshahi : P. 283.

৪৯। Rukaat-i-Alamgiri or Letters of Aurongzeb : Jamshid H. Bilimoria : P. 88.

৫০। Dacca : The Mughal Capital : Dr. A. Karim : 1965 : Dacca : P.51.

৫১। History of Bengal : Charles Stewart : P. 161.

৫২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৩২৩।

৫৩। বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত : পৃঃ ৯৯।

৫৪। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : PP. 332-335 ; Islam in Bengal : Jagadish Narayana Sarkar : 1972 : Calcutta : P. 14.

৫৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ২৫।

৫৬। East Bengal District Gazetteers : Dacca : B.C.Allen : P. 29 ; Inscriptions of Bengal : Vol. IV : S.Ahmed : P. 283.

৫৭। বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ : যাকারিয়া : পৃঃ ৪৫৪-৪৫৫ ; Glimpses of old Dhaka : Taifoor: PP. 125-126.

৫৮। ঢাকার ইতিহাস : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৩৪৫ ; JASB : Vol. XLI : 1872 : PP. 107-108.

৫৯। Notes on the Antiquities of Dacca : S. A. Hasan : P. 20.

৬০। Ibid. : P. 12.

৬১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৩০২।

৬২। বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ২৫৯।

৬৩। Bengal Temples : B. K. Datta : P. 69.

৬৪। Bengal Temples : Datta : P. 50 ; পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি : ৩য় খণ্ড : বিনয় ঘোষ : ১৯৯৪ : কলিকাতা : পৃঃ ৩৪০।

৬৫। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ৬৮৪।

৬৬। বাংলা দেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার : পৃঃ ৪৪৭-৪৫০।

৬৭। বিক্রমপুর : ১ম খণ্ড : শ্রীহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় : পৃঃ ৩১৩-৩২৬, ৪৩২; বিক্রমপুর : ২য় খণ্ড: পৃঃ ২৪৭-২৬৪, ৩৬৯-৩৯২ ; ঢাকার ইতিহাস : ২য় খণ্ড: শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় : পৃঃ ৫০০-৫১০।

৬৮। বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস : ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম : ১৯৮৫ : ঢাকা: পৃঃ ২; History of Bengal (M.P.) : Sarkar : P. 410.

৬৯। বাংলা দেশের ইতিহাস : ২য় খণ্ড : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার : পৃঃ ২১২, ৪৩৯-৪৪০; মুসলিম বাংলা সাহিত্য : এনামুল হক : পৃঃ ১১৯।

অধ্যায় ১৭

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উচ্চতর হিন্দু সমাজে নারী দেবতার স্থান ছিল গৌণ, মঙ্গত রায়ের আমলে নারী দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার উচ্চতর সমাজে স্ত্রী দেবতার প্রতি ছিল অশ্রদ্ধা, খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে প্রাধান্য নিয়ে পুরুষ ও স্ত্রী দেবতার মধ্যে হয় কলহ, মঙ্গৎ রায়ের আমলে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার সমাজে স্ত্রী দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সমগ্র বাংলার হিন্দু সমাজ একই প্রকার জীবন ও সাধনার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয়, এই ঐক্যসাধন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেয় প্রথমে ঢাকা পরে মুর্শিদাবাদ।

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতক পর্যন্ত বাংলার উচ্চতর হিন্দু সমাজে নারীদেবতার প্রাধান্য ছিল না

ইতোপূর্বেই আমরা দেখেছি যে বাংলার সমাজে হিন্দু ধর্মের কোন একক আদর্শ ছিল না। বাংলার নিম্নতর হিন্দু সমাজে ছিল নারী দেবতা চণ্ডীর প্রাধান্য। পক্ষান্তরে বাংলার উচ্চতর হিন্দু সমাজে ছিল পুরুষ দেবতা শিবের প্রাধান্য। সেখানে নারী দেবতার কোন স্থান ছিল না। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকে পর্যন্ত মুকুন্দরাম ভদ্রবৈশ্য ধনপতির মুখে মহাদেবী চণ্ডীর প্রতি যে প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়েছেন তাতেও স্ত্রীদেবতাদের বাংলার উচ্চতর হিন্দু সমাজে যে কী স্থান ছিল তা অনুমান করা যায়। স্ত্রী খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা করতে দেখে ধনপতির প্রতিক্রিয়া :

পূজা গৃহে উপনীত হৈল ধনপতি।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী ॥
বাম পথী হইয়া করিস কার পূজা।
ইহা শুনি যদি মোরে ক্রোধ করে রাজা ॥
****

কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপ বধূ।
খুল্লনা গর্জিয়া তবে ক্রোধে বলে সাধু ॥
এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লঙ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তারে চুলে ॥
ভূমিতে দেবীর বারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায় ॥
কেমন দেবতা এই পূজিস ঘট বারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি ॥[১]

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বাংলায় নারীদেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়

কিন্তু খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে অর্থাৎ তান্ত্রিক ধর্মের পরম অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লালের আমলে এসে আমরা লক্ষ করি বাঙালীর জাতীয় জীবনে একদা উপেক্ষিত মাতৃদেবতারা নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। ফলে সঙ্গত কারণেই পুরুষ দেবতাদের সঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে তাদের বাদ-বিবাদ, কলহ-কাজিয়ার। এই বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখছেন, "এক সময়ে এই দেবী (কালিকা) পূজা যে ভদ্র সমাজের বহির্ভূত ছিল তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায়। মহাশ্বেতাকে শিবমন্দিরেই দেখি। কিন্তু কবি ঘৃণার সহিত অনার্য শবরের পূজা-পদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় পশু রুধিরের দ্বারা দেবতার্চন ও মাংস দ্বারা বলিকর্ম তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রমণ্ডলীও পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিস উপরে এবং উপরের জিনিস নীচে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। ...সেখানে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবতা শিবের দুর্গতি। তাহার এতোকালের প্রাধান্য মেয়ে দেবতা কাড়িয়া লইবার জন্য রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; শিবকে পরাস্ত হইতে হইল। ...দেখি সমাজে একটি কলহ বাঁধিয়াছে, সে দেবতার কলহ। চণ্ডী, বিষহরি ও শীতলা ...এই সকল স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে তাহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে, দেবী চণ্ডী নিজের পূজা স্থাপনের জন্য অস্থির। যেমন করিয়া হউক, ছলে বলে কৌশলে মর্ত্যে পূজা প্রচার করিতে হইবেই। ইহাতে বুঝা যায় পূজা লইয়া একটা বাদ-বিবাদ আছে। তাহার পর দেখি যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা প্রচার করিতে উদ্যত তাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের তাহাকেই উপরে উঠাইবেন, ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। ...যে দরিদ্র দুই বেলা আহার জোটাইতে পারে না, সে-ই শক্তির লীলায় সোনার ঘড়া পাইল, যে ব্যাধ নীচ জাতীয়, ভদ্রজনের অবজ্ঞা-ভাজন, সে-ই মহত্ত্ব লাভ করিয়া কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিল। ইহাই শক্তির লীলা। তাহার পর দেখি, শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই

নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোন সংকোচ নাই।"[২]

এই সময়ে বাংলা ভাষায় লৌকিক ও পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য রচনার ধূম পড়ে যায়

ব্রাহ্মণরা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থ রচনাকে ধর্মদ্রোহিতার শামিল বলে বিবেচনা করা সত্ত্বেও এবং ধর্মের কথা যারা দেশী ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায় চর্চা করবে তারা রৌরব নরকে যাবে বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও[৩] দেখি এই সময়ে পুরুষ দেবতার বদলে নারী দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে বাংলা ভাষায় লৌকিক ও পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য রচনার ধূম পড়ে যায়।[৪] এই সব মঙ্গলকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, বাসুলীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, গোসানীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল ইত্যাদি। এই সব মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুতে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবদেবীর উৎপত্তি, দেবদেবীর মর্ত্যে আগমন, দেবদেবীর বন্দনা, পূজার নিয়মাবলী, মন্ত্র ও কৃত্যের বর্ণনা। গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা অংশে দেখা যায় প্রায় সব মঙ্গলকাব্যই স্বপ্নাদেশে বা দৈবনির্দেশে দেবদেবীর আজ্ঞায় রচিত হয়। দেবতাই মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রলোভন দেখিয়ে জোর করে পূজা আদায়ের চেষ্টা করেন।[৫] দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে দেবতার পদতলে নতশীর্ষ করানো মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগরকে, চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতিকে, ধর্মমঙ্গলে মহামদকে দেবদ্রোহীরূপে চিত্রিত করে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে দেবতার চরণতলে অবনত করানো হয়েছে।[৬] মঙ্গলকাব্যের বন্দনা অংশে নানা দেবদেবীর বন্দনা আছে। এই বন্দনা একান্তভাবেই অসাম্প্রদায়িক। এতে শুধু যে ইষ্টদেবতার বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবদেবীর বন্দনাই আছে তা নয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্মের উপাস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনও আছে।[৭]

এই সময়ে সংস্কৃত পুরাণ ও উপপুরাণও রচিত হয়

অনার্য তথা লৌকিক দেবতাদেরকে উচ্চ বর্ণ হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সে যুগে যে একমাত্র বাংলা মঙ্গলকাব্যই রচনা করা হয় তা নয়, কতগুলো সংস্কৃত পুরাণ ও উপপুরাণও রচনা করা হয়। কেননা মধ্য যুগের উচ্চ বর্ণ হিন্দু সমাজ স্মৃতি ও পুরাণের দ্বারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হত। এমনকি আধুনিক যুগের হিন্দু সমাজও স্মৃতিসংহিতা ও পুরাণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারে নি।[৮] বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, মহাভাগবত পুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ, সনৎকুমার সংহিতা প্রভৃতি পুরাণ গ্রন্থ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর উচ্চ সমাজে বিশেষ প্রসার লাভ করে। তার প্রমাণ, এই যুগে বঙ্গাক্ষরে লেখা এই সমস্ত শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব পুরাণের বহু পুঁথি পাওয়া যায়। কথকঠাকুরদের

কথকতার দ্বারা এই সমস্ত পুরাণের কাহিনী ও নীতি-আদর্শ অশিক্ষিত সমাজেও প্রচার লাভ করে।[৯] এই সমস্ত গ্রন্থ বাংলার লৌকিক ধর্মের ওপর একটা পৌরাণিক আভিজাত্য এমনভাবে আরোপ করে, যাতে বাংলার উচ্চ বর্ণ হিন্দু সমাজ অনার্য ও অবৈদিক দেবতাদেরকে আপন ভেবে গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হয়। এই বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "লৌকিক দেবতাদিগকে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে সেই যুগে একমাত্র বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিই যে সাহায্য করিয়াছিল তাহা নহে— কতগুলি পরবর্তী অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণও এই কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিল।...এক দিকে সংস্কৃত পুরাণ ও অপর দিকে বাংলা মঙ্গল কাব্য ইহাদের যুগপৎ প্রচেষ্টায় অনার্য দেবতাগণ হিন্দু সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া লইতেছিলেন।...তখন উচ্চতর হিন্দু সমাজের নিকট পুরাণ বহির্ভূত লৌকিক কাহিনীর কোনই আবেদন ছিল না। সেই জন্য তখন বিভিন্ন লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর অংশ মিশ্রিত করিয়া লৌকিক কাহিনীর মধ্যবর্তীতায় পৌরাণিক দেবতাদিগের মহিমা প্রচার করিবার প্রয়াস দেখা দিল।"[১০]

সপ্তদশ শতকে অনার্যদেবী চণ্ডী (উমা) বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতায় পরিণত হন

দেখি আধিপত্য বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন মাতৃদেবতারা। ফলে অচিরকালের মধ্যেই অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে অনার্য দেবী চণ্ডী (কালী ও দুর্গা রূপে) বাংলার প্রতিটি গ্রামে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে আরাধ্যা দেবীতে পরিণত হন।[১১] তবে উচ্চ সমাজ থেকে যে কোন বাধা আসে নি, তা নয়। প্রবল বাধাই এসেছিল। কিন্তু সে বাধা সফল হয় নি। কেন সফল হয় নি তার ব্যাখ্যায় আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "তখনকার নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধিবিধানের অতীত ছিল। তাহাদের খেয়াল মাত্রেই সমস্ত হইতে পারিত। ইহারা দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নীচ মহৎ হইত, ভিক্ষুক রাজা হইত। ইহারা নির্দয় হইলে ধর্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না।"[১২] আসলেই তা-ই। এই সময়ে বঙ্গদেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রজার না ছিল জমিতে নিজস্ব অধিকার না ছিল স্বতন্ত্র ধর্মাধিকার। রাজার ধর্মই ছিল প্রজার ধর্ম।[১৩] এমনকি রাজার সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তারাও রাজার অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকতেন।[১৪] মোট কথা রাজা ছিলেন সমাজদেহ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুরই ধারক, পোষক ও বর্ধক। সমাজ নিয়ন্ত্রণ রাজার কর্তব্য বলে স্বীকৃত ছিল, এমনকি রাজা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও।[১৫] কবির ভাষায়,

রাজা (নরদেহে ঈশ্বরের প্রতিভু) ছাড়া আর
কিছু নাহি ভবে পূজা করিবার
এই কটি কথা জেনো মনে সার
ভুলিলে বিপদ হবে।[১৬]

এমতাবস্থায় মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল রাজা প্রবর্তিত সকল পূজা-পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠান-রীতি-নীতি যে স্থানীয় জনগণের ওপর অবাধে পূর্ণ প্রসার পেয়েছিল তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। কীর্তিমান এই রাজা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যথার্থই লিখছেন, "বাঙ্গালাদেশে বল্লাল সেনের মত পরিচিত কোন হিন্দু রাজা নাই। বল্লালের ইতিহাস বাদ দিলে বঙ্গের হিন্দুর ইতিহাসে কিছু থাকে না। আর সেই বল্লালী ইতিহাসের নির্য্যাস এই আভিজাত্য (কৌলিন্য)।"[১৭]

নবাব বল্লালের মত যুবরাজ দারাও হিন্দু বলে অভিহিত হন

উল্লেখ থাকে যে আমরা তাঁকেই হিন্দু বলি, যিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরাগী ও হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। প্রবোধ কুমার সান্যালের ভাষায়, "যিনিই বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ-ষড়দর্শন-পুরাণ পাঠ করেন, যিনিই ডুবে যান যোগ-দর্শনে, জ্ঞানে ও সাধনায় তাঁকেই আমরা বলি, তুমি পরম হিন্দু।...হিন্দু দর্শনের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আছে এ কারণেই তোমাকে হিন্দু মনে করি।"[১৮] এই অর্থে সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ দারা শিকোহও একজন হিন্দু রাজা ছিলেন। কেননা তিনি হিন্দু ধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রকৃত ও বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম প্রচার ও প্রসারেরও জোর প্রচেষ্টা চালান।[১৯]

বাংলার হিন্দু সমাজের ঐক্য সাধনে ঢাকার ভূমিকা

আমরা সকলেই অবগত আছি যে মোগল আমলের পূর্বে বঙ্গদেশের হিন্দু সমাজ হিন্দু ধর্মের একক আদর্শে গড়ে ওঠে নি। এই বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, "তুর্কী শাসিত বাংলার সমাজে হিন্দু ধর্মের একক আদর্শ কোন দিক দিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং পাল এবং সেন রাজাগণ যে কার্যের সূচনা করিয়াছিলেন, অঙ্কুরেই তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যে হিন্দু মন্দির এবং হিন্দু সমাজের আদর্শ তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের প্রভাব সর্বজয়ী হইয়া উঠিবার পূর্বেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল।"[২০] কিন্তু খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোগল আমলে এসে আমরা দেখি সারা বাংলার হিন্দু সমাজ একই প্রকার জীবন ও সাধনার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয়।[২১] বাঙলার হিন্দু সমাজের এই ঐক্যসাধন প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রথমে ঢাকা, পরে মুর্শিদাবাদ। এই বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "মুঘল যুগে বাঙলাদেশের ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে ঘুচিয়াছিল। পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে যাতায়াতের ফলে সারা বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ একই প্রকার জীবন ও সাধনার দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল। মুঘল শাসনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে জনসাধারণ ধীরে ধীরে যেমন ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইল, তেমনি সমাজ জীবনের সঙ্গেও সকলের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ হইল। সমাজেও

মুঘল নাগরিকতার ভালমন্দ, মার্জিত নাগরিকতা ও উচ্ছৃঙ্খল নাগরিকতা— উভয়ই বাঙালী হিন্দু সমাজে অল্পবিস্তর প্রবেশ করিল। পাঠান যুগে গৌড়, রাজমহল, তাঁড়ায় কবে রাজধানী নির্মিত হইতেছে, কবেই-বা তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে জনসাধারণ তাহার বিশেষ সংবাদ রাখিত না। কিন্তু মুঘল যুগে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদকে ভুলিয়া থাকা কঠিন হইল, দেশের মানুষ দেশ ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধসূত্রে জড়িত হইয়া পড়িল।"২২ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের বাঙালীর এই ঐক্যসাধন প্রক্রিয়ায়— সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয়— কে মূল নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন? নন কি তিনি খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ঢাকায় বসবাসরত জায়গিরদার, মনসবদার ও করদ মগ রাজা মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল?

অধ্যায় ১৮

মঙ্গৎ রায়ের আমলে বল্লালী হিন্দুয়ানি প্রতিষ্ঠিত হয়

মহারাজা বল্লাল পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ এনে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন, সকল বাঙালী হিন্দুর জন্য জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষা অপরিহার্য করা হয়, বাংলার পুনর্গঠিত হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়।

বল্লাল বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্ম (বল্লালী হিন্দুয়ানি) সুপ্রতিষ্ঠিত করেন

মহারাজা বল্লাল পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ এনে সমগ্র বঙ্গদেশে হিন্দু ধর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক শ্রীহিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "মহারাজা বল্লাল সাগ্নিক ক্রিয়াকুশল ব্রাহ্মণ আনিয়া এতদঞ্চলে আনুষ্ঠানিক হিন্দু ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দু সমাজকে সুসংস্কৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বিক্রমপুরে বল্লালী হিন্দুয়ানিই প্রচলিত আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মহারাজ রাজবল্লভ এবং তাহার অনুসরণে বিশিষ্ট বিশিষ্ট জমিদার ও অর্থশালী লোকেরা নানারূপ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা, দেবোত্তর-ব্রহ্মোত্তর ভূমিদান প্রভৃতি কর্ম দ্বারা এই হিন্দুয়ানিকেই জাগাইয়া রাখিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।"[২৩] তবে মহারাজা বল্লাল পশ্চিমদেশ থেকে সাগ্নিক ক্রিয়াকুশল ব্রাহ্মণ এনে বঙ্গদেশে যে হিন্দু ধর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তা একান্তভাবেই তান্ত্রিক ধর্ম তথা লৌকিক ধর্ম। কেননা এই তান্ত্রিক ধর্মেরই মহারাজা বল্লাল (ওরফে মঙ্গৎ রায়) পরম পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী ছিলেন।[২৪] এই বিষয়ে স্মীথও লিখেছেন, "The Hinduism of Ballal Sen was of the Tantric Kind. The Brahman genealogists assert that he sent numerous missionaries, all Brahmans, to Magadha, Bhotan, Chittagong, Arakan, Orissa and Nepal."[২৫]

বাংলার হিন্দুতান্ত্রিক ধর্মের ওপর বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব

আমরা দেখতে পাই সকল বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষা অপরিহার্য করা হয়। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন, "বাংলা দেশের পূজাপার্বণে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রয়োগ, তান্ত্রিক মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার অপরিহার্য্যতাও এই দেশে স্বীকৃত হইয়াছিল।"[২৬] অবশ্য এই দেশে তান্ত্রিক দীক্ষা অপরিহার্য হয় এই কারণে যে তান্ত্রিক ধর্মের অনুসারীদের বিশ্বাস কলি যুগের জন্য একমাত্র তান্ত্রিক ধর্মই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং এই ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন ও এর আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন ব্যতীত কারোর পক্ষেই মোক্ষলাভ কিছুতেই সম্ভব নয়।[২৭] তবে বাংলার এই পুনর্গঠিত হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম দেখি বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। এই সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার লিখছেন, "The present day Tantric Leaven in Bengal Hinduism largely came to it via the Buddhistic Kalachakrayana, the Vajrayana and the Sahajayana School of Tantrayana. One matter in which there has been a very subtle influence from Tantric Buddhism upon Bengal Brahmanism would seem to be this : the rather exaggerated importance of the Guru from whom Tantric initiation is received. The Brahman has his proper Vedic initiation when he is invested with the sacred thread by the Upanayana rite ; theoretically he does not require any other initiation. But, in practice, all good Hindus in Bengal should have a Guru who will give him the mantra. .....and the Guru becomes almost as a god to him after his initiation."[২৮] আমরা দেখতে পাই বর্তমান কালে বাংলাদেশে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা বিশেষ প্রভাবশালী। এই দুই পূজার বিশেষ প্রভাবশালী হওয়ার কারণও তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে এই দুই অনুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, "মধ্যযুগে প্রবর্তিত যে কয়েকটি নূতন ধর্মানুষ্ঠান এখনও বাংলা দেশে বিশেষ প্রভাবশালী, তাহাদের মধ্যে দুর্গা পূজা ও কালী পূজা এই দুইটিই প্রধান। ইহার মুখ্য কারণ তান্ত্রিক সাধনার সহিত এই দুই অনুষ্ঠানের নিগূঢ় সংযোগ।"[২৯]

বল্লালি ক্রিয়া

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বল্লাল রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোগেই বাংলার হিন্দু সমাজ তান্ত্রিক ধর্মাদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হয় এবং তান্ত্রিক ধর্ম তথা মহাদেবীর পূজা-উপাসনা সর্বপ্লাবী হয়। বল্লাল রাজা বাংলার তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতে এত ব্যাপক প্রভাব ফেলেন যে বাংলার তান্ত্রিকী ক্রিয়া বল্লাল রাজার নামে 'বল্লালি ক্রিয়া' আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে যায়।[৩০]

অধ্যায় ১৯

মঙ্গৎ রায় ছিলেন শাহ সুজার দিওয়ান, কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন, কুলীনদের মাধ্যমে মহাদেবীর পূজা জনপ্রিয় হয়, কার্ত্তিকপুরের মুসলমান জমিদারদের কালী পূজা

মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল রাজার রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা, কুলীন সৃষ্টি, কৌল ধর্ম, কুলশাস্ত্র, কালচক্রযান, মাতৃকা শক্তি, কুলীনদের বাছন, ঘটক সৃষ্টি, অনুগত ব্রাহ্মণ দিয়ে পুরাণ ও পুঁথি রচনা, দিনাজপুর রাজ, কুলীনেরা হন মোগল রাজস্ব ব্যবস্থার মূল ভিত্তি, পরবর্তীকালে কৌলীন্যহীন অর্থশালী ব্যক্তিরা হন জমিদার, কুলীনেরা জমিদারি হারান, বল্লালী আমলের কুলীনদেরকে 'বল্লাল সেনীয়া' বলে বিদ্রূপ করা হয়, কুলীনদের মাধ্যমেই মহাদেবীর পূজা সমগ্র বঙ্গদেশে সর্বশ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় হয়, কুলীনদের বাড়ীর সামনে মগ তথা আরাকানী ঐতিহ্যের অনুকরণে সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য মঠ-মন্দির-পাঠশালা-পুকুর-দীঘি প্রতিষ্ঠিত হয়, কার্ত্তিকপুরের মুসলমান জমিদারদের হিন্দু দেবদেবীর পৃষ্ঠপোষকতা।

শাহ শুজার দিওয়ান হিসেবে মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল

আমরা দেখতে পাই বঙ্গদেশের সুবাদার সুলতান শাহ শুজার রাজস্ব বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা বা দিওয়ানেরও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন মীর আবুল কাশেম (ওরফে নবাব বল্লাল ওরফে মঙ্গৎ রায়)।[৩১] মীর আবুল কাশেম ওরফে মঙ্গৎ রায় ছিলেন এ দেশেরই একজন রাজপুত্র। তদুপরি তিনি ইতোপূর্বে ছিলেন চট্টগ্রামে আরাকান রাজের ভাইসরয়, যার প্রধান দায়িত্বই ছিল চট্টগ্রামের ১২ জন স্থানীয় রাজার নিকট থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে কেন্দ্রে প্রেরণ করা। তার এই রাজস্ব সংগ্রহসংক্রান্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা তিনি যে তার চলতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাজে লাগাবেন এবং এই সুবাদে বঙ্গদেশে নিজের সমর্থকও সৃষ্টি করার প্রয়াস পাবেন এতে কোনই সন্দেহ নেই। ভূমি-ব্যবস্থার ওপর কর্তৃত্ব বিস্তৃত

করতে পারলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে ড. তরফদার লিখছেন, "কোন সামরিক বা বেসামরিক উঁচু পদে কোন ব্যক্তির বহাল হওয়ার অর্থই হল তার ইকতা বা জাগির লাভ। ভূমি-ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব বিস্তৃত করতে পারলে সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি, ভূমি রাজস্বব্যবস্থা ও রাজনীতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্ভবপর হত।"[৩২] দেখি মঙ্গৎ রায় ওরফে নবাব আবুল কাশেম ওরফে বল্লাল রাজা বঙ্গদেশের ভূম্যাধিকারী গোষ্ঠীর একটি অংশকে মোগল শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করেন এবং নিজের সমর্থক শ্রেণীতে পরিণত করেন। বঙ্গের ভূম্যাধিকারী গোষ্ঠীর কতক অংশকে কেন ও কিভাবে মোগল শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা হয়, সে বিষয়ে বলতে গিয়ে শিরীণ আখতার লিখেছেন, "দেশীয়দের জটিল রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে মুঘল ফৌজদার, শিকদার বা আমিলদের সম্যক জ্ঞান না থাকায় যে সকল মধ্যবর্তী সংগ্রাহককারী— যাদের মারফত কর ও খাজনা আদায় করা হতো, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত যাবতীয় ভার তাদের ওপরই ন্যস্ত করা হয়। শাহী স্বার্থের প্রয়োজনে তৈরী এই ব্যবস্থা এক ভূম্যাধিকারী শ্রেণীর জন্ম দেয়। ভূমির স্বত্বারোপের মধ্যে কিছুটা দায়িত্বও নিহিত ছিল। জানমালের হেফাজত করার সরকারি কর্তব্য বর্তালো স্থানীয় জমিদার শ্রেণীর উপর। তারা শক্তি ও ক্ষমতা আহরণ করতেন কিছুটা কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ভাগ থেকে ও কিছুটা সমাজে তাদের উচ্চতর অবস্থান থেকে।...প্রচুর সুবিধা প্রদানের ভিত্তিতে মুগলরা প্রথম দিকে গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর একটি অংশকে তাদের শাসন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করতে সক্ষম হয়।"[৩৩]

বল্লালের কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন

গ্রামাঞ্চলের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর এই সুবিধাপ্রাপ্ত অংশটি কুলীন নামে অভিহিত হয়। এদের কুলীন নামে অভিহিত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেন, "বল্লাল সেন তান্ত্রিক মতের সমাদর করিতেন। যাহারা বল্লাল সেনের তান্ত্রিক কুলাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বল্লাল সেন তাহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাহাদিগকে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন। তন্ত্রের যে নববিধ আচার আছে বল্লাল সেন সেই আচার লক্ষ্য করিয়া কুলীনত্ব দেওয়ার নিয়ম করেন।"[৩৪]

আমরা জানি সাধারণ ধর্ম জীবনে মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব লাভ। এ লাভকে পরম লাভ মনে করে মানুষ তার ধর্মজীবনকে পরিচালিত করে।[৩৫] আবার শাস্ত্রে আছে দেবতার পূজা করতে হলে দেবতা হতে হয়। দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েই দেবতার পূজায় অগ্রসর হওয়ার বিধান আছে। 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'— আগে দেবতা হও তারপর দেবতার পূজা কর।[৩৬] দেখি বল্লালী কুলীনদেরকে সমাজে দেবতার সম্মান দেয়া হয়।[৩৭] এই বিষয়ে 'বল্লাল চরিত'-এ আছে, "In the country governed by Vallala the Kulins were regarded as devatas."[৩৮] এখান থেকে প্রতীয়মান হয়

যে তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা বা সেবার উদ্দেশ্যেও মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল রাজা বঙ্গের উচ্চতর হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন।

কৌলধর্ম-কুলীন-কুলশাস্ত্র

আমরা সকলেই অবগত আছি যে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ও শক্তিধর্ম এবং নব বৌদ্ধ ধর্মের (তন্ত্রযান) গুহ্য সাধনবাদের একত্র মিলনে শক্তিধর্মের (শক্তিতন্ত্র) যেসব নতুন রূপ দেখা দেয় তার মধ্যে কৌল ধর্মই প্রধান। এই ধর্মে গুরু অপরিহার্য এবং দেবতার তুল্য। গুরু প্রথমত সাধকের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিবেচনা করে তার জন্য তদনুযায়ী সাধন-মার্গ নির্দিষ্ট করে দেন। এই সাধন প্রণালী এক প্রকার যোগবিশেষ। কৌলমার্গীদের মতে কুলই শক্তি, কুলের বিপরীত অকুল হল শিব। দেহের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন দৈবী শক্তির নাম কুলকুণ্ডলিনী। এই কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে শিবের সঙ্গে পরিপূর্ণ এক করাই কৌলমার্গীদের সাধনা। কৌলধর্ম যারা মেনে চলেন তারা অর্থাৎ কৌলসম্প্রদায়ের লোকেরা কৌল, কুলপুত্র বা কুলীন নামে পরিচিত। এদের শাস্ত্রের নাম কুলাগম বা কুলশাস্ত্র।[৩৯] তন্ত্র উপাসনা করতে গেলে আমি শিব হয়েছি, শক্তি হয়েছি এরূপ বলতে হয়।[৪০] তন্ত্র হচ্ছে সাধনার পথে অগ্রগামীদের জন্য।[৪১] এখানে উল্লেখ্য যে তন্ত্রযানের এক গুরুত্বপূর্ণ সাধনপন্থার নাম কালচক্রযান। কালচক্রযানীদের মতে শূন্যতা ও কালচক্র এক ও অভিন্ন। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে অবিরাম প্রবহমান কালস্রোত চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান। এই কালচক্র সর্বদর্শী, সর্বজ্ঞ; এই কালচক্রই আদিবুদ্ধ ও সকল বুদ্ধের জন্মদাতা। তাই কালচক্রযানীদের সাধন-পদ্ধতিতে তিথি, বার, নক্ষত্র, রাশি, যোগ প্রভৃতি একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে।[৪২]

তান্ত্রিক উপাসনায় ভাব ও আচার

তান্ত্রিক উপাসনায় (অধিকারী ভেদে) পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব নামে তিন প্রকার ভাব এবং বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম (বামা), সিদ্ধান্ত ও কৌল নামে সাত প্রকার আচার আছে। বীরভাবে বামাচার সাধনা প্রশস্ত। শবসাধনা, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি এর অন্তর্গত। এই সাধনার বাহ্য পূজায় মদ্য, মাংস, মৈথুন ইত্যাদি গ্রহণের বিধি আছে। বিশ্বের অন্তরে ও বাইরে যে মহাশক্তির লীলা বিদ্যমান দেহমনে সেই শক্তির উদ্বোধন করাই শক্তিপূজার আসল লক্ষ্য। দেহে নাদরূপে শক্তিস্রোত প্রবাহিত। এই নাদের প্রতীক স্থূল ধ্বনি এবং বর্ণ। এগুলোই মাতৃকাশক্তি। মাতৃপ্রতীকগুলোই শক্তি পূজকদের ধ্যেয়। এগুলোর ভিতর দশ মহাবিদ্যা – কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, কমলা বিখ্যাত। দীক্ষা গ্রহণ করে সাধক ভূত শুদ্ধি করেন। মাতৃকা বর্ণগুলো দিয়ে ন্যাস করে দেহকে মাতৃময় করে তোলেন। এর পর বাহ্য পূজা করে বীজমন্ত্র জপ করতে করতে শক্তির আনন্দ স্রোতে মগ্ন হয়ে যান।[৪৩]

তন্ত্রাচারই কলিযুগের ভবব্যধির একমাত্র নিদান

তান্ত্রিক দার্শনিকগণ দেখিয়েছেন, কলিতে মানবগণ 'শিশ্নোদরপরায়ণাঃ' ও 'নিদ্রালস্যপ্রযুক্তাঃ' হবে। ঐহিক সুখকামী জীবের যুগপৎ মোক্ষ ও সুখ, ভুক্তি ও মুক্তির জন্য তারা তন্ত্রাচারকেই কলিযুগের ভবব্যধির একমাত্র নিদান বলে নির্দেশ করেছেন। তাদের মতে মানুষ যখন শুধু দেহী হয়ে থাকে, তখন তার নাম 'পশুভাব'। পরে সাধনার দ্বারা যারা দেহকে জয় করেন তারা বীরভাবের সাধক বলে পরিচিত হন। এই 'বীরভাব' কোন কোন তন্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছে। বীরভাবের সাধক দৃঢ় মানসিক বলের সাহায্যে দুঃসাধ্য শবসাধনাদি করে সিদ্ধি লাভ করেন।

পঞ্চমকারের সাধনা

দ্রুত সিদ্ধি লাভের জন্য বীরাচারী সাধকগণ 'পঞ্চমকার' (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন) এবং 'ষটকর্মাদি' (শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন ও মারণ) আভিচারিক ক্রিয়াদি অনুশীলন করেন। এর পর 'দিব্যভাব'। এটাই শ্রেষ্ঠ ভাব, সাধকের অন্তরে তখন মহাশক্তির দিব্যলীলা অনুভূত হয়। জীবকে অজীবলোকে উন্নীত করা, দেহপিণ্ডকে চিদানন্দময় ভাগবত্ তনুতে পরিণত করাই তন্ত্রসাধনার মূল রহস্য। প্রথমে পশুভাব, তারপর ক্রমোন্নতির ফলে বীরভাব, পরিশেষে দিব্যভাব, জীবের মোক্ষ বা মুক্তি। এই পশু, বীর ও দিব্যভাবকে যথাক্রমে তমঃ , রজঃ ও সত্ত্বঃ গুণের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়।[৪৪] উল্লেখ্য যে মোক্ষ লাভের জন্য পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ।[৪৫] আরো উল্লেখ্য যে পূজো-আর্চার সময় দেবতার প্রসাদ মনে করে তারা মদ গ্রহণ করে থাকেন। অন্যথায় দেবতা ক্রুদ্ধ হন বলে তাদের বিশ্বাস।[৪৬] বাংলার শক্তিপূজা এবং বল্লাল রাজার আমলের কুলীনদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জেমস ওয়াইজ লিখেছেন, "The Sakta Worship generates drunkards and no one can be a devoted worshipper without drinking spirits to a fearful extent ...the immoral Sakta ritual is observed by the three highest and most intelligent of the Hindu castes, namely the Brahman, Baidya and Kayath. All Kulin Kayaths celebrate the Vamachari Achar or Chakra rites. By this intoxication is legalised and made a religious duty, while obscenity is countenanced and enforced. ...A Kulin Kayath family is almost as exclusive as that of a Kulin Brahman, and it is equally dependent on the Ghatak for the preservation of its station and purity."[৪৭]

কুলীনদের জন্য ৯টি সদগুণ অর্জন বাধ্যতামূলক

মহামানব বুদ্ধ যেমন বৌদ্ধ ধর্মানুসারীদের জন্য ৮টি সৎ গুণ (যথা সৎ দৃষ্টি, সৎ সংকল্প, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ জীবিকা, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ স্মৃতি ও সৎ সমাধি) অর্জন ফরজ

করেন[৪৮] ঠিক তেমনি মহারাজা বল্লালও কুলীনদের জন্য ৯টি সৎ গুণ অর্জন ও সংরক্ষণ ফরজ করে দেন। এই ৯টি গুণ হল আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ ও দান।[৪৯] কুলীনদের জন্য অপসম্বন্ধ ও অকুলীনের সঙ্গে পঙক্তি-ভোজন নিষিদ্ধ করেন। নিষিদ্ধ করেন বাসস্থান ত্যাগ। তান্ত্রিক ধর্মাদর্শের ভিত্তিতে স্ব-স্ব সমাজ গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় কুলীনদের ওপর। বল্লাল রাজা নিয়ম করেন যে প্রতি ৩৬ বছর অন্তর কুলীনদের নির্বাচন হবে। এই সময়ে কৌলিন্য পদপ্রাপ্ত দুঃশীল ব্যক্তিগণ কৌলিন্যভ্রষ্ট ও অকুলীন সদাচার ব্যক্তিও কৌলিন্য পেতে পারবেন।[৫০]

কুলীনদের বাড়তি সম্মানসূচক পদবী

মহারাজা বল্লাল কায়স্থ কুলীনদের জন্য বাড়তি সম্মানসূচক পদবীও প্রদান করেন। ঘোষদেরকে দেন দস্তিদার, বসুদেরকে ঠাকুর এবং গুহদেরকে দেন ঠাকুরতা।[৫১]

ঘটক সম্প্রদায় সৃষ্টি

কুলীনেরা যাতে সদাচারপরায়ণ থাকেন, সে জন্য ঘটক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ঘটকদের বিশেষ কাজ হয় তারা কুলীনদের বংশাবলী ও কর্ম সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা করে কুলজী বা কুলশাস্ত্র লিখবেন ও সংরক্ষণ করবেন এবং তাদের গুণদোষ ও কৌলিন্যের লক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।[৫২]

কুলীনদের জন্য নানকার জমি

কুলীনদের ভরণপোষণের জন্য দেয়া হয় লাখেরাজ (নিষ্কর বা নানকার) সম্পত্তি।[৫৩] এই প্রসঙ্গে আব্দুল হক চৌধুরী লিখেছেন, "কুলীনেরা গ্রামে বসবাস করতেন। বাদশাহ-নবাবদের প্রদত্ত লাখেরাজ জায়গির জমিগুলি দেওয়া হয়েছিল গ্রামে। গ্রাম্য সভ্যতা ও সমাজের মধ্যমণি ছিলেন কুলীন সম্প্রদায়। তারা নিজে কায়িক পরিশ্রমমূলক কাজ—হালচাষ করা, ভার বহন করা প্রভৃতিকে নিন্দনীয় কাজ বলে গণ্য করতেন। তারা ভূমি দিয়ে নিজেদের আরাম আয়েশ ও বিলাস-জীবন যাপন করার সুবিধার্থে দৈনন্দিন কাজকর্ম করার জন্য গোলাম-বাঁদী, ধোপা-নাপিত, তেলি, কুমার, ইমাম-মোয়াজ্জেম প্রভৃতি পোষণ করতেন।"[৫৪] এই একই প্রসঙ্গে কে এম রাইছ উদ্দিন খান লিখেছেন, "অনেকের মতে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের মধ্যে তার (বল্লালের) রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল। বাংলার যে সকল ব্রাহ্মণ বা অন্য শ্রেণী তাকে সমর্থন করত না, তিনি তাদের সামাজিক অবনয়ন করেন, যারা তার সমর্থক ছিল তাদের কুলীন ঘোষণা করে স্বতন্ত্র শ্রেণী ও সমর্থক সৃষ্টি করেন।...কুলীন, ভঙ্গকুলীন, অভঙ্গকুলীন, রাঢ়ী, বৈদিক, বারেন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য কুলে তারা ব্রাহ্মণদের ভাগ করে ফেলেন। অব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও নানা

ভাগ করা হয়। অনুগত ব্রাহ্মণদের সাহায্যে পুরাণ ও পুঁথি লিখিয়ে ইচ্ছামত বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি বর্ণনা করা হয় এবং স্বৈরাচারীভাবে কাউকে উচ্চ কাউকে নীচু বলে ঘোষণা করা হয়। সমাজে জাত-পাতের বিভেদটাই প্রবল হয়ে উঠে।...এর আড়ালে একটি তথাকথিত উচ্চ বর্ণ ও গোষ্ঠী গড়ে উঠে যারা সমাজের বিভিন্ন সুযোগ ও সুবিধার একচেটিয়া ভাগীদার হন।"[৫৫]

দিনাজপুর জমিদারি

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দিনাজপুর জমিদারীর উত্থানের ইতিহাস স্মরণ করতে পারি। —'দিনাজপুর জমিদারী, জনপ্রিয়ভাবে যা দিনাজপুর রাজ নামে পরিচিত, সতের শতকের প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়।...দিনাজপুর রাজের উত্থান ঘটে কাশী নামক এক ব্রহ্মচারীকে ঘিরে।...জনশ্রুতি এই যে, তার ভূ-সম্পত্তির মূল উৎস ছিল কালী দেবীর নামে উৎসর্গকৃত দেবোত্তর ভূমি।'[৫৬]

কুলীনেরা মোগল রাজস্ব ব্যবস্থার মূল ভিত্তি

আমরা দেখতে পাই গোটা খ্রিষ্টীয় সতেরো শতক পর্যন্ত কুলীন নামে পরিচিত এই গ্রামীণ জমিদাররাই ছিলেন মোগল রাজস্ব ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এই বিষয়ে লেনিন আজাদ লিখছেন, "গ্রামীণ জমিদার ছিল মূলত কৃষক। অন্যান্য কৃষকের মতই নিজে কিংবা কখনও মজুর নিয়োগ করে সে জমি চাষ করতো, ফলে যে গ্রামে সে বাস করতো, যে জমি সে চাষ করতো, সেই গ্রাম ও জমির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তার মেলামেশা, চলাফেরা সবই ছিল এই গ্রামেরই সঙ্গে। ফলে গ্রাম, জমি ও কৃষকদের সম্পর্কে তার এক স্থায়ী মমত্ববোধ গড়ে উঠতো। ...এই গ্রামীণ জমিদারগণই ছিল প্রায় গোটা সতেরো শতক পর্যন্ত মোগল রাজস্ব ব্যবস্থার মূল ভিত্তি কিন্তু সতেরো শতকের শেষ দিকে এসে যখন মোগল সম্রাট দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো, তখন যত সহজ পন্থায় সর্ব্বোচ্চ রাজস্ব হাতে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থাই সে করতে থাকে। গ্রামীণ জমিদারগণের বিপরীতে সৃষ্টি করা হয় সমরশক্তিতে বলীয়ান একটি নতুন জমিদার শ্রেণী, যারা সাধারণত কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি শ্রেণী।...সামরিক শক্তি অর্জন জমিদারী বন্দোবস্ত পাবার হাতিয়ারে পরিণত হওয়াতে নতুন ও শক্তিশালী জমিদারগণের সামনে গ্রামীণ জমিদারগণ কোণঠাসা হয়ে ওঠে।"[৫৭]

কুলীনেরা ব্যঙ্গচ্ছলে বল্লাল সেনিয়া বলে আখ্যায়িত হন

ইতোপূর্বে (অর্থাৎ সুলতান শাহ শুজা ও মঙ্গৎ রায় ওরফে নবাব আবুল ওরফে মহারাজা বল্লালের আমলে) যেসব আইমাদার নিষ্কর জমি ভোগ করতেন এবং যেসব জায়গিরদার রাজ-ফরমানের বলে বিপুল জায়গির লাভ করে সরকারের জমি ও রাজস্ব ফাঁকি দিতেন,

তাদের অনেকেরই বহু জমি নতুন গভর্নর মীর জুমলা সরকারের খাসে আনয়ন করে তাদের অসচ্ছলতার সৃষ্টি করেন।[৫৮] এতদ্ব্যতীত খ্রিষ্টীয় আঠারো শতকের Comprador শ্রেণীর বাঙালীরা যারা বেনিয়ানি-মুচ্ছুদ্দিগিরি-দেওয়ানী-সরকারী ইত্যাদি কর্ম করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে দলে দলে 'জমিদার' হতে আরম্ভ করলেন। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি নিয়ম ছিল যে, কোন ভূস্বামী নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে খাজনা দিতে না পারলে তার জমি নিলামে বিক্রয় হবে। প্রাচীন বনেদী জমিদাররা নির্দিষ্ট দিনক্ষণে রাজকোষে প্রাপ্য টাকা জমা দিতে অভ্যস্ত নন। তাই কর্নওয়ালিসের নতুন বন্দোবস্তের কড়া আইনের ফলে তাদের জমিদারী একে একে নিলামে উঠতে লাগল। শহরের মুচ্ছুদ্দি-বেনিয়ানরা নিলাম থেকে সেই জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হতে থাকলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ বনেদী জমিদারই সর্বস্বান্ত হয়ে ঘোর দুর্দশায় পড়লেন।[৫৯] ফলে এই সময়ে আমরা দেখতে পাই বনেদী জমিদারগণ অর্থাৎ বল্লাল সেন সৃষ্ট কুলীনেরা ব্যঙ্গচ্ছলে 'বল্লাল সেনিয়া' বলে অভিহিত হন। এই বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে কায়স্থ সমাজের প্রাধান্য ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। বড় বড় ভূস্বামী ও জমিদারেরা প্রায় সকলেই কায়স্থ বংশোদ্ভূত ছিলেন। বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা উচ্চতর হিন্দু সমাজে পূর্বের মতোই প্রাধান্য অব্যাহত রাখিয়াছিল— যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কুলীনগণ ব্যঙ্গচ্ছলে 'বল্লাল সেনিয়া' বলিয়া উল্লিখিত হইতেন।"[৬০]

মহাদেবীর পূজা জনপ্রিয় হয় কুলীনদের মাধ্যমেই

আমরা লক্ষ করি, এই সময়ে অর্থাৎ বল্লাল রাজার সময়ে সমাজের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার একচেটিয়া ভাগীদার নবসৃষ্ট এই কুলীন শ্রেণীটির সাহায্য ও সহযোগিতাতেই তান্ত্রিক ধর্ম তথা মহাদেবীর পূজা-উৎসব সমগ্র বঙ্গদেশে জনপ্রিয় ও সর্বব্যাপী হয়ে যায়। এই বিষয়ে মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, "এ অঞ্চলে দুর্গা পূজার সমারোহ, জনপ্রিয়তা, সর্বজনীন উৎসবে পরিণত করার পেছনে প্রধান ভূমিকা জমিদারদের।"[৬১] আবার এই সম্বন্ধেই রতনলাল চক্রবর্তী লিখেছেন, "বাংলাদেশে মন্দির নির্মাণের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সুগভীর যোগাযোগ ছিল। বাংলাদেশের দুর্গাপূজার ইতিহাস ও প্রকৃতি বিচারে দেখা যায় যে এই ব্যাপক বার্ষিক দুর্গোৎসবের সঙ্গে মধ্যযুগের ক্ষুদ্র সামন্ততন্ত্র এবং পরবর্তীকালের জমিদারী ও তালুকদারী প্রথার যোগাযোগ রয়েছে।"[৬২] দেখা যায় যে, এই সময়ে মঠ-মন্দির-পুকুর-দীঘি নির্মিত হয় কুলীনদের বাড়ীর নিকটে, যেখান থেকে তারা সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। কেননা তারা ছিলেন সমাজপতি। এলাকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রধান ছিলেন তারাই।[৬৩] দেখি "এই সময়কার মন্দিরসমূহ ভূস্বামী ও সামন্তদের প্রশাসনিক কেন্দ্রের নিকট নির্মিত হতো। সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোতে এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং স্থানীয়ভাবে তারাই ছিলেন নেতা।"[৬৪]

কুলীনদের বাড়ীর সামনে আরাকানী ঐতিহ্যে মঠ-মন্দির নির্মাণ

আমরা জানি, প্রতিটি বাঙ্গালী হিন্দুর বাড়ীর সামনে থাকে ফুলের বাগান, তুলসীতলা, নাটমন্দির ইত্যাদি যা পারিবারিক ব্যবহারের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু আরাকানীদের বাড়ী নির্মাণের বেলায় এমনটি হয় না। তারা মঠ-মন্দির-পাঠশালা নির্মাণ করে, পুকুর-দীঘি খনন করে সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য। এই সম্পর্কে মুস্তফা মজিদ লিখেছেন, "পাড়ায় পাড়ার নেতার (মাতব্বর) অনুমতি সাপেক্ষে ঘর তুলতে হয়। ...প্রতিটি বাঙ্গালী হিন্দুর বাড়ীর সামনে যেমন ফুলের বাগান, তুলসীতলা, নাটমন্দির ইত্যাদি থাকে রাক্ষাইনদের (আরাকানী) এককভাবে তেমনটি নেই। প্রতিটি পাড়ায় সার্বজনীন বৌদ্ধ মন্দির, পাঠশালা, বড় বড় পুকুর, বৌদ্ধ মঠ ইত্যাদি রয়েছে। যেগুলো সবই সার্বজনীনভাবে ব্যবহারযোগ্য।"[৬৫] আমরা দেখতে পাই বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এই সময়ের ভূস্বামীদের (কুলীনদের) বাড়ীর সামনেও রয়েছে সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য মঠ-মন্দির-পাঠশালা-মসজিদ-পুকুর-দীঘি। আরাকানী ঐতিহ্য ও রীতিতে নির্মিত এই সব কুলীনদের বাড়ী যে বল্লাল রাজার আমলেরই কীর্তি, তাতে কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না। কেননা আমরা জানি, এই আমল ছিল 'রাজা তার রাজ্যের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র অধিপতি এবং সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য মঠ-মন্দির-মসজিদ-পাঠশালা নির্মাণ ও পুকুর-দীঘি খনন রাজারই দায়িত্ব' এই ঐতিহ্যে বিশ্বাসী শরণার্থী আরাকানরাজ মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুলেরই আমল।

বল্লালী আমলে মুসলিম সমাজে তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব

এই আমলে বাংলার মুসলিম সমাজও তান্ত্রিক ধর্মের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়। এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদের ভাষায়, "ষোল শতকের পরে মুসলিম সমাজে তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে নানাবিধ কুসংস্কার, দুর্নীতি ও অনৈসলামিক কার্য্যাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটে। হিন্দু সমাজের গুরুবাদ মুসলিম সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। নানা প্রকার পীরবাদের উদ্ভব ঘটে এই সময়ে।"[৬৬]

কার্ত্তিকপুরের মুসলমান জমিদারদের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা

আবার এই প্রসঙ্গেই বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক শ্রীহিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "মান সিংহের সঙ্গে আগত মোগল সৈন্যের অন্যতম সেনাপতি ফতেহ মহম্মদ নামে একজন বীর যুবক সেক কালুর কন্যা নুরুন্নেছার পাণিগ্রহণ করিয়া কার্ত্তিকপুরে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি আর বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দিল্লীতে মোগলের অধীনে কার্য্য করেন নাই। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ত্তিকপুরের নূতন জমিদারীর নাম দিল্লীর বাদশাহ শাহজাহান সরকারে পত্তন করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে জমিদারী আরম্ভ করেন।...কার্ত্তিকপুরের

চৌধুরীগণের মধ্যে যাহারা জীবিত আছেন তাহারা বলেন, আমাদের বংশের ইতিহাস নাই, আমরা জানি না।...জমিদার ফতেহ মুহম্মদ হিন্দু কর্মচারী ও আমলাদের মঙ্গলের জন্য অনেক সাধু অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে কার্ত্তিকপুরে গো-হত্যা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক জাতি নির্বিশেষে ধর্মের প্রতি সম্মান দেখান তাহার জীবনের একটি মহান কর্তব্য ছিল। অত্যাচার পীড়িত ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতির ধর্ম রক্ষা করা তাহার মহত্বের পরিচায়ক। তিনি সর্বপ্রথম বিক্রমপুরে মহরমের তাজের শোভাযাত্রা বাহির করেন। তাহার পুত্র শাহ মুহম্মদ হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি হিন্দুর অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন নাই। সর্বদা হিন্দুর ধর্ম আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন।...বেজগাঁ গ্রামনিবাসী ভট্টাচার্য্য বংশীয় এক ব্রাহ্মণকে এক দ্রোন জমি দান করিয়া তিনি জয়কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।...ফতেহ মুহম্মদ তদীয় কার্ত্তিকপুর আবাসভূমিতে প্রকাণ্ড ইষ্টকালয় নির্মাণ করান।...বাটির পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ ছিল এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যভাগে সিংহদ্বারের সমসূত্রে ৪টি ঝিকুটি ঘর সংস্থাপিত ছিল। সিংহদ্বারের দুই পার্শ্বে দুই প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল।...ফতেহ মুহম্মদের বংশধর ফেরউদ্দীন (দানু মিয়া) হিন্দু ধর্মের অনুরক্ত ছিলেন। গলদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ ও হিন্দুর ন্যায় মহোৎসবাদি কার্য সম্পন্ন করিলে পুণ্যার্জন হয় বলিয়া তিনি ধারণা করিতেন। তাহার মনে বিশ্বাস ছিল তিনি শাপভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ।...ফেরউদ্দীনের বংশধর করমদ্দীনের সময়ে শরণখলা নিবাসী শিবকান্ত করদাসের প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতু নির্মিত কালী মূর্তি করমদ্দীর নিজ ব্যয়ে বাজারের পশ্চিমাংশের হিন্দু পল্লীতে সংস্থাপিত হয়। ...মুন্সী করমদ্দীর নিজ ব্যয়ে এই কালীবাড়িতে দোল, চড়ক প্রভৃতি হিন্দু ধর্মানুমোদিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান হইত।... রাজনগরের রাজবল্লভের সহিত প্রতিযোগিতায় মুন্সীরা জয়লাভ করেন। ফলে অনতিবিলম্বে তাহারা সমারোহ সহকারে এক বৃহৎ কালী মূর্তি নির্মাণ করাইয়া তাহার পূজা করেন। হিন্দুদিগের দেবদেবীর প্রতি মুসলমানদিগের ঈদৃশ বিশ্বাস দেখিয়া যারপর নাই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। এই মূর্তি এখনও সংস্থাপিত আছে। আজিও মহাসমারোহে উহার অর্চনাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।...ইহাদের বাড়ীর সামনে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ একটি মেলা মিলিয়া থাকে।"[৬৭]

বল্লাল রাজা বঙ্গদেশে সমন্বয়বাদী জীবনধারা গড়তে চান

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে তান্ত্রিক ধর্মের পরম অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল বঙ্গদেশে একটি সমন্বয়বাদী জীবনধারা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার সহযোগী ও সমর্থক হিসেবে কুলীন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন এবং এদের প্রতক্ষ্য সমর্থন ও সহযোগিতাতেই সমন্বয়মূলক তান্ত্রিক ধর্মকে তথা মহাদেবী মাউ (উমা) তথা চণ্ডীর (দুর্গা ও কালীরূপে) পূজা ও উৎসবকে সমগ্র বঙ্গদেশে সর্ব শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন।

বাঙালীর দুর্গা-পূজা আসলে আরাকানীর মাউ-পূজা

বাঙালীর দুর্গা- পূজা অসলে মাউ (উমা)-রই পূজা। এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদচন্দ লিখেছেন, "প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশে এখন দুর্গার যে মূর্তি পূজিত হয় তাহা মহিষাসুর নিধনে নিরতা রণচণ্ডিকার মূর্তি নহে। বৎসরান্তে মাতা মেনকার এবং পিতা হিমালয়ের গৃহে পুত্রকন্যাসহ আগত উমার পূজা। সংস্কৃত বা উপপুরাণে এই পূজার বিধি নাই। বাংলা ভাষায় রচিত দুর্গামঙ্গল কাব্যগুলি এই পূজার শাস্ত্র।...শাস্ত্রসম্মত পূজা পদ্ধতিতে মহিষমর্দিনীর ধ্যানানুসারেই মূল মূর্তি গঠিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এবং গণেশের সহিত বাপের বাড়িতে আসিয়া মহিষাসুরবধ ব্যাপারটা অভিনয়ের মতো দেখায়, ইহাতে ধ্যানের মহিষমর্দিনীর অবমাননা করা হয়। কিন্তু একথা এদেশে কেহই লক্ষ্য করেন না।"[৬৮]

তথ্যনির্দেশ

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ৪৩৫-৪৩৬।

২। প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৪০-১৪২।

৩। বাংলাপিডিয়া : ১নং খণ্ড : ঢাকা : পৃঃ ৪৩৪ ; বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা: পৃঃ ৮৩-৮৫; মহাকবি আলাওল : নুরুল ইসলাম মানিক : পৃঃ ৪।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৪৭-৫৯, ১১৫, ১৫০-১৫১, ৫০২-৫৩৯।

৫। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা : ১ম ও ২য় খণ্ড : পৃঃ ৫০।

৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ৪৭।

৭। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা : ১ম ও ২য় খণ্ড : পৃঃ ৫০।

৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৫১।

৯। প্রাগুক্ত।

১০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ১৭০-১৭৪।

১১। পূজাপার্বণের উৎসকথা : পল্লব সেনগুপ্ত : পৃঃ ১২৩ ; বাংলা দেশের ইতিহাস: ২য় খণ্ড : মজুমদার: পৃঃ ২৭৯।

১২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ১৪২-১৪৩।

১৩। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা : ১ম খণ্ড : গোপাল হালদার : পৃঃ ৩৬।

১৪। বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত : ড. ওয়াকিল আহম্মদ : পৃঃ ১৫৬।

১৫। A Short History of Muslim Rule in India : Ishwari Prasad : P. 280.

১৬। পূজাপার্বণের উৎসকথা : পল্লব সেনগুপ্ত : পৃঃ ২৪।

১৭। বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ২৫৯।

১৮। দেবতাত্মা হিমালয় : পৃঃ ৩৩৯-৩৪০।

১৯। A Short History of Muslim Rule in India : Ishwari Prasad : PP. 384, 481; History of Aurongzeb : Vol. III : P. 86.

২০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ৪-৫।

২১। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৪৫।

২২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৪৫, ৫৭।

২৩। বিক্রমপুর : ১ম খণ্ড : পৃঃ ৩০।

২৪। ভারতের ইতিহাসকথা : ১ম খণ্ড : পৃঃ ২২১।

২৫। The Early History of India : V.A.Smith : 1924 : Oxford : P. 403; বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ২৭৮।

২৬। বাংলা দেশের ইতিহাস : ২য় খণ্ড : মজুমদার : পৃঃ ২৪০।

২৭। Erotic Sculpture of Khajuraho : P. 62.

২৮। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ৫৫৯-৫৬০।

২৯। বাংলা দেশের ইতিহাস : ২য় খণ্ড : মজুমদার : পৃঃ ২৭৯।

৩০। বিক্রমপুর : ২য় খণ্ড : পৃঃ ২০০-২০২।

৩১। Notes on the Antiquities of Dacca : S. A. Hasan : 1912 : Dacca: P. 12; History of Bengal (M.P.) : Sarkar : P. 333; Dacca : The Mughal Capital : Dr. A. Karim : 1965 : Dacca : P. 51.

৩২। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক : ড. মমতাজুর রহমান তরফদার : ১৯৯৫ : ঢাকা: পৃঃ ১২৭।

৩৩। দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য : শরীফ উদ্দিন আহমেদ : ১৯৯৬ : ঢাকা: পৃঃ ১৪৭-১৪৯।

৩৪। বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ২৫৪-২৬২।

৩৫। বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন : সুনীথানন্দ : পৃঃ ২৩৬।

৩৬। দৈনিক সংবাদ : ২৪ অক্টোবর ১৯৯৩ : তন্ত্রালোকে সামাজিক অসুর পরিচয় : রণজিত কুমার চক্রবর্তী।

৩৭। বিক্রমপুর : ১ম খণ্ড : পৃঃ ২০১-২০৩।

৩৮। Vallala Charita : Ananda Bhatta : P. 3.

৩৯। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ৫২৫-৫৩২, ৫৫৯-৫৬০ ; বাংলা দেশের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ : মজুমদার : পৃঃ ১৬৪-১৭০।

৪০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ : ৪র্থ খণ্ড : পৃঃ ২৭৪।

৪১। তিব্বতে সওয়া বছর : পৃঃ ৯৭।

৪২। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ৫২৫-৫৩২, ৫৫৯-৫৬০ ; বাংলা দেশের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ : পৃঃ ১৬৪-১৭০।

৪৩। ভারতকোষ : ৫ম খণ্ড : পৃঃ ৪৬৭, ৫০৬-৫০৭, ৫২০-৫২১।

৪৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ১১১৪-১১১৫।

৪৫। লোকায়ত দর্শন : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৮১।

৪৬। তিব্বতে সওয়া বছর : পৃঃ ১৪৭।

৪৭। Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal : Vol. 2 : James Wise: 1883 : London : PP. 313-315.

৪৮। দৈনিক প্রথম আলো : ১৫ মে ২০০৩ : পৃঃ ৯ : গৌতম বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন।

৪৯। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ : বিনয় ঘোষ : ১৯৯৩ : কলিকাতা : পৃঃ ২৮৬।

৫০। আদিশূর ও বল্লাল সেন : পার্বতী শঙ্কর রায় চৌধুরী : পৃঃ ১৮, ৫১-৫৬; বৃহৎ বঙ্গ : ১ম খণ্ড : দীনেশচন্দ্র সেন : ১৩৪১ : কলিকাতা : পৃঃ ৪৮০-৪৮৫, ৫৩৬-৫৩৮; বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : পৃঃ ২৫৮-২৬২; Bengal in the Reign of Aurongzeb : Dr.Anjali Chatterjee : 1967 : Calcutta : PP. 204-207.

৫১। মাসিক বিক্রমপুর : ১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা : ১৯৭৮ : পৃঃ ৬।

৫২। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ : পৃঃ ২৮৬-২৯০।

৫৩। বিক্রমপুর : ২য় খণ্ড : পৃঃ ১৪২।

৫৪। চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গে : ২য় খণ্ড : আব্দুল হক চৌধুরী : ১৯৮৫ : চট্টগ্রাম: পৃঃ ৭।

৫৫। বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা : কে. এম. রাইছ উদ্দিন : ১৯৮৬ : ঢাকা : পৃঃ ১৩৯-১৫২।

৫৬। দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য : পৃঃ ১৬৫ ; ফকীর মজনু শাহ : মুহম্মদ আবু তালিব : ১৯৮৮ : ঢাকা : পৃঃ ৫৮।

৫৭। ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো : লেনিন আজাদ: ১৯৮৯ : পৃঃ ৪৪-৪৭।

৫৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ১৮।
৫৯। বাংলার নবজাগৃতি : বিনয় ঘোষ : পৃঃ ১৭৩ ; বাংলা দেশের ইতিহাস : ৩য় খণ্ড : মজুমদার : পৃঃ ৪৯।
৬০। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ৩২-৩৩।
৬১। বাংলাদেশের উৎসব : মুনতাসীর মামুন : পৃঃ ৮৪।
৬২। বাংলাদেশের মন্দির : রতনলাল চক্রবর্তী : পৃঃ ২৪।
৬৩। ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো : পৃঃ ৯৫-৯৬।
৬৪। বাংলাদেশের মন্দির : রতনলাল চক্রবর্তী : পৃঃ ৩০।
৬৫। পটুয়াখালীর রাাইন উপজাতি : পৃঃ ৬৭।
৬৬। দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য : পৃঃ ২১৫।
৬৭। বিক্রমপুর : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৩৪৫-৩৬৭।
৬৮। বাংলাদেশের উৎসব : মুনতাসীর মামুন : পৃঃ ৮৯।

অধ্যায় ২০

আকবরের দীন-ই-ইলাহী, আকবর শাহজাদা দারা ও মঙ্গৎ রায়ের আদর্শ ছিলেন, বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ, মগী সনের প্রথম দিন ও প্রথম মাস, বৌদ্ধদের নিকট বৈশাখ মহাপবিত্র মাস

বাংলা সন ও হিজরী সন সমবয়সী, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সম্রাট আকবর সূর্যদেবতার উপাসনা করতেন, আকবরের দীন-ই-ইলাহী, শাহজাদা দারা সমন্বয়মূলক ধর্ম ও মিশ্র সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, দারা বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করেন, বাংলা সন আকবরের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে যুক্ত, বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ, বৌদ্ধ ধর্ম প্লাবিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৈশাখ মাসে বর্ষারম্ভের তিন দিনব্যাপী উৎসব, বৈশাখ মাসে বর্ষ শুরুর কারণ।

হিজরত ও হিজরী সন

আমরা দেখতে পাই জন্মকালের দিক দিয়ে বাংলা সন ও হিজরী সন সমবয়সী অর্থাৎ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এদের উভয়েরই শুরু ধরা হয়েছে। এই বৎসর মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) কুরাইশদের দ্বারা মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদীনাতে এসে আশ্রয়প্রার্থী হন। রসুলুল্লার এই দেশত্যাগকে আরবীতে হিজরত বলা হয়। হিজরতের স্মৃতি রক্ষার্থে এই সনের প্রচলন হয় বলে একে হিজরী সন বলে। হিজরতের ৯৬৩ বছর পর দিল্লীর সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১]

সম্রাট আকবর সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন

সম্রাট আকবর সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কাশ্মীরের একটি দেবালয়ে সম্রাট আকবর যে শিলালিপি সংযুক্ত করেন তাতে লিখা হয়—

"O, God in every temple I see people that
Seek Thee, and in every language I hear
Spoken, people praise Thee !
Polytheism and Islam after Thee.
Each religion says, Thou art One without equal."[২]

তিনি নিয়মিত সূর্যদেবতার পূজা করতেন। "He (Akbar) listened to discourses on the Christian faith, but showed no sign of abandoning his worship of the Sun, which he adored every day at sunrise, and an image of which he constantly kept near him."[৩] তিনি অনেকটাই হিন্দু ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি গোহত্যা নিষিদ্ধ করেন। রাখী, দিপালী, শিবরাত্রি প্রভৃতি হিন্দুধর্মীয় উৎসবে নিয়মিত যোগদান করতেন।[৪] হিন্দুদেরকে তিনি ধর্মপালনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন। শিবরাত্রির তিথিতে তিনি হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং তাদের সঙ্গে খানাপিনা করতেন।[৫]

আকবরের দীন-ই-ইলাহী

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে সম্রাট আকবর এ দেশের সুফীতত্ত্ব, দর্শন ও প্রকৃতি উপাসনার সংমিশ্রণে সর্বেশ্বরবাদী এক অভিনব ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেন। নাম দেন এর দীন-ই-ইলাহী বা তৌহিদ-ই-ইলাহী। "The new religion was officially promulgated in the year 1581. It was an eclectic pantheism, containing the good points of all religions— a combination of mysticism, philosophy and nature-worship."[৬] এই দীন-ই-ইলাহীর কার্যকলাপ অনেকাংশেই ছিল ইসলাম বিরোধী।[৭]

আকবরের চিন্তা-চেতনার প্রতিভূ ছিলেন দারা ও বল্লাল

পরবর্তীকালে সম্রাট আকবরেরই চিন্তা-চেতনার প্রতিভূ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তম পুত্র যুবরাজ দারা শিকোহ। যুবরাজ দারা শিকোহ সমন্বয়মূলক ধর্ম ও মিশ্র সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এমন একটা ধর্ম বানাতে চান, যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই সমভাবে গ্রহণ করবে।[৮] এ ছাড়া দারা হিন্দু ধর্মেরও পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সে কারণে তিনি প্রকৃত ও বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম প্রচার ও প্রসারেরও জোর প্রচেষ্টা চালান। জহীরুদ্দীন ফারুকীর ভাষায়, "Dara ...set to work with some seriousness with the result that we see in him an admirer of the pantheistic system of the Hindu faith... Dara was anxious to propound real and pure Hinduism."[৯] ভারতে সমন্বয়বাদী ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে মহান সম্রাট আকবর যে

যুবরাজ দারা শিকোহ ও শরণার্থী মগ রাজা মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুলসহ সমন্বয়মূলক ধর্ম ও মিশ্র সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী সকল রাজপুরুষের নিকট নমস্য ছিলেন এটাই স্বাভাবিক। এবং সে কারণেই যে বাংলা সনের প্রবর্তক এই সনটিকে মহান সম্রাট আকবরের গৌরব রক্ষার জন্য সম্রাটের সিংহাসনারোহণের স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত করেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ

আমরা জানি, বাংলা সনের মাস ও দিনের নাম হিজরী সন কিংবা ইলাহী সন থেকে নেয়া হয় নি, নেয়া হয়েছে ভারতীয় শকাব্দ ও বিক্রমাব্দ থেকে। কেননা বাংলা সনের মাস ও দিনের নাম শকাব্দ বা বিক্রমাব্দের মাস ও দিনের নামেরই অনুরূপ। তবে শকাব্দের প্রথম মাস চৈত্র বা বিক্রমাব্দের প্রথম মাস কার্ত্তিককে কিন্তু বাংলা সনের প্রথম মাস হিসেবে গ্রহণ করা হয় নি। বাংলা সনের প্রথম মাস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে শকাব্দের দ্বিতীয় মাস ও বিক্রমাব্দের সপ্তম মাস বৈশাখকে। এই বৈশাখ মাস খ্রিষ্টীয় সনের এপ্রিল মাস মোতাবেক। বাংলা সনের শেষ দিন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে চৈত্র সংক্রান্তিকে এবং পরের দিন পয়লা বৈশাখকে গ্রহণ করা হয়েছে নববর্ষ হিসেবে।[১০] অথচ আমরা সকলেই জানি স্মরণাতীত কাল থেকেই ধন-ধান্যে ভরা অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরে বর্ষ গণনার রীতি প্রচলিত ছিল বঙ্গদেশে। অগ্রহায়ণ মানেই বর্ষ শুরুর মাস। অগ্রহায়ণ বা বৎসরের অগ্রে যে যায়। অন্য অর্থে ধান্য উৎপাদনের মাস।

বাঘার বাংলা 'মুলকী সনের' প্রথম মাস অগ্রহায়ণ

স্মর্তব্য যে রাজশাহীর বাঘা এলাকায় অবস্থিত 'রফীকী ওয়াকফ স্টেটের' একটি নিজস্ব বাংলা সন আজ কয়েক শত বছর ধরে চলে আসছে। নাম এর 'মুলকী সন'। এই সনেরও শুরু ধরা হয়েছে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই।[১১] উল্লেখ্য যে সম্রাট শাহজাহান যুবরাজ হিসেবে পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ১৬২৪-২৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে, যখন বঙ্গদেশ জবরদখল করেন তখন তিনি বাঘার পীর মৌলানা আব্দুল ওয়াহাবের নামে ৪২টি মৌজা মদদ মাস স্বরূপ ঘোষণা করেন। বাঘার পীর পরিবারের এই লাখেরাজের খাজনা আদায়ের ব্যাপারেই এই বাংলা সনটির প্রচলন হয়।[১২]

বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ হওয়ার কারণ

বাংলা সনের নববর্ষ বৈশাখ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নববর্ষ শুরু হয় একেক ঋতুতে। বাংলা নববর্ষ ঘোর গ্রীষ্মে। কিন্তু গ্রীষ্ম তো খুব মনোরম মাস নয় বাংলাদেশে, উৎসব-আনন্দও হতে পারে না

তেমন, যেমন হতে পারে শীতে বা বসন্তের শুরুতে। অনেকের মতে, বাংলা নববর্ষ তো আসলে অগ্রহায়ণেই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, কৃষির দিক বিবেচনা করলেও। যেমন, অগ্রহায়ণ ফসল কাটার মাস। কিন্তু হচ্ছে বৈশাখে। কিন্তু নববর্ষ কেন শুরু হলো গ্রীষ্মে সে রহস্য এখনও উন্মোচিত হয় নি।"[১৩] তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায়, অগ্রহায়ণ মাসের বদলে কেন বৈশাখ মাস থেকে বাংলা সনের মাস গণনা শুরু হল?

আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি, বর্মী তথা আরাকানী তথা মগী সন প্রবর্তন করেন বর্মীরাজ পোপা স্বরাহণ ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে। পোপা স্বরাহণ সরকার, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও জনগণের ব্যবহারের জন্য বিশেষত তার নবপ্রবর্তিত আরি বৌদ্ধ ধর্মের তথা তান্ত্রিক ধর্মের পালা-পার্বণ-আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র অনুসারে পালনের সুবিধার্থে একটি সৌর সন হিসেবে মগী সন প্রবর্তন করেন। প্রবর্তন করেন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সহায়তায় ভারতীয় হিন্দু পঞ্জিকার অনুকরণে। এই গণনা অনুযায়ী মেষ রাশিতে বৎসরের শুরু ও মীন রাশিতে বৎসরের শেষ হয়। সেই মোতাবেক আমাদের চৈত্র সংক্রান্তি মগী সনের শেষ দিন এবং ১লা বৈশাখ মগী সনের প্রথম দিন। অবশ্য মগী সন চান্দ্র বছরের ও বাংলা সনের মাসের নামসমূহ থেকে ভিন্ন। মগী সনের মাসের নামগুলো হল— কাছুং (বৈশাখ) [১৪], নেঅন (জ্যৈষ্ঠ), ওয়াজু (আষাঢ়), ওয়াগং (শ্রাবণ), তৌথালিন (ভাদ্র), ওয়াগিউৎ (আশ্বিন), তাসাউংমং (কার্ত্তিক), নাদাউ (অগ্রহায়ণ), পিয়াষু (পৌষ), তাবদউয়ে (মাঘ), তাবং (ফাল্গুন) এবং তাগু (চৈত্র)।[১৫] তবে বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও যখন চট্টগ্রামের জমির দলিলপত্রে মগী সন উল্লিখিত হত, তাতে কিন্তু মগী মাসের নাম লিখিত হত না, লিখিত হত বাংলা মাসেরই নাম। কারণ এখানে মগী সন ব্যবহৃত হলেও মগী মাসের নাম প্রচলিত ছিল না।[১৬] উল্লেখ থাকে যে বাঙালীমাত্রই কিন্তু বাংলা সন ব্যবহার করে না। ত্রিপুরা এবং কুমিল্লায় আজো ত্রিপুরাব্দ এবং চট্টগ্রামে মগী সন অঞ্চলবাসীর প্রাত্যহিক চিন্তা-চেতনায় ও ব্যবহারে চালু রয়েছে। অবশ্য পয়লা বৈশাখেই হয় বর্ষ শুরু। অগ্রহায়ণ অচল হয়ে গেছে।[১৭]

এককালে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও আসামে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য ছিল।[১৮] এখনও প্রাধান্য আছে এই অঞ্চল সংলগ্ন আরাকান-মিয়ানমার-থাইল্যান্ডে। দেখি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলেই হয় বৈশাখ মাসে বর্ষ শুরুর তিন দিনব্যাপী উৎসব। ত্রিপুরায় এই উৎসবের নাম বৈসু, আসামে বিহু, থাইল্যান্ডে সংক্রান্ত, মিয়ানমার-আরাকানে সাংগ্রাইং এবং বাংলাদেশের কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় এই উৎসবকে বৈসাবী উৎসব নামে পালন করে।[১৯] গবেষক এন. এম. হাবিব উল্লাহ মঘী সন ও বাংলা সনের নববর্ষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, "সম্রাট আকবরের হিজরী বা আরবী সন মোতাবেক রাজ্যাভিষেক সালটাকে সৌরবর্ষে রূপান্তরিত করে বাংলা সনের প্রবর্তন হয়। তাই বাংলা সন এবং হিজরী সন সময়ের একই বিন্দু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। অন্যদিকে দেখা যায়, যেদিন বাংলা সনের নববর্ষ, ঠিক একই দিন মঘী সনেরও নববর্ষ। অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষ যেদিন বাংলা নববর্ষ উদযাপন করে, ঠিক একই দিন রাখ্যাইনরাও

মঘী সনের অনুকরণে নববর্ষ পালন করে। রোসাঙ্গের বাঙালি কবিদের বিবরণেও আমরা মঘী সনের উল্লেখ পাই। তবে কি মঘী সন ও বাংলা সনের মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে।"[২০]

প্রশ্ন হচ্ছে, বৌদ্ধপ্লাবিত এই সব অঞ্চলে বৈশাখ মাসে বর্ষ শুরুর কারণ কী? এর উত্তরে ভিক্ষু সুনীথানন্দ লিখেছেন, "চৈত্র সংক্রান্তি বাংলাদেশীয় বৌদ্ধদের একটি আকর্ষণীয় উৎসব ও পার্বণ দিবস। এই দিন বছরের শেষ দিন। জানা যায়, বাংলা বৎসর গণনার প্রথম মাস ছিল অগ্রহায়ণ কিন্তু পরবর্তী সময়ে ভগবান তথাগতের ত্রি-স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা দিবস বৈশাখ মাসে বলেই বছরের প্রথম মাস হিসাবে একে গণনার রীতি প্রচলন করা হয়। পরবর্তী সময়ে এ গণনানুযায়ী চৈত্র সংক্রান্তি বছরের শেষ এবং ১লা বৈশাখ নববর্ষের আগমনী হিসাবে বাঙালি বৌদ্ধদের নিকট দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। এ দিনটিতে ফুলতোলা, জলোৎসব অর্থাৎ পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে আনন্দ করা, নববস্ত্র পরিধান করা, রাস্তায় খৈ ছিটানো, পরস্পরকে আহ্বান করে খাওয়ানো ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, বোধিবৃক্ষের গোড়ায় জল ঢেলে তার শ্রীবৃদ্ধি কামনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান এ চৈত্র সংক্রান্তি দিবসের বিশেষ আকর্ষণ। এ উপলক্ষে বিভিন্ন মেলারও আয়োজন হয়ে থাকে।"[২১]

বৌদ্ধ তথা আরাকানীদের নিকট বৈশাখ মাস মহা পবিত্র মাস। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেবের পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত এই মাস। এই মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধদেবের জীবনের তিনটি স্মরণীয় ও সুমহান ঘটনা ঘটে ইতিহাস হিসেবে বৌদ্ধ জগতে যার গৌরব অনস্বীকার্য। ঘটনাগুলো হল—

১। এই বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয়েছিল পিতৃভূমি নেপালের কপিলাবস্তু ও দেবদহ রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থান লুম্বিনীর শালবনে।

২। এই তিথিতেই সিদ্ধার্থের পয়ত্রিশ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ মূলে কেশ নিবৃত্তির মাধ্যমে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করে হয়েছিলেন বুদ্ধ।

৩। এই পুণ্য তিথিতেই মহাজ্ঞান লাভের পঁয়তাল্লিশ বছর পর কুশিনগরস্থ মল্লাদের শালবনে জমক শালবৃক্ষ-মূলে তিনি আশি বছর বয়সে মহানির্বাণ লাভ করেন। সাধারণত কোন মহাপুরুষের জীবনে এই তিনটি ঘটনা একই পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হওয়া একান্তই বিরল। উপমহাদেশীয় ঐতিহ্যে বুদ্ধজীবনের এই তিনটি ঘটনাকে ত্রি-স্মৃতি বিজড়িত বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বুদ্ধ জয়ন্তী (বুদ্ধের জন্ম তিথি উপলক্ষে উৎসব) নামে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু থেরবাদী মতের অনুসারী বৌদ্ধ দেশ শ্রীলঙ্কায় একে বলা হয় ওয়েসাক। বৌদ্ধবিশ্বের থেরবাদী ও মহাযানী এই উভয় বিভাগই এই বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসকে সবচেয়ে পুণ্যময় দিবস বলে আখ্যায়িত করেন। ভগবান তথাগতের ত্রি-স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা

দিবস বৈশাখ মাসে বলেই বছরের প্রথম মাস হিসেবে একে গণনার রীতি প্রচলন করা হয়।[২২] এই গণনা অনুযায়ী মেষ রাশিতে সৌর বছরের শুরু ও মীন রাশিতে সৌর বছরের শেষ হয় এবং এই হিসেবেই মগী বা বর্মী সনে বর্ষশেষ ও বর্ষশুরু গণনা করা হয়। সুতরাং এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে মগী সনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেই বাংলা সনের প্রচলন করা হয়। এখন প্রশ্ন, মগী সনের সঙ্গে মিল রেখে কে করেন বাংলা সনের প্রচলন? নন কি তিনি আরাকানী তান্ত্রিক বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ঐশ্বর্যময় ধারক-বাহক এবং বাংলায় মোগল সম্রাট শাহজাহানের করদ ঢাকায় বসবাসরত সমন্বয়মূলক ধর্মে বিশ্বাসী "কাহিনী-কিংবদন্তীর মহানায়ক কীর্তিমান মগ রাজা মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল কাশেম?"

তথ্যনির্দেশ

১। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ৬।

২। Mughal Rule in India : V.D. Mahajan : 1972 : New Delhi : P. 107.

৩। A Short History of Muslim Rule in India : I. Prasad : P. 272.

৪। Mughal Rule in India : Mahajan : P. 95.

৫। A Short History of Muslim Rule in India : I. Prasad : P. 278.

৬। Ibid : PP. 264-265, 272.

৭। ভারতবর্ষের ইতিহাস : মুসলিম শাসন : ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : ১৯৮৬: ঢাকা : পৃঃ ৩১৫, ৩১৭।

৮। জিজ্ঞাসা : ৩য় সংখ্যা : ১৪০০ : চতুর্দশ বর্ষ : কার্তিক-পৌষ : পৃঃ ৩৬৯।

৯। Aurongzeb & His Times : Zahiruddin Faruki : 1935 : Bombay : PP. 38-47.

১০। বাংলা সনের জন্মকথা : আবু তালিব : পৃঃ ২০-২৬।

১১। প্রাগুক্ত : পৃঃ ২৫-২৬।

১২। রাজশাহীর ইতিহাস : ২য় খণ্ড : কাজী মোহাম্মদ মিছের : ১৯৯৫ : ঢাকা: পৃঃ ২৩৪-২৩৫; History of Bengal (M.P.) : Sarkar : PP. 306-313.

১৩। দৈনিক জনকণ্ঠ : নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা : ১৪০২ : পহেলা বৈশাখ : মুনতাসীর মামুন।

১৪। দৈনিক ইত্তেফাক : ১২-৬-১৯৯৭ ইং : বুদ্ধং শরণং গৃছামি : উ হলা মং সৈনিক।

১৫। BRSFAP No. 2 : PP. 36-40.

১৬। প্রাচীন আরাকান রোহাইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৪৫।

১৭। খবরের কাগজ : ১২ বর্ষ ২১-২২ সংখ্যা : ২৫ মে ১৯৯৩ : পৃঃ ৪৯ : ইতিহাস না ইতিকথা : আহমদ শরীফ।

১৮। বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন : পৃঃ ৮৯।

১৯। দৈনিক জনকণ্ঠ : ১ মে, ১৯৯৭ : বিজু উৎসব : আত্মার মিলনমেলা : সৈয়দ মোশারফ; বাংলাদেশের উৎসব : খোন্দকার রিয়াজুল হক : ১৯৯৫ : ঢাকা : পৃঃ ৩৮।

২০। রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস: এন. এম. হাবিব উল্লাহ: ১৯৯৫: ঢাকা: পৃঃ ৭৯।

২১। বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন : পৃঃ ২৪২।

২২। প্রাগুক্ত : পৃঃ ২৩৫-২৩৬।

অধ্যায় ২১

চড়ক উৎসব, বিক্রমপুরে চড়ক উৎসব, চড়ক উৎসব ও সূর্য উৎসব অভিন্ন, বৌদ্ধ রাজাদের ভূমিকর্ষণ উৎসব

চড়ক উৎসব, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরাই চড়ক পূজা ও উৎসবে গুরুত্ব পায়, চিল পূজা, নববর্ষের প্রসাদ, হিন্দু-মুসলমানের সমভাবে অংশগ্রহণ, তান্ত্রিক বৌদ্ধের চক্রপূজা, তিব্বতীদের জনপ্রিয় উৎসব চোড়গ, খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতক পর্যন্ত বঙ্গের উচ্চতর হিন্দু সমাজে চড়কপূজার প্রচলন ছিল না, খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্গদেশের বৃহত্তম চড়কপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হত বিক্রমপুরের রাজনগর নামক জনপদে, চড়ক উৎসব সূর্য উৎসবও, বুদ্ধ ও সূর্য অভিন্ন, মগ রাজাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সূর্য উৎসব পালন, মগ রাজাদের রাজকীয় ভূমিকর্ষণ উৎসব, প্রাচীন চৈনিক রাজাদের রাজকীয় ভূমিকর্ষণ উৎসব, থাই রাজাদের ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠান, মগদের সূর্যোৎসবে চৈনিক সূর্য পুরাণের প্রভাব।

বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানসমূহ

বাংলা সনের ১লা বৈশাখ পালিত হয় নববর্ষ হিসেবে। বাংলা নববর্ষের অপরিহার্য ও সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে চড়ক উৎসব, পুণ্যাহ, হালখাতা ও মেলা। স্মর্তব্য যে বাংলা নববর্ষের এই সব আচার-অনুষ্ঠান হিন্দুদের শাস্ত্রীয় আচার নয়।

চড়ক উৎসব

বাংলা নববর্ষের আগের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব বাঙালী হিন্দু সমাজের একটি বড় অনুষ্ঠান। সকল শ্রেণীর হিন্দু এই উৎসবে যোগদান করেন। তবে বালা নামক এক শ্রেণীর হিন্দু চড়ক পূজার প্রধান আচার-আচরণ পালন করে থাকে। বালাদের মধ্যে একজন থাকেন মূল বালা বা গুরু। এই গুরুই

অনুষ্ঠানটি আগাগোড়া পরিচালনা করেন।[১] 'চড়ক পূজাকে কেন্দ্র করে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাকে চড়ক উৎসব বলে। চড়ক পূজা মহা আড়ম্বরপূর্ণ। এই পূজার বিভিন্ন অংশ যেমন মুদ্রাভঞ্জন বা গম্ভীর পূজা, অধিবাস বা গৃহসন্ন্যাস বা গিরিসন্ন্যাস, দ্বারপাল পূজা, পাটস্নান এবং সন্ন্যাসীদের অর্থাৎ বালা, সাঙ্গ বা সাঁইদের দেবতা প্রণাম উল্লেখযোগ্য। এদের সবগুলো একই সময়ে একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণত সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের মধ্য থেকে আগত সন্ন্যাসী বা সাঙ্গদের প্রণাম বিশেষ চিত্তাকর্ষক। বিশেষ বিশেষ ফল ও ফুল হাতে নিয়ে এক একজন সন্ন্যাসীকে বিবিধ বাদ্য ও মুদ্রা সহযোগে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রণাম করতে হয়। আপাত দৃষ্টিতে শিবের পূজা হলেও পূজিত দেবতাদের বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্য এবং পূজার ব্যাপারে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকের অবাধ অংশগ্রহণ লক্ষ্য করার বিষয়।'[২]

চড়ক পূজার বিভিন্ন নিষ্ঠুর আচার

চড়ক উৎসবের বর্ণনায় ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার উৎসবে বহু প্রকারের দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। চড়ক গাছে অর্থাৎ একটি উচ্চ খুঁটিতে ভক্ত বা সন্ন্যাসীকে লোহার হুক দিয়া চাকার সহিত বান্ধিয়া ঐ চাকা দ্রুত বেগে ঘোরান হইত। এইরূপ ভক্তের সংখ্যা কখনও কখনও শতাধিক হইত। তাহাদের পিঠে, হাতে, পায়ে, জিহ্বায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বাণফোঁড়া অর্থাৎ লোহার শলাকা বিদ্ধ করা হইত। জ্বলন্ত লোহার শলাকা তাহাদের গায়ের মধ্যে ফুঁড়িয়া দেওয়া হইত।...চড়ক গাছে পিঠে বাণফুঁড়িয়া ভক্তরা দে-পাক দে-পাক করিয়া পাক খাইতেন।...এই নিষ্ঠুর প্রথা কেবল বাংলা ও উড়িষ্যায় সীমাবদ্ধ ছিল।...ইংরেজ আমলে আইনের দ্বারা এই রীতি নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় হওয়ার পর হইতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাত্র একটি বড়শি সন্ন্যাসীর গায়ে ছোঁয়াইয়া তাহাকে শূন্যে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর যথারীতি তাহাকে শূন্যে আবর্তিত করা হয়।"[৩]

চড়ক পূজায় নিম্নবর্ণের লোকেরাই অত্যধিক গুরুত্ব পায়

এই প্রসঙ্গে গবেষক পল্লব সেনগুপ্তও লিখেছেন। তিনি লিখছেন, "বাংলা পঞ্জিকার মতে বছরের শেষ দিনে অর্থাৎ মহাবিষুব বা চৈত্র সংক্রান্তিতে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে যে-সব অনুষ্ঠান হয় নানান জায়গায় তা নানা নামে পরিচিত। উত্তর বঙ্গে এর নাম গম্ভীরা, রাঢ় বাঙলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এর পরিচয় গাজন বলে। পূর্ব বঙ্গের বহু জায়গাতেই একে বলে চড়ক। এ ছাড়া নীল, সাহীযাত্রা প্রভৃতি নামেও আঞ্চলিকভাবে এ উৎসব উল্লেখিত হয়।...তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় বা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরাই এই সব উপলক্ষে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়ে থাকেন, যা আমাদের বর্ণাশ্রমশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় অকল্পিত! ধরুন কাঁটাঝাঁপ, বঁটিঝাঁপ, বাণফোঁড়া, চড়কের গাছে চড়ে ঘূর্ণিপাকে ঘোরা ইত্যাদি প্রথা পালন

করতে সচরাচর তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়দেরকে দেখা যায় না প্রায় কোন অঞ্চলেই।...শাল বা গজারি বা গর্জন গাছের একটি খুঁটি সারা বছর ধরে একটা কোন পুকুরে ডোবানো থাকে। সংক্রান্তির আগের দিন ভক্তরা মিলে তাকে তুলে তেল মাখিয়ে মাটিতে শক্ত করে পোঁতেন। এর নাম গাছ জাগানো ...চড়কের গাছ পুঁতে তার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ভক্ত্যার দল যে ঐ দিন শূন্যে বৃত্তাকারে ঘোরেন— পণ্ডিতেরা অনেকেই সেটাকে বর্ষান্তের অবসরে সৌরচক্র সমাপ্তির প্রতীক বলে গণ্য করেছেন। সেই ভাবে বিচার করলে ঐ পরবের মধ্যে একভাবে সূর্যপূজার ধারাও রয়েছে, এটা মানতেই হয়।...'চড়ক' শব্দটিও ঐ 'চক্র' শব্দের বর্ণ বিপর্যস্ত উচ্চারণে গড়ে উঠেছে সম্ভবত। তবে গাজন গাছে 'চড়া'র সূত্রে এই নামটি হতে পারে।...পূর্ব বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে যে গাজনের সং সেজে এসে নারদরূপী ভক্ত্যা শিব বা দুর্গারূপী ভক্ত্যাদের ঝোলায় প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ীর দোরের সামনের মাটি এক চিমটে করে তুলে দেয়, এও আদিম এক জাদু-বিশ্বাসের লব্ধফল— ঘরের দোরের মাটির কিয়দংশ যে হরপার্বতীর আওতায় রইল —এর ফলে আসন্ন নতুন বছরে সম্ভাব্য সব বিপদ আপদ থেকে ঐ বাড়িকে তারাই বাঁচাবেন সংস্কার হল এটাই।...এই চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবটির মধ্যে একটি সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় দিক আছে।...তথাকথিত হীনবর্ণজ পাটভক্ত্যাকেও সে দিন ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা প্রণাম করেন। সব বর্ণের ভক্ত্যা বা বালারাই একত্রে বসে অন্ন গ্রহণ করেন। তাই চড়ক-গাজন-গম্ভীরা-নীল এক অর্থে বাংলার দরিদ্রতম শ্রেণীর অবমানিত মানুষগুলির সামাজিক মহোৎসব— একদিক থেকে 'পিপলস-ফেস্টিভ্যাল' বলেও হয়ত একে আখ্যা দেওয়া যায়।"[৪]

চড়ক উৎসব ও নববর্ষ সম্পর্কে নীলিমা ইব্রাহিমের বিবরণ

চড়ক উৎসব ও পয়লা বৈশাখের নববর্ষের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ড. নীলিমা ইব্রাহিমের বিবরণ থেকেও অনেক তথ্য জানা যায়। তিনি বলেন, "আজকের মতো আমার শৈশবে পয়লা বৈশাখ নীরবে আসতো না। চৈত্র মাসের শেষের দিকে সারা দিন ঢাকের বাদ্যি শুনতাম। মা বলতেন চড়কের বাজনা। কলকাতায় একই বাজনা বাজলে দিদিমা বলতেন দোল পূজার বাজনা। এই দোল ঠাকুর ঢেঁকির মত লম্বা একখানা তক্তা। মাথায় নিয়ে আসত নন্দী-ভৃঙ্গী সঙ্গে জটাজুটধারী দেবাদিদেব মহাদেব। ঐ তক্তার গায়ে সিন্দুর লেপা এবং চুল ছড়ানো। বাড়ি বাড়ি নেচে গেয়ে চাল-পয়সা সংগ্রহ করে চলে যেত এরা। শুনতাম এরা শ্মশানে পুজো দেবে অর্থাৎ মহাদেবের সঙ্গে একটা ভূতপ্রেতপিশাচের সম্পর্ক ছিল। খুলনার রাস্তাতেও চড়কের সং বেরুত। মহাদেব জটাজুটধারী কিন্তু সঙ্গে অনুচরদের কারও গালে ছুরি, পিঠে বেত ফোঁড়া ভয়াবহ দৃশ্য। এরাও এসব দেখিয়ে পয়সা তুলতেন। কলকাতায় কিন্তু শিব ঠাকুরের গাজন রীতিমতো পৈশাচিক। নানা রকম কৌশল তারা দেখাতেন। বেতের টুকরো গালে এফোঁড়-ওফোঁড় করা। পিঠে ছুড়ি বিঁধানো, রক্ত ঝরছে। বড় হয়ে বাংলা সাহিত্যে পড়েছি শিব অনার্য দেবতা। এখন সবটা মিলিয়ে নিতে পারি।

শ্বশুরবাড়ি এলাম গেন্ডারিয়ায়, সেখানেও চৈত্র মাসে ঢাকের বাড়ি। দাদী শাশুড়িকে জিজ্ঞাসা করলাম— মা, কিসের বাজনা? সস্নেহে হেসে বললেন— অমা? চিলপূজার বাজনা, ক্যান তোমাগো দ্যাশে চিলপূজা নাই? আমার আজন্ম লালিত হিন্দু সংস্কৃতির ঝুঁলি ঝেড়ে দেবতা হিসেবে হনুমান, বানর এমনকি কাঠবিড়ালীও পেয়েছি, কিন্তু পদ্মাপার হয়ে তিনি 'চিল' হয়েছেন জানতাম না। যাক, এখানেও হরগৌরীর নাচ আছে কিন্তু বীভৎসতা নেই। বুঝলাম লৌকিক সংস্কৃতি জাত ধর্মের বেড়ায় টেকে না। এর পরই হতো পয়লা বৈশাখের নববর্ষ বা বৈশাখী মেলা। এ দিনটিতে প্রতিটি পরিবারই অল্পবিস্তর উৎসবমুখর হতো। ঠাকুমা কাকভোরে গঙ্গাস্নানে যেতেন অর্থাৎ খুলনার ভৈরব নদীতে অবগাহন করে পুণ্য পবিত্র হতেন। মা-কাকীমারাও স্নান সেরে নিতেন, এমনকি চাকর-বাকরেরাও, কারণ দিনটি পবিত্র। ...সামনে কাঁসার রেকাবীতে খই, মুড়কি, নাড়ু, বাতাসা, সামান্য দই, দুচার টুকরো ফল। এ সবই নববর্ষের প্রসাদ। দুপুরেও বড় বড় মাছ থাকত। আত্মীয়স্বজনও নিমন্ত্রিত হতেন। কিন্তু সবচেয়ে উত্তেজনাকর পর্ব ছিল 'আড়ং খরচা'। আমাদের অঞ্চলে মেলাকে বলে আড়ং।...বড়রা মেলায় খরচ করবার জন্য ছোটদের পয়সা দিতেন।...ঐ দিন সকালে অবশ্য বড়দের প্রণাম করার একটা রীতি ছিল এবং সেটা খুব ভক্তি করেই করতাম। কারণ ওই সময়েই আড়ং খরচাটা পাওয়া যেত।...এসব উৎসব ও জলসায় হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান দেখিনি। পহেলা বৈশাখ কেন দোলে নানা রকম রঙ এবং তাতে পারফিউম মিশিয়ে আমাদের প্রলুব্ধ করতেন 'কুটেদা' অর্থাৎ পরবর্তীকালের মুসলিম লীগ লীডার খান সবুর। বাবা ছিলেন তার প্রিয় কাকাবাবু। আর সব অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকতেন আব্দুল হাকিম সায়েব যিনি পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের স্পীকার ছিলেন।"[৫]

চিল পূজা

ঢাকার গেন্ডারিয়ার 'চিল পূজা'র 'চিল' খুব সম্ভব আরাকানরাজ সোলেমান শাহ ওরফে সিলমান শাহ ওরফে চিলমান গাজী ওরফে চিল। কেননা আমরা জানি আরাকানের রাষ্ট্রীয় ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্যই হল এই যে তারা তাদের রাজাদেরকে একজন দেবতা সাধারণত শিবের সঙ্গে একাত্ম করে শৈব পদ্ধতিতে তার পূজা করে। "A special feature of the State Religion of the South East Asian Kingdoms was the deification of the king, who was identified with a god, usually with Siva, in its saivite form. This worship was directed to the royal linga or phallic emblem, in which the spiritual potency of the divine king was believed to be concentrated."[৬]

তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে চক্র (চড়ক) পূজা

আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে তান্ত্রিক ধর্মানুসারী তথা তান্ত্রিক বৌদ্ধরা বিভিন্ন প্রতীকের পূজা করে। এই সব প্রতীকের অন্যতম হল চক্র। চক্রকে তারা প্রধানত তিনটি

পদ্ধতিতে পূজা করে। সবচাইতে জনপ্রিয় পদ্ধতি হল স্তম্ভ শীর্ষে চক্র স্থাপন করে তার পূজা করা। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল চক্র সরাসরি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে তার পূজা করা। তৃতীয় পদ্ধতিটি হল সিংহাসনের ওপর সম্পূর্ণ খাড়াভাবে দণ্ডায়মান স্তম্ভের শীর্ষদেশে চক্র স্থাপন করে তার পূজা করা। "Two broad features are observable in Buddha worship, worship of the Buddha image and worship of symbols. The image appears in many forms and is worshipped in many ways. Among the symbols that stand for the Buddha the Padas, the Stupa, the Bodhi tree, the Triratna, the Chakra, the Chaitya and relics figure prominently. ...Another object of worship was the Dharma Chakra which symbolises the dharma preached by the Buddha. The Preaching is actually described as dharma chakra pravartana or the turning of the wheel of dharma. The dharmachakra was worshipped in various ways. The most popular form is the Chakra mounted on a pillar. Another is the Chakra surmounting a throne. In one example from Amaravati, there is a throne in the centre with the chakra above and with worshippers on either side. Another example is found on an upright. This sculpture is in three compartments.In the centre there is a throne surmounted by a pillar with chakra."[৭]

তিব্বতীদের একটি জনপ্রিয় উৎসব চোড়গ

বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠে আমরা অবগত হই যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মানুসারী তিব্বতীদের একটি প্রাচীন জনপ্রিয় উৎসব হল চক্র পূজা। এই উৎসবে শুধু পূজাই হয় না, নানা প্রকার সং সেজে নাচও হয়। এই উৎসবের তিব্বতী নাম চোড়গ।[৮]

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশে চড়ক পূজার প্রচলন ছিল না

তবে বঙ্গদেশে চড়ক পূজা ও চড়ক উৎসবের ইতিহাস আলোচনা করলে পরিষ্কার দেখা যায় যে খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশে চড়ক পূজা ও চড়ক উৎসবের প্রচলন ছিল না অন্তত উচ্চতর হিন্দু সমাজে তো নয়ই। এই বিষয়ে ভারতকোষ গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে— "লিঙ্গপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চৈত্র মাসে শিবারাধনার প্রসঙ্গে নৃত্য গীতাদি উৎসবের উল্লেখ থাকলেও পূজা ও উৎসবের বিবরণ নাই। চড়কাদি নামের উল্লেখও ইহাদের মধ্যে নাই। বর্ষের বিভিন্ন সময়ে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে অনুষ্ঠিত ছোট বড় নানা ধর্মোৎসবের বিবরণে পূর্ণ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী' ও রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্বে' এই উৎসবের ইঙ্গিতমাত্র নাই।"[৯]

খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রাজনগরে হত বঙ্গদেশের বৃহত্তম চড়ক পূজা ও চড়ক উৎসব

অথচ আমরা প্রামাণিক ইতিহাস সূত্রে জানতে পারি খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ জনপদ রাজনগর তথা বিলদাওনিয়ায় অনুষ্ঠিত হত বঙ্গদেশের বৃহত্তম চড়ক পূজা ও চড়ক উৎসব। এই সময়ে বিলদাওনিয়ায় কমপক্ষে তিনটি চক্র 'ঠাকুর' হিসেবে পূজিত হত— একটি রাজপ্রাসাদের বিখ্যাত শতরত্ন মঠের সর্বোচ্চ তলে স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে, একটি সাতহাবেলী নামে পরিচিত রাজপ্রাসাদের পঞ্চরত্ন নামক পঞ্চায়তন মন্দিরের কেন্দ্রীয় কক্ষে স্থাপিত থেকে এবং তৃতীয়টি বিলদাওনিয়ার বিখ্যাত 'পুরাতন' দীঘির পশ্চিম পাড়ে এক প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষের শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে।

রাজনগর রাজপ্রাসাদ ও চড়ক উৎসব সম্পর্কে হিমাংশু বাবুর বিবরণ

বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ জনপদ রাজনগর তথা বিলদাওনিয়ার চড়ক উৎসবের বিবরণ দিতে গিয়ে বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক শ্রীহিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "রাজনগর সে সময়ে সত্য সত্যই রাজনগর ছিল। তখন উহা নবরত্ন, পঞ্চরত্ন, সপ্তদশরত্ন বা শতরত্ন ও একবিংশরত্ন প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর সৌধাবলীর দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যে ও স্থপতিকৌশলের শ্রেষ্ঠতার জন্য বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রমপুর কেন সমগ্র বঙ্গভূমির মধ্যেই ইহার কীর্তিগরিমা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন এই স্থান ধনে, জনে, মানে, সম্ভ্রমে, বিদ্যায় ও শিক্ষায় দেশের আদর্শ স্বরূপ বিবেচিত হইত। এ স্থানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার, গোপ, মালাকার, কাংস্যবণিক, গন্ধবণিক, তন্তুবায় প্রভৃতি বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের যত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস ছিল তদ্রূপ বর্তমান সময়েও বিক্রমপুরের কোনও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে এত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস পরিলক্ষিত হয় না। সে কালের রাজনগরবাসীগণের কেবল যে আমোদ প্রমোদ ও ব্যায়ামের প্রতি লক্ষ্য ছিল তাহা নহে, শিক্ষার প্রতিও তাহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা প্রচারিত হয় সে বিষয়ে তাহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ছোট বড় সকলেই যাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানলাভ করিতে পারে এ বিষয়ে তাহারা বিশেষ মনোযোগ করিতেন। রাজনগরের প্রতি পল্লীতেই বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য পাঠশালা, পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য মক্তব ও সংস্কৃত শিক্ষার্থ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিভাবকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিতেন। তবে পারশী ও সংস্কৃতের আদরই বেশী ছিল, বালকেরা সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া সকলেই মৌলভীর নিকট পারসী ভাষা শিক্ষালাভার্থ দুই বেলা পুঁথি হস্তে অধ্যয়ন করিতে যাইত।...সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে... রাজনগরের বক্ষ ভেদ করিয়া যে খালটি পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল, সেই খাল ধরিয়া পূর্ব দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই রাজসাগর নামক একটা হ্রদের ন্যায় প্রকাণ্ড সরোবর দৃষ্টিপথে পতিত হইত। সরোবর ২২০ বিঘা ১৬ কাঠা

জমি লইয়া বিস্তৃত ছিল। ইহার চারি তীরেই ইষ্টক নির্মিত সোপানাবলী থাকায় জনপদবধূগণের জল লইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাও ছিল। রাজসাগরের উত্তর তটে রাজসাগরের হাট নামক রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ বন্দর অবস্থিত থাকায় এস্থান সর্বদাই জন কোলাহল মুখরিত থাকিত। সে কালের সভ্যতা ও রুচি অনুযায়ী এই হাটে সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। বন্দরের মধ্য দিয়া বহু সংখ্যক রাস্তা পূর্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বন্দরের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজসাগরের পশ্চিম তটে স্থপতি কৌশলের নিদর্শনস্বরূপ নানা কারুকার্য্য খচিত একটি কাছারী বাড়ী ও ইষ্টক নির্মিত এবং বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত দুইটি সুবৃহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটিতে মহাপ্রভু নামক দেবতা ও অপরটিতে জগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজসাগরের পূর্ব ও দক্ষিণ তটে বহু সংখ্যক নানা জাতীয় ব্যবসায়ী পরমানন্দে বাস করিত। রাজনগরের খালের উত্তর তট দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিম অভিমুখে এক বর্ত্ম বিদ্যমান ছিল। জনপদের পূর্ব প্রান্ত হইতে সেই পথ অবলম্বনে প্রায় এক মাইল পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এক রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তে সমুপস্থিত হওয়া যাইত। এই শেষোক্ত রাস্তার পরিসর ৬৫ হাতের ন্যূন ছিল না। উত্তর দক্ষিণ বাহী রাস্তা ধরিয়া উত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিলে 'পুরাতন দীঘি' নামক সরোবরের পশ্চিম তটের সমীপবর্তী হওয়া যাইত। রাজসাগর অপেক্ষা এই সরোবরের আয়তন কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিল। এই দীঘির পশ্চিম তটে চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত দুই মাস কাল স্থায়ী একটি মেলা বসিত। এই মেলা 'কাল বৈশাখীর মেলা' বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ঢাকা জেলাস্থ উত্তর বিক্রমপুরের (মুন্সীগঞ্জ) 'কার্ত্তিক বারুনীর মেলা' অপেক্ষা ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। প্রতি বিষুব সংক্রান্তিতে 'পুরাতন দীঘির' পশ্চিম তটে অতি সমারোহের সহিত চড়ক পূজার অনুষ্ঠান হইত। তৎকালে এক বিশাল চড়ক বৃক্ষ প্রোথিত করিয়া তাহার শীর্ষদেশে এক নহবৎখানা নির্মাণ করা হইত। ষোড়শ সংখ্যক পুরুষ এক যোগে ঐ চড়ক বৃক্ষে ঘূর্ণিত হইত এবং বাদকগণ নহবৎখানায় উপবেশন পূর্বক নানাবিধ তাল লয় মান সহকারে বাদ্যোদ্যম করিয়া ঘূর্ণমান লোকদিগকে প্রোৎসাহিত করিত।...চড়ক পূজার সময় শতাধিক পটহ (ঢাক) একত্রে নিনাদিত হইয়া প্রলয়কালীন বাত্যা নির্ঘোষের ন্যায় গুরুগম্ভীর শব্দ উৎপাদন করিত। প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে অবগত হওয়া যায় যে এই স্থানে চড়ক পূজায় যেরূপ সমারোহ হইত পূর্ববঙ্গের আর কোথাও সেরূপ হইত না।...'পুরাতন দীঘির' পশ্চিম তটের মধ্য হইতে এক রাস্তা পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। এই রাস্তার পরিসর ৬৫ হাতের ন্যূন ছিল না।...রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে এই রাস্তা ভিন্ন দ্বিতীয় রাস্তা ছিল না। রাজবাটীর চতুর্দিকে যে চৌগাড়া ছিল তাহার পরিসর পদ্মার কোন কোন শাখা নদী অপেক্ষা বড় ন্যূন হইবে না।

রাজবাটীর পূর্ব দিকে 'একবিংশতিরত্ন' নামক এক বিশাল তোরণদ্বার সংস্থাপিত ছিল। এই তোরণদ্বার একটি ত্রিতল অট্টালিকা। নিম্নতর তলের ছাদের মধ্যভাগে উর্দ্ধতর

তল গঠিত হইয়াছিল। প্রথম তলের মধ্যভাগে সিংহদ্বার ; তাহার পরিসর এত বিস্তৃত ছিল যে তিনটি হাতী হাওদাসহ পাশাপাশি হইয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিত। দ্বারের উপরিভাগ অর্দ্ধবৃত্তাকারে গঠিত ছিল।...এক তলের ছাদের প্রত্যেক কোণে এক একটি সমআয়তন মঠ ও সম্মুখস্ত দুইটি মঠের মধ্যভাগে সিংহদ্বারের সমসূত্রে তিনটি ঝিকটি ঘর সংস্থাপিত ছিল। মধ্যস্থিত ঝিকটি ঘরটি অপর দুইটি ঝিকটি ঘর অপেক্ষা বৃহদায়তন ছিল। প্রত্যহ ঐ তিনটি ঝিকটি ঘরে নহবৎ বাজিত। দ্বিতলের ছাদের প্রত্যেক কোণে এক একটি সমআয়তন মঠ ও ত্রিতলের ছাদের মধ্যদেশে একাদশটি মঠ দণ্ডায়মান ছিল। ত্রিতলের ছাদের এই একাদশটি মঠের মধ্যস্থ মঠটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চভাবে এবং তাহার পার্শ্বের প্রত্যেক পরবর্তী মঠ পূর্ববর্তী মঠ অপেক্ষা ক্রমশঃ নিম্নভাবে গঠন করা হইয়াছিল। এই সমস্ত মঠের শিরোভাগ এরূপভাবে বিন্যস্ত ছিল যে, দূর হইতে অবলোকন করিলে উহাদের সমষ্ঠি একখানা সুবৃহৎ ধনুর ন্যায় দেখাইত।...

এই প্রথম তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইলেই দ্বিতীয় তোরণদ্বার। ইহা পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় তোরণদ্বার পার হইলেই সম্মুখস্ত বিস্তৃত প্রাঙ্গনের দক্ষিণভাগে 'রঙ্গমহাল' নামক সুসজ্জিত ও কলানৈপুণ্যপূর্ণ বৈঠকখানার দালান...। ইহার সম্মুখেই সুন্দর একটি মন্দিরে 'বাসুদেব' নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল।...এই মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটি সিংহদ্বার স্থাপিত ছিল। সেই সিংহদ্বার পার হইলেই সুপ্রসিদ্ধ 'সপ্তদশরত্ন' বা 'শতরত্ন' নামক দোলমঞ্চ তৃতীয় প্রাঙ্গণের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হইত।

একটি উচ্চ চারিতল অট্টালিকা এরূপভাবে নির্মিত ছিল যে প্রত্যেক উর্দ্ধতল তাহার নিম্নতলের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এবং প্রতি তলের কোণে কোণে এক একটি সমআয়তন চতুষ্কোণ মঠ বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বোচ্চ তলে অর্থাৎ চতুর্থ তলের ছাদের মধ্যদেশে মঠের আকারে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা চতুর্দিকস্থ অন্যান্য মঠ অপেক্ষা উচ্চ ছিল। মৃদঙ্গের তালে তালে হোরীর সুমধুর সঙ্গীত লহরীর সহিত দোলপূর্ণিমার শুভ জ্যোৎস্না পুলকিত নিশীথে ঐ সর্ব্বোচ্চ তলস্থ মন্দিরের মধ্যে...'লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র' (যাহা 'ঠাকুর' বলিয়া পূজিত হইতেন) কুঙ্কুম রাগে সুরঞ্জিত হইয়া স্বর্ণসিংহাসনে দোলায়মান হইতেন। দোলপূর্ণিমার উৎসবে ঠাকুরকে এত অধিক পরিমাণে আবীর দেওয়া হইত যে তাহাতে সমুদয় গ্রাম আচ্ছাদিত ও রক্তবর্ণ হইয়া যাইত।...এই উচ্চ মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ মঠ প্রায় ১৫০ হাত উচ্চ ছিল। ...এই প্রাঙ্গনেই 'পঞ্চরত্ন' নামক সুন্দর শিল্পচাতুর্য্যময় দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনগরের মধ্যে শিল্পচাতুর্য্যে ও স্থপতিনৈপুণ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। পাঁচটি দ্বিতল মন্দির একত্র সংযুক্তভাবে নির্মিত হওয়ায় ইহাকে পঞ্চরত্ন মন্দির কহিত। এই সকল মন্দিরের একটি মধ্যস্থলে এবং অবশিষ্ট চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির উহার প্রত্যেকের কোণদেশের সহিত সংলগ্নভাবে গঠিত হইয়াছিল। এই পাঁচটি মন্দিরের প্রত্যেকটির প্রাচীর গাত্রেই নানাবিধ দেবদেবীর ও লতাপাতার চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত ছিল। এই মন্দিরের এক কক্ষে সুবিখ্যাত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র, এক কক্ষে রাজরাজেশ্বরী, এক কক্ষে অন্যান্য দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।"[১০]

কে চড়ক উৎসবকে সর্বশ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন

এখন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন এসে যায়, খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কে বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ জনপদ হিসেবে রাজনগর তথা বিলদাওনিয়া জনপদটিকে গড়ে তুললেন এবং এই জনপদে সাতহাবেলী নামে প্রসিদ্ধ একটি জমকালো রাজপ্রাসাদও নির্মাণ করলেন? কে এই জনপদে এত সব বৌদ্ধ প্রতীকের পূজার প্রচলন করলেন? কে সমগ্র বঙ্গদেশে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে চড়ক (চক্র) পূজাকে জনপ্রিয় করে তুললেন? তবে এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের অনুরাগী কোন প্রতাপশালী রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া চড়ক পূজা ও চড়ক উৎসবের মত কোন পূজা ও উৎসব যেমন বাংলার উচ্চতর হিন্দু সমাজে প্রচলিত হতে পারে না ঠিক তেমনি এত অল্প সময়ের মধ্যে এত ব্যাপক জনপ্রিয়তাও লাভ করতে পারে না। তাহলে কে এই বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মানুরাগী প্রতাপশালী রাজা, যিনি এই বৌদ্ধ তান্ত্রিক পূজা ও উৎসব ব্যাপক আকারে প্রচলন করলেন খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে? নন কি তিনি মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল? কেননা এই সময়ে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের পরম অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক শরণার্থী আরাকানরাজ মঙ্গৎ রায়ইতো (ওরফে মহারাজা বল্লাল) তার শতসহস্র ব্রহ্ম-তিব্বতীয় তথা ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জনগোষ্ঠীর আরাকানী ও তৈলঙ্গ অনুচর নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন ঢাকায় মোগল বাংলায় এবং মোগল সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকে মনসব ও জায়গির লাভ করে হয়েছিলেন মোগলের করদ রাজা। তবে বিস্ময়ের বিষয় এই যে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে হুবহু আরাকানী রাজধানী নগরী ও রাজপ্রাসাদের স্থাপত্যশৈলী ও আদর্শে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও রাজনগর নগরী ও এর বিশাল রাজপ্রাসাদটিকে প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজবল্লভ সেনের (১৭০৭-১৭৬৪ খ্রিঃ) কীর্তি বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক পর্যন্ত রাজনগরের কীর্তিসমূহকে স্বীয় পূর্বপুরুষ রাজবল্লভের কীর্তি বলে চালিয়ে দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নি।[১০ক] এই ধরনের মানসিকতার কারণ কী? নিশ্চয়ই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্ন জাতির প্রাধান্য অস্বীকার করা। হিন্দু জনগণের এই ধরনের মানসিকতা প্রসঙ্গে স্বর্গত আশুতোষ গুপ্ত যথার্থই লিখেছেন— "পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া হিন্দু জনগণ তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেও যেন দ্বিধাবোধ করিতেন, তাহারই ফলে ব্রাহ্মণদের প্রতি কৃপাবান হইয়া বৌদ্ধ নৃপতিদের কীর্তিও সেন রাজাদের উপর অর্পিত হইয়াছে।"[১০খ]

চড়ক উৎসব ও সূর্যোৎসব অভিন্ন

আবার প্রশ্ন জাগে, চড়ক উৎসব কি সূর্যোৎসবও? এই উৎসব বছরের শেষ দিন বিষুব সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় কেন? এই বিষয়ে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য লিখেন, "চড়ক

অনুষ্ঠানটি আদিম সূর্য পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে দিনটিতে এই চড়ক অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্তির দিনটি, তাহা কোন পুরাণ কিংবা স্মৃতি-অনুমোদিত শিবপূজার দিন নহে; একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা সূর্যপূজারই একটি বিশিষ্ট দিন হইতে পারে; কারণ সূর্যই ঐ দিন দ্বাদশ রাত্রির পথে ভ্রমণ শেষ করিয়া পুনরায় সেই পথে নূতন যাত্রা শুরু করে। মানভূম জিলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও চড়ককে বিষুবপরব অর্থাৎ বিষুবপর্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চলে চড়ক পূজা প্রচলিত আছে, সেখানেও শিবের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

চড়ক গাছ ও চড়কের চক্র স্পষ্টতই সূর্যের আবর্তন ও চক্রাকারে ভ্রমণ বুঝায়। ইউরোপের কোন কোন জাতি— যেমন শ্ল্যাভ, লিথুনীয়, লেট প্রভৃতির মধ্যে সূর্যপূজারূপের চড়কের অনুরূপ অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। এই জন্য চড়ককে যথার্থই মনে করা হইয়াছে, 'Imitation of swinging of the Sun at the beginning of spring or at the solstices, a piece of magic to help the Sun move.' পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য শিবমন্দিরেই এখনও চড়কের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বর্তমানে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বশতঃ কোন কোন স্থলে ধর্মমন্দির শিবমন্দির বলিয়া পরিচিত হইলেও উক্ত চড়কের সংশ্রব হইতেই তাহা যে পূর্বে সূর্যদেবতা বা ধর্মঠাকুরেরই মন্দির ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরিকল্পিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার মধ্যেও ইহার একটি স্বতন্ত্র রূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে পরিভ্রমণ বিভিন্ন রাশিচক্রের ভিতর দিয়া সূর্যের আবর্তনই বুঝায়। মনে হয়, চড়ক ও রাসলীলা একই অনার্য ভিত্তি হইতে উদ্ভূত। ...আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে চড়ক গাছে যে ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীগণ মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া বঁড়শী বিঁধাইয়া চক্রাকারে শূন্যে আবর্তন করিত, তাহা এই উপলক্ষ্যে নরবলি দিবার প্রথার একটি নিদর্শন বলিয়া মনে হইতে পারে। সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই ভাবে নরবলি দিবার প্রথা দেশের আদিম সমাজে এককালে প্রচলিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।...নরবলি পাইলেই দেবতা সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হন বলিয়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক আদিম জাতির অধিবাসীই বিশ্বাস করিত। কৃষিজীবী সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও উপকারী দেবতা সূর্য। সেই জন্য প্রায় প্রত্যেক আদিম সমাজেই সূর্যোপাসনা প্রচলিত আছে এবং সমাজের এই প্রিয়তম দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলি বা নরবলি দিয়া প্রসন্ন করিবারও রীতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রচলিত ছিল বলিয়াও জানিতে পারা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বাংলার লৌকিক সূর্যোৎসব চড়ক উপলক্ষে মানসিক করিয়া পিঠে বঁড়শী বিঁধাইয়া শূন্যচক্রে আবর্তিত হইবার যে রীতি প্রচলিত ছিল, তাহা সূর্যের উদ্দেশ্যে নরবলি দিবারই একটি নিদর্শন বলিয়া সকলে মনে করিয়া থাকেন।"[১১] আমরা দেখতে পাই বার্ষিক চীনা নিরামিষভোজী উৎসবে অংশগ্রহণকারী ভক্তদের মধ্যেও এই ধরনের আত্মপীড়নের রীতি প্রচলিত আছে। এই আত্মপীড়ন দেহ ও আত্মার শুদ্ধিলাভের পরীক্ষা বলে চীনারা বিশ্বাস করে থাকে।[১২]

সূর্য কৃষির সহায়ক দেবতা

আদিম কৃষিজীবী সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানব যথার্থই মনে করত যে, সূর্যই বৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। সে জন্য যখনই অনাবৃষ্টি দেখা দিত, তখনই সমাজে সূর্যদেবতাকে পূজা করে কিংবা ঐন্দ্রজালিক উপায়ে তুষ্ট করে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়াস দেখা যেত।১৩

জপসার নামক জনপদে সূর্য পূজা

এই প্রসঙ্গে আমরা খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের বিক্রমপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপদ জপসার ছয়হাবেলী নামে প্রসিদ্ধ রাজপুরী ও রাজপুরীর সন্নিকটস্থ শিব (তথা সূর্য) মন্দিরের শিব (তথা সূর্য) পূজার কথা উল্লেখ করতে পারি। জপসার শিবপূজা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক শ্রীহিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ সৌধাবলীর ন্যায় জপসার মন্দির অট্টালিকাও এক সময়ে পূর্ব বাঙ্গালার অন্যতম গৌরবের বস্তু ছিল।...বহু কাল অতীত হইল ঢাকা জেলার জনৈক রাজপুরুষ দক্ষিণ বিক্রমপুরান্তর্গত জপসা গ্রামের একটি প্রাচীন বাড়ী লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই কেল্লা কাহার? ...জপসার এই বাড়ীর গঠনপ্রণালী দৃষ্টে উহা কাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল এই বিষয় অবগত হইবার জন্যই এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই রাজপুরুষের নাম ছিল মিঃ জন পিটার্সন। তিনি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন (১৮২১ খ্রিঃ)। প্রশ্নোত্তরে তিনি অবগত হইতে পারিলেন যে, উহা কেল্লা নহে, গ্রামের জমিদার বাড়ী। বহু দূর হইতে যত নিকটবর্তী হইতেছিলেন ততই তাহার পূর্ব বিশ্বাস অপনোদন হইতেছিল, কারণ রাস্তা অবলম্বন করিয়া বাড়ীর দক্ষিণ পরিখার সীমায় উত্তীর্ণ হইতে প্রথমে তাহার এক বৃহৎ দেবালয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বড় রাস্তা হইতে পরিখা ভেদ করিয়া জমিদার বাড়ীর সহিত যে রাস্তাটি সম্মিলিত হইয়াছে, ঠিক তাহার পশ্চিম পার্শ্বে ও পরিখার উত্তর পাড়ে এই বাটী সংস্থাপিত ছিল। বাড়ীতে এক বৃহৎ মন্দির; তন্মধ্যে চতুর্ভুজা কালী দেবী, শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত গৌরীশঙ্কর, দ্বাদশরুদ্র, বৃষভ এবং যুক্তদ্বিভুজ, উর্দ্ধনেত্র, পদ্মাসনে আসীন এক সৌম্য মূর্তি সংস্থাপিত ছিল। (এই প্রতিমূর্তিগুলি এখনও বিদ্যমান আছে, উহা ঠিক ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি— হিন্দু দেবালয়ে গুরুভাবে পূজিত হইতেছেন।)১৪ এই বাড়ীর পশ্চিমের ভদ্রাসনে ইষ্টকগ্রথিত উচ্চ বেদীমূলে কষ্টিপ্রস্তর নির্মিত বৃহৎ এক শিবলিঙ্গ, এবং তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট ও প্রস্তর-নির্মিত এক বৃহৎ বৃষভ। বাড়ীর অপর পার্শ্বে আর একখানি ক্ষুদ্র ইষ্টকালয় ছিল; উহা দেবীর ভোগরন্ধন জন্য ব্যবহৃত হইত। এই বাড়ীর মধ্য আঙ্গিনায় একটি ইষ্টকগ্রথিত চৌবাচ্চা হইতে চারিটি তাম্রনির্মিত নল শিবের মস্তকের দিকে নীত হইয়াছিল। তদ্বারা যখন ইচ্ছা শিবের স্নানকার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারিত ; কারণ শিব এতই উচ্চ যে একজন দীর্ঘকায় মনুষ্য হস্ত উত্তোলন করিলেও তাহার শির স্পর্শ করিতে পারিত না। প্রস্তর নির্মিত চারিটি হংস ঐ চৌবাচ্চায় ভাসিয়া থাকিত।"১৫

শিব তথা সূর্যের মাথায় জল ঢালা

শিব তথা সূর্যের মাথায় জলঢালা প্রসঙ্গে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য লিখছেন, "অনাবৃষ্টির কালে সূর্যদেবতার প্রতীককে জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বৃষ্টিপাত করাইবার চেষ্টা অনেক দেশেই প্রচলিত আছে। এই দেশে শিবের মাথায় জল ঢালিবার যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা সূর্যদেবতার মাথায় জল ঢালিবার রীতিরই একটি প্রসারিত রূপমাত্র। এ দেশে বহু সূর্যশীলা সয়ম্ভু শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ববর্তী রীতি তাহাতে অনুসৃত হইয়া তাহাদের মাথায়ও বর্তমানে জল ঢালিবার রীতি পালন করা হইতেছে। ইহা Sympathetic magic —এর নিদর্শন।"[১৬]

আদিম কৃষিজীবী সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানব আরও মনে করত যে বর্ষশেষে সূর্য তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে নির্জীব হয়ে যায়। এ সময়ে তাকে গতি দানের ব্যবস্থা করলে সে স্বাভাবিক জীবন তথা নবজীবন ফিরে পায়। তাই চক্রঘোরানো ও তার উদ্দেশ্যে বলিদান ঐন্দ্রজালিক উপায়ে এই নবজীবনদান তথা গতিদানেরই চেষ্টা।[১৭]

আরাকান রাজারা সূর্যোপাসক

আমরা দেখেছি, বুদ্ধ শিব, সূর্য, বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন।[১৮] আবার আমরা এটাও দেখেছি যে আরাকান রাজারা বুদ্ধাবতার। তারা আদিশূর বা সূর্যদেবতারও বংশধর, সূর্য বংশী। তারা পূর্বপুরুষের উপাসক তথা সূর্যোপাসক। তাই তাদের সূর্যোপাসনা ও সূর্যোৎসব হয় রাজকীয় কায়দায় রাষ্ট্রীয়ভাবে। উদ্যোক্তা হন সদর রাজধানীতে রাজা স্বয়ং। গ্রামে হন গ্রামের মোড়ল। বিষুব সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের নাম সাইংগ্রাইং। সাইংগ্রাইং তিন দিন স্থায়ী হয়। এই উৎসবই আরাকানীদের বার্ষিক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সার্বজনীন আনন্দ-উৎসব। এই উৎসবেই তারা সবচেয়ে সুন্দর বর্ণাঢ্য পোশাক পরে নাচে-গানে হৈ-হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। বাড়ীতে বাড়ীতে মিষ্টি ও ভাল খাবার-দাবারের ব্যবস্থা হয়। সৌহার্দ্যপূর্ণ আতিথেয়তা হয়।[১৯] সূর্যদেবতা মহাগিরির উদ্দেশে শ্বেত পশু-পাখী বলি হয়। এদের মাংসে ভোজ হয়। এই বার্ষিক ভোজ ও রাষ্ট্রীয় উপাসনায় রাজা ও তার সভাসদবৃন্দ অংশ নেন। ফলে উৎসব হয় মহা আড়ম্বরপূর্ণ।[২০]

বুদ্ধ একবার হলধর হয়ে জন্মান

আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি যে আরাকান একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। ধান উৎপাদনে আরাকান বরাবরই একটি উদ্বৃত্ত এলাকা বলে পরিচিত। এ জন্য আরাকানকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধানের গোলা বা শস্যভাণ্ডার বলে অভিহিত করা হয়। আমরা এটাও দেখেছি যে মগ রাজারা রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠান তদারকের জন্য একদল ব্রাহ্মণ পোষণ করেন। তাদের এই রাজকীয় হলকর্ষণ অনুষ্ঠান থেকে প্রতীয়মান হয় যে আরাকান রাজা

(যিনি একজন বুদ্ধাবতার তথা সূর্যাবতার) স্বয়ং মাঠে হাল ধরে ও বীজ বপন করে রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতেন। কেননা বৌদ্ধ জাতকের একটি কাহিনীতে আছে, বুদ্ধ একবার হলধর হয়ে জন্মে ছিলেন। কাহিনীটি এই : 'বারানসী নগরে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বুদ্ধ একবার কৃষক হয়ে জন্মান। তার নাম হয় কুদ্দাল পণ্ডিত। কোদালের সাহায্যে মাটি চাষযোগ্য করে তাতে তিনি নানা রকম ফসল ফলান এবং তাতেই তার দিন গুজরান হয়।'[২১]

এমতাবস্থায় বৌদ্ধ ঐতিহ্যের অনুসারী এবং বুদ্ধাবতার আরাকান রাজাদের নিকট বুদ্ধের অনুসরণে অন্তত বছরে একবার স্বহস্তে কোদাল বা লাঙল ধরে ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন পুণ্য ও সৌভাগ্যেরই বিষয়। এতদ্ব্যতীত চৈনিক ঐতিহ্যেরও অনুসারী মগ রাজাদের এই রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠান আমাদেরকে চৈনিক রাজাদের রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

চৈনিক রাজাদের রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠান

চীনদেশীয় রাজাদের রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে এম. আর. আখতার মুকুল লিখেছেন, "আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে চীন সম্রাট চিন সিং স্বয়ং মাঠে ধান বপন করে সমস্ত দেশব্যাপী একটা বাৎসরিক উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। আজও পর্যন্ত চীন দেশে এই উৎসব মহা আড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হয়।"[২২] দেখি থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ রাজারা এখনও বার্ষিক হলকর্ষণ উৎসব পালন করেন। রাজা স্বয়ং লাঙলে হাত লাগান। পালি ভাষায় একে বলে 'বপ্প-মঙ্গল'।[২৩]

আমরা জানি, আমাদের দেশের তান্ত্রিক ধর্ম উত্তরদেশের চীনাচার দিয়েও প্রভাবিত। আমাদের তন্ত্রে চীনাচারের কথা, মহাচীনে শক্তিপূজার বিশেষ পদ্ধতির কথা আছে। যথা 'চীনতন্ত্রানুসারেণ পূজয়েৎ কালিকাং পরাম'।[২৪] তাই সঙ্গত কারণেই ধারণা করা যায় যে তান্ত্রিক চৈনিক ঐতিহ্যের ধারানুবাহী এই মগদের সূর্যপূজা ও সূর্যোৎসবও চৈনিক সূর্যপুরাণের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত।

চৈনিক সূর্যপুরাণের গল্প

চৈনিক সূর্যপুরাণে দুটি কাহিনী আছে। একটির নাম 'দশ সূর্যে ই-র বাণ নিক্ষেপ'। অপরটির নাম 'সূর্য কেন মোরগের ডাক শুনে উদিত হয়'।

ই-র কাহিনীর কালগত পটভূমি খ্রিষ্টপূর্ব ষড়বিংশ শতক, রাজা ইয়াওয়ের শাসনামল। তখন আকাশে সূর্য ছিল দশটি। তাদের তাপে ফসলের ক্ষেতে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়, গাছপালা বলতে কোথাও কিছু থাকে না। ফলে দেশজোড়া আকাল। সেই বিপদের ওপর আরেক বিপদ— বুনো শুয়োর, বিশাল বিশাল সাপ, নররূপী অশ্বাসুর আর নানা রকম দৈত্য-দানবের ভয়াবহ উপদ্রব। এইনা দেখে ধনুর্বিদ ই-র

মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। সে স্থির করে, সূর্যকে বাণে বিদ্ধ করে ভূপাতিত করবে। তারপর যেমন ভাবা তেমন কাজ। একে একে সে নয়টি সূর্যকে ভূপাতিত করে। কিন্তু গোল বাধে শেষটিকে নিয়ে। তীরের ভয়ে সে আর আকাশের ধারে কাছেও আসে না। এদিকে সূর্য ছাড়া পৃথিবী অচল। সুতরাং মহৎ কিছু ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়ে ই-কে নিরস্ত্র করেন। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর শেষ সূর্যটিকে আকাশে ফিরিয়ে আনেন। দ্বিতীয় কাহিনীটি এই রকম— পুরাকালে আকাশে একই সময়ে দেখা দিত নয়টি সূর্য। অতগুলো সূর্যের তাপ পৃথিবী সইতে পারে না বলে এক সময়ে এক বীর এক এক করে তাদের আটটিকে ভূপাতিত করলেন। নবম সূর্যটি অতি পবিত্র। তার কি আর অত সহজে তীর খেতে আসা সাজে? তাই সে পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দেয়। তখন পৃথিবীকে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর হাড়-কাঁপানো শীত থেকে বাঁচানোর জন্য নানা রকম গায়ক পাখী গান গেয়ে তাকে বাইরে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে যায়। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসে মোরগের দল। তাদের গলায় অকপট আন্তরিকতা আর সৌহার্দের ডাক। এবার সূর্যটি আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। পৃথিবীও আবার আলো ও উত্তাপে ভরে ওঠে।[২৫]

এক বছর আবর্তন শেষে বছরের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর সূর্য যাতে লুকিয়ে না যায় এবং আগামী বছর তার প্রত্যাবর্তন ও আবর্তনশীলতা যাতে অক্ষুন্ন থাকে, এই কামনাতেও যে ব্রহ্ম-তিব্বতীয় তথা ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির মধ্যে বিভিন্ন উপচারে সূর্যকে (অর্থাৎ চক্রকে, কেননা ভগবান সূর্য একখানি চক্র)[২৬] তুষ্ট করে 'চক্র বা চড়ক ঘোরানোর' এই ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া তাতে কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না।

তথ্যনির্দেশ

১। বাংলাদেশের উৎসব : রিয়াজুল হক : পৃঃ ১৮।

২। ভারতকোষ : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ২৭১।

৩। বাংলা দেশের ইতিহাস : ৩য় খণ্ড : মজুমদার : পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

৪। পূজা পার্বণের উৎসকথা : পল্লব সেনগুপ্ত : পৃঃ ১৫২-১৫৫।

৫। দৈনিক জনকণ্ঠ : নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা, ১৪০২ : আমার শৈশবের নববর্ষ পয়লা বৈশাখ : নীলিমা ইব্রাহিম।

৬। History of India : 3rd Edition : V. A. Smith : P. 186.

৭। Essays presented to Sir Jadunath Sarkar : Vol. II : H. R. Gupte : 1958 : PP. 260-265.

৮। বাংলা ভাষা : পার্বতীচরণ : পৃঃ ২৫৮।

৯। ভারতকোষ : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ২৭১।

১০। বিক্রমপুর : ১ম খণ্ড : হিমাংশু মোহন : পৃঃ ৩১৩-৩২৬।

১০ক। Adhar Chandra Mukherjee Lectures for 1942 : Maharaja Rajballabh : R. C. Mujumder : PP. 1-89.

১০খ। বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খন্ড : ঘাসফুল নদী সংস্করণ : পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

১১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ৬৫১-৬৫৪।

১২। দৈনিক জনকণ্ঠ: ৯ অক্টোবর, ১৯৯৭: পৃঃ ১: ছবি: চীনা এক ভক্তের গালে রেঞ্চ এফোঁড়-ওফোঁড় করা দৃশ্য।

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ৬৫৩।

১৪। বিক্রমপুর : ২য় খণ্ড : হিমাংশু মোহন : পৃঃ ২৪৭-২৬৪।

১৫। প্রাগুক্ত।

১৬। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ৬০১, ৬৫৩।

১৭। সূর্যবাদ : আতোয়ার রহমান : ১৯৯২ : ঢাকা : পৃঃ ১১০, ১১৯।

১৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ১৮৩, ২২৫-২৩০ ; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ২৮৪ ; সূর্যবাদ : আতোয়ার রহমান : পৃঃ ৭৫, ১০৮।

১৯। The Land and People of Burma : Lefroy : PP. 27, 56-57; দৈনিক ইত্তেফাক : ১৬ এপ্রিল, ১৯৯৩ : উপজাতীয়দের বৈসাবি উৎসব পালন; পটুয়াখালীর রাক্ষাইন উপজাতি : পৃঃ ৬৭-৬৮।

২০। The Cambridge History of India (M.I.) : Vol. IV : P. 487.

২১। সেভেন ইণ্ডিয়ান কাসিকস : তীর্থপতি দত্ত : পৃঃ ৩৮৮।

২২। দৈনিক জনকণ্ঠ : নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা : ১৪০২ : বাংলাদেশের বাঙালী জাতি এবং বঙ্গাব্দের জন্মকথা : এম. আর. আখতার মুকুল।

২৩। প্রাচীন ভারতে শূদ্র : রামশরণ শর্মা : ১৯৮৯ : কলিকাতা : পৃঃ ৫১, ৯১।

২৪। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ : ক্ষিতি মোহন সেন : ১৩৮৭ : কলিকাতা : পৃঃ ৯-১০।

২৫। সূর্যবাদ : আতোয়ার রহমান : পৃঃ ৯৩-৯৮।

২৬। সূর্যবাদ : আতোয়ার রহমান : পৃঃ ৬০ ; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ৬৪৬; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ২৪৮।

অধ্যায় ২২

হালখাতা, হালখাতায় গণেশ পূজা

হালখাতা বাঙালী ব্যবসায়ীরা পালন করে, হালখাতায় মিষ্টিমুখ ও গণেশপূজা অবশ্য পালনীয় প্রথা, হলখাতার রেওয়াজ চীন দেশেও ছিল, বিক্রম সম্বতে নববর্ষের উৎসব কার্ত্তিক মাসে–নাম দেওয়ালী–প্রধান দেবতা লক্ষ্মী, বাংলা নববর্ষে বাণিজ্যের দেবী লক্ষ্মীর বদলে গণেশের প্রতিষ্ঠার কারণ, মাড়োয়ারীদের প্রধান দেবতা গণেশ ও লক্ষ্মী, বাঙালীদের মধ্যে গণেশ কোন প্রধান দেবতা নন, বুদ্ধ বণিক-ব্যবসায়ীর পরম পৃষ্ঠপোষক, মগ রাজাদের খাতা উৎসব, মগ রাজারা গণেশের ভক্ত, বর্মী তৈলংদের প্রধান দেবতা হলেন গণেশ।

হালখাতা

হালখাতার অনুষ্ঠান পয়লা বৈশাখের একটি সার্বজনীন আচরণীয় রীতি। বাঙালীর নববর্ষ উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।[১] হালখাতা নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। খাতা ফারসী শব্দ। অর্থ হিসাবের বহি। হাল আরবী শব্দ। অর্থ বর্তমান বা চলতি।[২] তাই হালখাতা অর্থ চলতি বা নতুন বৎসরের হিসাবের খাতা।[৩] আর হালখাতা অনুষ্ঠান অর্থ নতুন বাংলা বছরের হিসাব পাকাপাকিভাবে টুকে রাখার জন্য বণিক-ব্যবসায়ীদের নতুন খাতা খোলাসংক্রান্ত অনুষ্ঠান।[৪] স্পষ্টই বোঝা যায়, হালখাতার অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ দুটি বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়েছে।

মিষ্টিমুখ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চারের অনুষ্ঠান

হালখাতা অনুষ্ঠানে নতুন খাতা খোলার জন্য অনেক ক্ষেত্রে লাল কাপড়ের মলাটের এক বিশেষ খাতা ব্যবহার করা হয়ে থাকে যাকে খেরো খাতা বলে।[৫] এই উৎসবে ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ-কারবারের লেনদেন, কারবারে তাদের সঙ্গে যারা সারা বছর জড়িত

থাকেন অর্থাৎ যারা তাদের নিয়মিত গ্রাহক বা বাঁধা খদ্দের, বাকী-বকেয়াওয়ালা খদ্দের, পৃষ্ঠপোষক, শুভার্থী ও বন্ধুবান্ধব তাদেরকে পত্রযোগে কিংবা লোক মারফত নিমন্ত্রণ করে গদিতে বা দোকানে এনে সাধ্যমত মিষ্টিমুখ করান।[৬] কেননা নতুন বছরের মিষ্টিমুখ হালখাতা উৎসবে বাধ্যতামূলক।[৭] তবে এই আপ্যায়ন একান্ত সৌজন্যমূলক হলেও এই সুযোগে অনেকে তাদের বাকী-বকেয়াও মিটিয়ে দেন, যেন হালখাতার বাকীর ঘরে তাদের নাম স্থান না পায়। একান্ত অসমর্থ না হলে কেউ বাকীর ঘরে নাম লিখাতে চান না। তাদের কাছে এটা একটা অপমানের বিষয়।[৮] আবার কেউ কেউ কোন পাওনা না থাকলেও দোকানীর হালখাতায় অগ্রিম কিছু টাকাকড়ি জমা দেন। ফলে শুভ হালখাতা হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থনৈতিক গতি সঞ্চারের অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে ব্যবসায়ীর হাতে কিছু নগদ মূলধন আসে এবং তা ব্যবসায়ীর ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়ক হয়।

ব্যবসায়ী ও বণিকদের দোকানে-গদিতে গণেশ মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা

হালখাতা উপলক্ষে ব্যবসায়ী-বণিকদের দোকান, গদিঘর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে পতাকা, লতাপাতা, রঙবেরঙের কাগজ ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়। সাজানো হয় জ্যান্ত কলাগাছ মুড়িয়ে। দোকানে-আড়তে স্থাপন করা হয় ছোট ছোট গণেশ মূর্তি।[৯] কেননা গণেশ মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা অবশ্য পালনীয় প্রথা বাঙালী ব্যবসায়ী সমাজে।[১০] স্মর্তব্য যে হালখাতা ব্যাপারটা হল একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মূলত বণিক বা বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের। বর্ণাশ্রম প্রথার অধীনে ব্যবসা ছিল এদেরই একচেটিয়া পুরুষানুক্রমে যুগের পর যুগ।[১১] এরা ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু। বিনায়ক সেনের ভাষায়— "বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যাদের বিচরণ ছিল তারা মূলতঃ নিম্নবর্ণের ব্যবসায়ী ও কারিগর সম্প্রদায়ভুক্ত। শেষোক্তদের মধ্যে সাহা, বণিক, পাল, তেলী, পোদ্দার, শীল, কর্মকার, সুত্রধর প্রভৃতি সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। যাদের সামাজিক মর্য্যাদা ছিল নিম্নে আর পুঁজি ছিল কম।...জন্ম থেকে বর্ণগতভাবে স্পর্শকাতর এই শ্রেণী (উচ্চবর্ণ যাদের হাতে পুঁজি ছিল) সাধারণত উৎপাদক শ্রেণীর সঙ্গে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকে।"[১২]

হালখাতা ব্যবসায়ী ও খদ্দেরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়তে সহায়ক

অধিকাংশ হালখাতা পয়লা বৈশাখে উদযাপিত হয়। তবে কিছু কিছু হালখাতা সারা বৈশাখ মাস ধরে পূর্ব নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হয়।[১৩] এই দিনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেচাকেনার চেয়ে আলাপ-আলোচনা ও সামাজিকতাই হয় বেশী। ফলে এই অনুষ্ঠান ব্যবসায়ী ও খদ্দেরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। আসলে বাঙালী বণিক-ব্যবসায়ীর এই হালখাতা অনুষ্ঠান বাংলার জমিদার-তালুকদারদের পুণ্যাহ অনুষ্ঠানেরই ওপিঠ।[১৪]

হালখাতার অনুষ্ঠান এককালে চীনদেশে ছিল

বাংলা নববর্ষের হালখাতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পল্লব সেনগুপ্ত লিখেছেন, "বাংলা নববর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হল দুটি, হালখাতা ও গণেশমূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা। এ দুটিই অবশ্য পালনীয় প্রথা ব্যবসায়ী সমাজে।...হালখাতা চালু করে নতুন বছরের হিশেব-কিতেব নতুনভাবে শুরু করার একটা রীতি অবশ্য এককালে চীন দেশে ছিল। তাছাড়া কিন্তু আর কোথাওই একটা নতুন খাতা খুলে রোকড়-খতিয়ান লেখার রেওয়াজ নেই, যা আছে বাঙালির নববর্ষ উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে। সুতরাং সিদ্ধি ও সিদ্ধম্— দুয়েরই অভিজ্ঞতা যার হাতে সমাবৃত — সেই গণেশকেও এনে প্রতিষ্ঠা করা হল হালখাতার পত্তনের সূত্রে।"[১৫] এমতাবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন, নববর্ষ উপলক্ষে হালখাতার এই চৈনিক তথা মোঙ্গলীয় রীতির কে প্রচলন করলেন অবশ্য পালনীয় প্রথা হিসেবে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের বণিক-ব্যবসায়ী সমাজে?

বিক্রমসংবৎ অনুসারে নববর্ষের উৎসবে লক্ষ্মীর আসন সবার উপরে

আমরা সকলেই জানি যে উত্তর ভারতের বাংলাদেশ ব্যতীত প্রায় সর্বত্র বিক্রমসংবৎ প্রচলিত।[১৬] ভারতীয় বিক্রমসংবৎ অনুসারে নববর্ষের উৎসব হল দেওয়ালী। এই উৎসব কার্ত্তিক মাসের ভূতচতুর্দশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবই হল সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রচলিত ভারতীয় উৎসব। এই উৎসবে শস্য-সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর আসন সবার উপরে। এই উৎসবে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লক্ষ্মী দেবী প্রতি ঘরে এসে থাকেন।[১৭] বাণিজ্যেরও তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এই খনার বচনটির প্রচলন সুপ্রাচীন।

বাঙালীর হালখাতায় গণেশের প্রতিষ্ঠার কারণ কি

অথচ আমরা দেখতে পাই খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে প্রবর্তিত বাঙালী বণিক-ব্যবসায়ীর হালখাতায় লক্ষ্মীর বদলে গণপতি ওরফে গণেশকে এনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গণপতির এই প্রতিষ্ঠার কারণ কী?

ভারতের মহারাষ্ট্রে গণেশ হিন্দু ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক। গণেশ চতুর্থীতে সেখানে গণেশ পূজার সর্বজনীন প্রচলন আছে।[১৮] আবার ভারতের রাজস্থানের হিন্দু বণিক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় মাড়োয়ারীদের প্রধান দেবতা গণেশ ও লক্ষ্মী। গণেশ সেখানে বাণিজ্যের দেবতা আর লক্ষ্মী পুঁজি সংরক্ষণের দেবী। এখানে বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে তাদের ব্যতিক্রম। অন্য দেবদেবীকে তারা অস্বীকার না করলেও উল্লেখিত দেবদেবীর প্রতি তাদের আনুগত্য সীমাবদ্ধ। তাদের মধ্যে গণেশের পূজা সর্বজনীন।[১৯] তাই বাঙালীর গণেশের সঙ্গে এই সব গণেশের পার্থক্য অনেক। বাঙালীর গণেশ কোন প্রধান দেবতা

নন। এখানে তার কোন সর্বজনীন পূজারও প্রচলন নেই।[২০] অথচ দেখি, একমাত্র তিনিই বাঙালী বণিক-ব্যবসায়ীর নববর্ষ শুরুর সঙ্গে সম্পর্কিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি বাঙালী বণিক-ব্যবসায়ীর বর্ষবোধনের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেন কেন?

বুদ্ধ বণিক-ব্যবসায়ীর বিঘ্ন নাশ করেন বলে তার শরণ আবশ্যক

এই 'কেন'র উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদেরকে বৌদ্ধ জাতকের আশ্রয় নিতে হয়। জাতকের কাহিনীতে আছে প্রাচীনকালে যখন পথঘাট দুর্গম ও শ্বাপদসঙ্কুল ছিল, তখন এই বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীটি নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে দেশ দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে দুর্লভ জিনিসপত্র মানুষের নিকট সহজলভ্য করে তোলেন। বণিকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে মানুষের সেবা করেন। তাই করুণার আধার বুদ্ধ তাদের সকল বিঘ্ন নাশ করেন। তাদের রক্ষক তাদের পৃষ্ঠপোষক হন তিনি। সে কারণেই বণিক-ব্যবসায়ীর জন্য তার শরণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়।[২১] "The Buddha's love for trading class is well-known. The Buddha had a great regard for the trading community since they hazarded so much, risked so much to make available to the people what was not easily available to them. There was no ordeal they were not required to face in their efforts to render service to mankind ...In times like these, only the merciful Bodhisatva could come to their succour."[২২]

বৈশাখ মাস বুদ্ধাবতার গণেশের জন্মোৎসব পালনের প্রশস্ত মাস

আবার প্রশ্ন, এই শরণ বৈশাখ মাসে কেন? এই 'কেন'র জবাব পাওয়া যাবে বৌদ্ধ জাতকের আরেকটি কাহিনীতে। এই কাহিনীতে আছে— 'বোধিসত্ত্ব শ্বেত হস্তীর আকারে বিশাখা নক্ষত্র থেকে নেমে এসে মহামায়ার শরীরের দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করেন। এই ঘটনা মহামায়াও স্বপ্নে দেখেন। শুধু তা-ই নয়, বোধিসত্ত্ব প্রবেশের সঙ্গে একটা পদ্ম ফুলেরও আবির্ভাব হয়, যা ব্রহ্মার প্রতীক।'[২৩] আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি, ঐ বিশাখা নক্ষত্রের নামেই হয়েছে বৈশাখ মাসের নাম। সে কারণে বৈশাখ মাস বোধিসত্ত্ব শ্বেত হস্তী তথা গণেশের জন্মোৎসব ও উপাসনার প্রশস্ত মাস।

আরাকান রাজারা বুদ্ধাবতার গণেশের ভক্ত

আমরা দেখেছি, আরাকান তথা বর্মী রাজারা প্রাচীনকাল থেকেই 'খাতা' উৎসব পালন করেন। আমরা এটাও দেখেছি, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী এই সব রাজারা বোধিসত্ত্ব শ্বেত হস্তী তথা গণপতি বা গণেশের অতিশয় ভক্ত ও অনুরাগী। তারা সর্ববিঘ্ননাশক গণপতিকে সম্পদ ও সৌভাগ্যের প্রতীক বলে বিশ্বাস করেন। "Among the Burmese and Thai a white elephant is looked upon as a royal treasure beyond compare and an augur of good fortune and prosperity."[২৪]

আরাকান রাজাদের শ্বেত গজেশ্বর উপাধি ধারণ

তারা যে কোন মূল্যে শ্বেত হস্তী সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হন। শ্বেত গজেশ্বর উপাধি ধারণ করেন এবং রাজপুরোহিতের উপর শ্বেত হস্তী তথা গণপতির নিয়মিত সেবা ও পূজার ভার অর্পণ করেন।[২৫]

মনদের প্রধান দেবতা গণেশ

উপরন্তু সুসভ্য মন (পেগুর অধিবাসী) তথা তৈলংদের প্রধান দেবতাই হলেন (Patron Saint of the Mons) এই গণপতি ওরফে গণেশ।[২৬] পেগুর নিকটে ১০০ ফুট উঁচু তার এক বিশাল প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যের রাজা ও জনগণ এর নিয়মিত সেবা-পূজা করেন। হার্ভে লিখেছেন, "There is a huge white elephant-image a hundred feet high; litigants burn incense and kneel before the elephant reflecting within themselves whether they be right or wrong, and then they retire. When there is any disaster or plague the king kneels down before the elephant and blames himself."[২৭]

মঙ্গৎ রায়ের আমলে বণিকের হালখাতায় বুদ্ধাবতার গণপতির প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে (অর্থাৎ মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুলের আমলে) বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়, সরকারের রাজস্ব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়[২৮] এবং হালখাতা অনুষ্ঠান বাংলার জমিদার-তালুকদারদের পুণ্যাহ অনুষ্ঠানেরই ওপিঠ। এমতাবস্থায় আরাকানী ঐতিহ্যের ধারক-বাহক-পৃষ্ঠপোষক এবং মোগল সম্রাট শাহজাহানের অধীনে জায়গিরদার-মনসবদার-করদ সামন্ত মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুলের শাসনামলে বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত পবিত্র বৈশাখ মাসে বঙ্গদেশের নববর্ষের বণিক-ব্যবসায়ীর হালখাতায় সর্ববিঘ্ননাশক ও সম্পদ-সৌভাগ্যের প্রতীক বোধিসত্ত্ব গণপতির প্রতিষ্ঠা ও পূজা অত্যাবশ্যকীয় প্রথা হিসেবে প্রবর্তিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। নয় কি?

তথ্যনির্দেশ

১। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : শামসুজ্জামান খান : পৃঃ ২৫।
২। Perso-Arabic Elements in Bengali : Dr. Shaikh Ghulam Maqsud Hilali : 1967 : Dacca : PP. 62, 298.
৩। আধুনিক বাংলা অভিধান : মোসলেম উদ্দিন : পৃঃ ৮৪০।
৪। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : খান : পৃঃ ২৫-২৬।
৫। বাংলাদেশের উৎসব : মামুন : পৃঃ ৯৬।
৬। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : খান : পৃঃ ২৫-২৬।
৭। পূজা পার্বণের উৎসকথা : পল্লব সেনগুপ্ত : পৃঃ ৭৭।
৮। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : খান : পৃঃ ২৬।
৯। দৈনিক জনকণ্ঠ : ১লা বৈশাখ ১৪০৪ : পৃঃ ১, ১১।
১০। পূজা পার্বণের উৎসকথা : সেনগুপ্ত : পৃঃ ৭৪।
১১। দৈনিক সংবাদ : ১৪এপ্রিল ১৯৮৫ : বাংলা নববর্ষ : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী।
১২। দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য : শরীফ উদ্দিন : পৃঃ ২৫৮।
১৩। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : খান : পৃঃ ২৫
১৪। প্রাগুক্ত : পৃঃ ২৬।
১৫। পূজা পার্বণের উৎসকথা : সেনগুপ্ত : পৃঃ ৭৪-৭৬।
১৬। ভারতকোষ : প্রথম খণ্ড : পৃঃ ৯০।
১৭। ভারত বিচিত্রা : ত্রয়োদশ বর্ষ : ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৯২: ঢাকা: পৃঃ ২৬-২৯।
১৮। পূজা পার্বণের উৎস কথা : সেনগুপ্ত : পৃঃ ৭৮।
১৯। দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য : শরীফ উদ্দিন : পৃঃ ২৬০।
২০। পূজা পার্বণের উৎসকথা : সেনগুপ্ত : পৃঃ ৭৫।
২১। অপরূপা অজন্তা : নারায়ণ সান্যাল : পৃঃ ৬৩-৬৯।
২২। Iconography of the Hindus, Buddhists and Jains : Gupte : P. 113.
২৩। দৈনিক জনকণ্ঠ : ২৬ পৌষ ১৪০৪ : পৃঃ ৬ : ইসলাম ও আমরা ।
২৪। Lost Cities of Asia : Wim Swaan : P. 99.
২৫। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ৩৪, ৫৬-৫৭।
২৬। BRSFAP No. 2 : P. 425.
২৭। History of Burma : Harvey : P. 13.
২৮। History of Bengal (M.P.) : Sarkar : P. 333.

অধ্যায় ২৩

পুণ্যা, ঝারোকা-ই-দর্শন, মগ খাতা অনুষ্ঠান, বুদ্ধাবতারের পূজা

পুণ্যাহ বাংলার জমিদার-তালুকদারেরা পালন করেন, জমিদার বাটকু চৌধুরীর পুইণ্যা, বোমাং রাজার পুণ্যাহ, বাংলার নবাবদের পুণ্যাহ, মোগল সম্রাটদের ঝারোকা-ই-দর্শন, মগ খাতা অনুষ্ঠান, রাজমুখ দর্শন ও দর্শনী প্রদান পুণ্যকর্ম, ধর্ম ঠাকুরের পূজা ও উৎসব, প্রত্যক্ষ নারায়ণ বল্লাল রাজা, বল্লাল রাজার কুলীনেরা দেবতার সমান, পুণ্যা মোগল ঝারোকা-ই-দর্শন ও মগ খাতা অনুষ্ঠানের মিশ্র রূপ।

পুণ্যাহ

বাংলা নববর্ষের পুণ্যাহ নামক আরও একটি অনুষ্ঠানও সার্বজনীন। পুণ্যাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. এনামুল হক লিখেছেন, "পুণ্যাহ শব্দের মৌলিক অর্থ পুণ্য কাজ অনুষ্ঠানের পক্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন। কিন্তু বাংলায় এর অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে নতুন বছরের খাজনা আদায় করার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানসূচক দিন। এই সেদিন পর্যন্ত জমিদার ও বড় বড় তালুকদারের কাছারিতে পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হত। যদিও অধিকাংশ পুণ্যাহ পয়লা বৈশাখে উদযাপিত হত, বেশ কিছু সংখ্যক পুণ্যাহ সারা মাস ধরে পূর্ব নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হত। সেদিন অধিকাংশ প্রজা ভাল কাপড় চোপড় পরে জমিদার-তালুকদার বাড়িতে খাজনা দিতে আসতেন। প্রজারা নতুন বছরের অথবা অতীত বছরের খাজনা আংশিক বা পুরোপুরি আদায় করতেন। কোথাও কোথাও জমিদার-তালুকদারেরা প্রজাদেরকে পান-সুপারি দিতেন; আর কোথাও কোথাও মিষ্টিমুখও করাতেন। ঐদিন জমিদার-প্রজার সম্বন্ধের দূরত্ব খুব কমে আসত। তারা পরস্পর মিলিত হতেন, পরস্পরের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন; এমনকি পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতেন।"[১] পয়লা বৈশাখের ভোররাত থেকে জমিদারবাড়ীর সামনে নাকারা বাজত। সবাইকে জানান দেয়া হত যে আজ বৈশাখের

প্রথম দিন। জমিদারের পুণ্যাহ। প্রজারা ভাল কাপড়চোপড় পরে নজরানা দিতে আসত। সিংহাসনের মত উঁচু আসনে বসা জমিদার হাসিমুখে সে নজরানা গ্রহণ করতেন। সবার হাতে তুলে দেয়া হত ঠোঙাভরা সন্দেশ-রসগোল্লা আর কিছু পানসুপারি।

গ্রাম্য জমিদারদের পুইণ্যা অনুষ্ঠান

গ্রাম্য জমিদারদের পুইণ্যা অনুষ্ঠানের একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া যায় দৈনিক জনকণ্ঠের 'বিরস কাহিনীর' ক্লান্ত পথিকের বর্ণনায়। তিনি লিখছেন, "সেই কবে, প্রায় আটান্ন বছর আগে, অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে প্রথম দেখেছিলাম 'গড়ৈয়া'। ফেনী-চট্টগ্রামের মাঝামাঝি অঞ্চলে বৈশাখী মেলার ওটাই ছিল প্রচলিত নাম। গড়ৈয়া শব্দটার উৎপত্তি কোথা থেকে, দেশী না বিদেশী, বর্মী না আরাকানী উৎস থেকে, তা সেদিনও জানতাম না, এখনো জানি না।...বৈশাখের প্রথম দিনে নববর্ষ বরণের আরেক অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল পুণ্যাহ দেখতে গিয়ে। গ্রাম সম্পর্কে নানা বাটকু চৌধুরী। বছর ষাট। পুরনো জমিদার বংশের সন্তান। জমিদারি করেই ফুঁকে দিয়ে গেছেন পূর্বপুরুষরা পঞ্চ ম'কারের সাধনায়। এখন আছে ছোট একটা তালুক। আয় সামান্য।...বাড়ি থেকে বের হন খুবই কম। হয়তো এই ভয়ে যে দেখা হলে লোকে সেলাম দেবে না। সারা বছর বসে থাকেন ঘাপটি মেরে বৈশাখের প্রথম দিনটির অপেক্ষায়। সেদিন তার ফুইন্যা। সে দিন ভোর রাত থেকে তার বাড়ির সামনে নাকারা বাজে। সবাইকে জানান দেয় আজ বৈশাখের প্রথম দিন। বাটকু চৌধুরীর পুণ্যাহ। নতুন পয়সাওয়ালারা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, ঠাট্টা করে। কিন্তু আত্মীয়স্বজন, দশগেরামের বুড়ো-বুড়িরা, তার তালুকের প্রজারা হাসে না। চার আনা, আট আনা, এক টাকা সযত্নে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে তারা যায় বাটকু চৌধুরীকে নজরানা দিতে। চৌধুরী বসে থাকেন বাঁশ-বেতের তৈরি সিংহাসনের মতো উঁচু এক মোড়ায়। আত্মীয়দের বুকে জড়িয়ে ধরেন। প্রজাদের হাত ধরে বসান। বকেয়া খাজনার পরিমাণ যাই হোক, কোন প্রশ্ন না করে যে যা নজরানা এনেছে তাই গ্রহণ করেন হাসিমুখে। সবার হাতে তুলে দেয়া হয় ঠোঙ্গাভরা সন্দেশ-রসগোল্লা, পান-সুপারির বান্ডিল, অন্তত এক জোড়া ঝুনা নারকেল।"২

বোমাং রাজাদের পুণ্যা উৎসব

বান্দরবানের বোমাং রাজাদের রাজপুণ্যাহ উৎসবের একটি বর্ণাঢ্য বিবরণ দিয়েছেন মনিরুল ইসলাম। তিনি লিখেছেন, "রাজ্য নেই! রাজত্বও নেই! তবুও তিনি রাজা। মাথায় সোনালী পাগড়ি, কোমরে মোগল আমলের স্বর্ণের তরবারি। লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন রাজা বাহাদুর। আগে-পিছে নাঙ্গা তলোয়ার উঁচিয়ে বুক টান করা পাইক বরকন্দাজ, দুপাশে সমবেত নানা বয়সের হাজার হাজার মানুষ তাকে জানাচ্ছে সশ্রদ্ধ অভিবাদন। তন্বী কুমারীগণ দুহাতে ছিটিয়ে দিচ্ছে গোলাপ পাপড়ি। হেটে হেটে

প্রজাদের অভিবাদনে সিক্ত হয়ে দরবার হলে রাজা মখমলের আসনে বসবেন। সামনে রাখা আছে দুটি স্বর্ণপাত্র। একে একে আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানাবেন মৌজা হেডম্যানগণ। তারপর স্বর্ণপাত্রে রাখবেন প্রজাদের পক্ষে বার্ষিক ভূমিকর।...রাজপুণ্যাহ উপলক্ষে বান্দরবান জেলা সদরে রাজবাড়ি ময়দানে বসে তিন দিনব্যাপী বিশাল এক লোকজ মেলা। ৭০/৮০ মাইল দূর থেকেও বিভিন্ন উপজাতীয় নারী-পুরুষ-শিশু-কিশোর পায়ে হেঁটে আসেন তাদের প্রিয় রাজাকে দেখার জন্য।"৩

বাংলার নবাবদের পুণ্যাহ উৎসব

বাংলার নবাবদের পুণ্যাহ উৎসব পালন সম্বন্ধে গবেষক শিনকিচি তানিগুচি লিখেছেন, "নবাবী আমলে বাংলার জমিদারেরা বছরের শুরুতে সদর পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দিতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে যেতেন। নবাব কর্তৃক তাদের জমিদারিতে পুনর্বহাল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পর তারা বছরের খাজনা বন্দোবস্ত ও খাজনা সংগ্রহের কাজ শুরু করার জন্য স্ব স্ব জমিদারিতে ফিরে আসতেন (এবং স্ব-স্ব কার্যালয়ে পুইণ্যা অনুষ্ঠান করতেন)। নবাবের সঙ্গে রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য জমিদারকে মুর্শিদাবাদে একটি উকিল দফতর রাখতে হতো। ১৭৬৯ সালে এ ধরনের একটি দফতরে ১০৬ জন উকিল নিযুক্ত ছিলেন যাদের জন্য সে বছর ৯,৬৬০ সনত রুপি ব্যয় করা হয়। ১৭৭২ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের সকল দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করার পর এই দফতর কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়।"৪

বাংলার এই পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের উদ্ভবের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভের জন্য আমরা এখানে মোগল বাদশাহদের ঝারোকা-ই-দর্শন ও মগ রাজাদের 'খাতা' অনুষ্ঠানের ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব।

ঝারোকা-ই-দর্শন

ভারতীয় হিন্দুদের নিকট রাজা ঈশ্বরের অবতার।৫ তাদের নিকট রাজার পবিত্র মুখ-দর্শন অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। অনেক ধর্মপরায়ণ হিন্দু রাজমুখ দর্শন না করে খাদ্য গ্রহণ করতেন না। তাদের এই আকাঙ্খা পূরণের জন্য মোগল সম্রাটগণ ঝারোকা-ই-দর্শনের ব্যবস্থা করেন। ঝারোকা হিন্দী শব্দ। অর্থ উপরতলাসংলগ্ন ক্ষুদ্র বারান্দা বা ছাদসংলগ্ন ছোট জানালা। দর্শন সংস্কৃত শব্দ। অর্থ দেখা বা অবলোকন। তবে অবশ্য এখানে সাধারণ দেখা নয়। কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মুখ দর্শনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অনেক হিন্দু এটি ধর্মীয় অর্থে ব্যবহার করতেন। তারা মন্দিরে কোন দেবদেবী দর্শনে যেতেন না এবং পূজাও করতেন না। মোগল বাদশাহ দৈনিক প্রত্যুষে একবার, কখনও কখনও পরে আরেক বার ঝারোকায় উপবেশন করে নিম্নদেশে ভিড়করা দর্শনার্থীদের দর্শন দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ দিতেন।৬ এই বিষয়ে তৈফুর লিখছেন, "As a

digrssion I would take my inqusitive readers to view the tamasha enacted on the bank of the sacred Jumna. Whenever the Padshah happened to be in the metropolis he, as a rule, appeared in his full splendour with rise of the morning Sun in the Jharoka-e-darshan-e-mubarak (the holy royal alcove) to give a public view to the vast Hindu multitude almost all of whom were high-caste Brahmins. They anxiously awaited there to catch a glimpse of the Padshah as an auspicious prelude to their day's work. No sooner the Padshah appeared in the balcony there were vociferous cheers and the whole multitude in one voice thundered out Pundit Jagannath's famous composition দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা ! (Hail, to the God of Delhi who is the Lord of the Universe). The multitude would neither move nor even take a drop of water unless they had seen the benign face of their godhead-incarnate (Avatar). This is the evidence of history."[৭]

খাতা অনুষ্ঠান

আরাকান তথা বর্মার ভূমি ব্যবস্থা মূলত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী তথা মাইযুগীদের উত্তরাধিকারযুক্ত ও উত্তরাধিকারমুক্ত নিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এই সকল কর্মচারী নিজেদের ক্ষমতা অনুসারে কৃষকদের নিকট থেকে কর আদায় করতেন। এরা স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায় গঠন করেন। বস্তুত এরা সর্বনিম্ন সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পন্ন করতেন। ক্ষণস্থায়ী রাজকর্মচারী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে স্বীয় অবস্থানই তাদের ক্ষমতার মূল ভিত্তি। এরা ছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্বৃত্ত সংগ্রাহক। এরা কর সংগ্রহ করে জেলা গভর্নর বা মাইয়ূনদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তাদের এখতিয়ারভুক্ত সকল জনসাধারণের একটি তালিকা সংরক্ষণ, পুলিশের দায়িত্ব পালন, ছোটখাটো মামলার বিচার, প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির যোগান ও সাধারণের জন্য বিশেষ কর নির্ধারণ ইত্যাদি তাদের অন্যান্য কর্তব্যের আওতায় ছিল। এই সকলের বিনিময়ে মাইযুগী পরিবারবর্গ বেশীরভাগ কর থেকে অব্যাহতি পেতেন এবং সংগৃহীত করের ওপর তারা উল্লেখযোগ্য কমিশন পেতেন। রাজা তাদের দশ থেকে বিশজন পর্যন্ত সশস্ত্র সৈন্য বরাদ্দ করতেন, যার মাধ্যমে মাইযুগীরা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভূমি বরাদ্দ দেয়া হত। প্যাগোডা বা কোন মঠ-সংলগ্ন এই সকল ভূমির খাজনা রাজকোষের বদলে সংলগ্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রদান করার নিয়ম ছিল। কর প্রদানে কারচুপি এবং রাজক্ষমতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে রাজশক্তি বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা চালান। রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব এবং কর আদায় ও পুনর্বিতরণে রাজার স্বর্গীয় অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রনয়ণ করা হয়। প্যাগোডা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে রাজা ছিলেন দেবতার সমতুল্য। তিনি

আইনসম্মত ধারা মোতাবেক বিচারকার্য সম্পাদন এবং বৌদ্ধ ধর্মের মূল্যবোধের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দ্বৈত ভূমিকা পালন করতেন। এভাবে রাজা প্রজাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য লাভে সমর্থ হন। আনুগত্য প্রয়োগের লক্ষ্যে রাজা সদর রাজধানীতে রাজকীয় আদালতের মাধ্যমে সর্বস্তরের রাজপদগুলোর মেয়াদ নবায়নের জন্য খাতা (Kadaw) নামক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। অমাত্যবর্গ, বিভিন্ন রাজকর্মচারী, মাইযুগী এবং অন্যান্যরা রাজার জন্য বিশেষ উপঢৌকনের বিনিময়ে উক্ত অনুষ্ঠানে তাদের মেয়াদ নবায়ন করে নিতেন। যারা অতি গুরুত্বপূর্ণ এই খাতা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্যর্থ হতেন তারা রাজদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হতেন। ক্ষমতা বৃদ্ধির চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে রাজা মায়ূজা (ভরণ-পোষণার্থ প্রদত্ত সম্পত্তি) সমূহের পুনর্বণ্টন করেন রাজআনুগত্যের প্রতিদানস্বরূপ।[৮]

ঝারোকা-ই-দর্শন ও খাতা অনুষ্ঠানের মিশ্ররূপ বাংলার পুণ্যা অনুষ্ঠান

বাংলার পুইণ্যা অনুষ্ঠান কিছুটা মোগল সম্রাটদের ঝারোকা-ই-দর্শনের অনুরূপ। ঝারোকা-ই-দর্শনে রাজা সদর রাজধানীতে প্রজাদের দিনের শুরুতে দর্শন দেন এবং এভাবে প্রজাদের পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেন। পুণ্যাহ অনুষ্ঠানেও আমরা দেখতে পাই দিনের শুরুর বদলে বছরের শুরুতে রাজা সদর রাজধানীতে প্রজাদের দর্শন দেন এবং প্রজারা রাজমুখ দর্শন করে পুণ্য অর্জন করে, কেননা রাজা ঈশ্বরের অবতার এবং অবতারের নিকটে গমন ও তাকে দর্শন পুণ্যের কাজ। পুণ্যাহ অনুষ্ঠান আবার অনেকটা মগ রাজাদের খাতা অনুষ্ঠানেরও অনুরূপ। খাতা অনুষ্ঠানে প্রজারা বছরের শুরুতে রাজমুখ দর্শন করে রাজাকে দর্শনী বা উপঢৌকন দেন, কেননা 'শাস্ত্রে আছে রাজা, গুরু এদের কাছে খালি হাতে যেতে নেই, কিছু নিয়ে যেতে হয়'।[৯] পুণ্যাহ অনুষ্ঠানেও প্রজারা বছরের শুরুতে রাজমুখ দর্শন করে রাজাকে উপঢৌকন দেয়, যা পুণ্যের কাজ বা সুকৃতি।

গোহার ও ধরম-ডাক

এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশে ধর্মঠাকুরের পূজা উপলক্ষে পালিত অনুরূপ একটি অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যায়। অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখছেন, "যে মন্দিরে ধর্মঠাকুর 'ধর্মরাজ' অভিহিত হন সেরূপ স্থানে বিশেষ পূজা-উৎসবে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানে রাজসভার অনুকৃতি দেখা যায়। ধর্মরাজের মন্দিরের বা গর্ভকক্ষের চারদিকের দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয় সকাল বেলাতে। চারজন ভক্ত্যা নগর কোটাল হয়ে চারদিক পাহারা দেন। ভক্তেরা মন্দিরের সামনের চত্বরে বা ভূমিতে বসে দুহাত জোড় করে 'গোহার' অর্থাৎ রাজদর্শনের জন্য কাতর প্রার্থনা জানান। বেলা প্রায় দ্বি-প্রহরের সময়, ঐ কক্ষের ভিতর থেকে পুরোহিত মন্দিরের দ্বার মুক্ত করেন। এদিন

পুরোহিত পট্ট বস্ত্র বা চেলি ও উত্তরীয় ব্যবহার করেন।... মন্দিরের 'দ্বার মুক্তির' পর অপেক্ষারত ভক্তদের উদ্দেশ্যে পুরোহিত 'ধরম-ডাক' দেন। ধরম-ডাক Roll-Call বা হাজির নেওয়ার মত প্রথা (অর্থাৎ অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তিগণ ও ভক্তরা সকলে উপস্থিত হয়েছেন কি না জানা)। তারপর ঢাক ঢোল কাঁসি সানাইয়ে সমবেত বাদ্য ও পূজা, আরতি, হোম সন্ধ্যা পর্যন্ত হয়।"[১০]

ধর্ম উপার্জন করতে হলে বুদ্ধাবতারকেও পূজা ও ভক্তি করতে হয়

সকলেই আমরা জানি, 'মহাযান মতে বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ লাভ করলে মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খা পূর্ণ হয়। যে প্রাণী বুদ্ধত্ব লাভের চেষ্টা করছেন অথচ সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধ হন নি, তিনিই পৃথিবীর যথার্থ উপকার করতে পারেন। এ প্রাণীর নাম বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাবতার। সুতরাং ধর্ম উপার্জন করতে হলে বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্বকে পূজা ও ভক্তি করা এবং বোধিসত্ত্বদের মত লোকসেবা করা উচিত।[১১]

বল্লাল প্রত্যক্ষ নারায়ণ এবং কুলীনেরা দেবতার সমান

আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি যে মগ রাজারা প্রত্যেকেই একেকজন বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধের অবতার তথা শিবের অবতার তথা নারায়ণের অবতার তথা ঈশ্বরের অবতার। মগ রাজা হিসেবে মঙ্গৎ রায় ওরফে মান্দার রায় ওরফে রাজা মান্দার ওরফে সা মান্দার[১২] ওরফে ধরম সা ওরফে ধরম রাজা ওরফে ধরম ঠাকুর[১৩] (ভিক্ষুকে মগ তথা বর্মীরা ঠাকুর বলে)[১৪] ওরফে বল্লাল রাজাও একজন অবতার। বঙ্গদেশে তিনি 'প্রত্যক্ষ নারায়ণ' (অর্থাৎ নারায়ণের অবতার) বলে বিখ্যাত।[১৫] তার সৃষ্ট কুলীনেরাও বঙ্গদেশে দেবতার সমান।[১৬]

প্রজাদের জন্য রাজাকে ও কুলীনদেরকে দর্শন ও দর্শনী প্রদান পুণ্যের কাজ

এমতাবস্থায় প্রজাদের জন্য তাকে ও তার প্রতিনিধি কুলীনদেরকে দর্শন ও দর্শনী প্রদান দুটোই পুণ্যের কাজ বা সুকৃতি। এই পুণ্যের কাজটি আনুষ্ঠানিকভাবে বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি-বিজড়িত পবিত্র বৈশাখ মাসের যে-কোন দিন হতে পারে। তাই যে অনুষ্ঠানে এই ধরনের পুণ্যের কাজ হয় সে অনুষ্ঠানই পুণ্যাহ বা পুইণ্যা।

আরাকানী ভাষার পুণীয়া থেকে পুইণ্যা

এই পুণ্যাহ বা পুইণ্যা নামটি খুব সম্ভব বাংলা বা সংস্কৃত পুণ্য অহ (পুণ্য দিন)[১৭] থেকে হয় নি, হয়েছে বর্মী তথা আরাকানী ভাষার শব্দ পুণীয়া থেকে কেননা বাংলা বা সংস্কৃত পুণ্য শব্দের বর্মী বানান পুঞা, উচ্চারণ পুণীয়া যার অর্থ সুকৃতি বা ভাল কাজ, যাতে মঙ্গল বা পরলোকে সদগতি হয়।[১৮]

মগ খাতা অনুষ্ঠান পুইণ্যা অনুষ্ঠান নামে চালু হয়

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাংলার পুণ্যাহ অনুষ্ঠান মোগল ঝারোকা-ই-দর্শন ও মগ খাতা অনুষ্ঠানেরই মিশ্র রূপ। তাই সঙ্গত কারণেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে প্রজাদের নিকট থেকে বিশেষ করে কুলীনদের নিকট থেকে নিরঙ্কুশ আনুগত্য লাভের বাসনা নিয়েই মোগল সম্রাট শাহজাহানের অধীনে মোগল মনসবদার, জায়গিরদার ও করদ সামন্ত কীর্তিমান ও কীর্তিলিপ্সু মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল মগ খাতা অনুষ্ঠানকে বঙ্গদেশে পুণীয়া অনুষ্ঠান নামে চালু করেন। আমরা দেখতে পাই, 'এই রীতি জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে অব্যাহত থাকে।'[১৯]

তথ্যনির্দেশ

১। বইয়ের খবর : ত্রৈমাসিক পত্রিকা : ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা : ১৯৮২ : পৃঃ ১০-১১।

২। দৈনিক জনকণ্ঠ : ১ বৈশাখ ১৪০১ : ওহ্ , প্যান্টা ইজ রিয়েলী হোলসাম : কান্ত পথিক।

৩। দৈনিক জনকণ্ঠ : ৩০-১২-১৯৯৪ : পৃঃ ৯ : আজ থেকে শুরু হচ্ছে বান্দরবানে রাজপুণ্যাহ উৎসব : মনিরুল ইসলাম।

৪। দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য : শরীফ উদ্দিন : পৃঃ ১৬৮-১৬৯, ১৮১।

৫। A Short History of Muslim Rule in India : I. Prasad : P. 280.

৬। আলমগীরের পত্রাবলী : কাজী আবুল হোসেন : ১৯৮৮ : ঢাকা : পৃঃ ৮, ১৫৫।

৭। Glimpses of old Dhaka : Taifoor : P. 154.

৮। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা : ৩য় খণ্ড : ১৯৮৫ : ঢাকা : পৃঃ ১৩৪-১৫২।

৯। সেভেন ইণ্ডিয়ান কাসিকস : তীর্থপতি : পৃঃ ৬৮।

১০। বাংলার লৌকিক দেবতা : গোপেন্দ্রকৃষ্ণ : পৃঃ ২২৮-২২৯।

১১। দৈনিক জনকণ্ঠ : ২৬ পৌষ ১৪০৪ : পৃঃ ৬ : ইসলাম ও আমরা।

১২। দৈনিক ইনকিলাব : ১ বৈশাখ ১৪০০ : এক নজরে চতুর্দশ শতাব্দীর রাজনীতি: তারেক ফজল; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ২৮২।

১৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : ৩য় খণ্ড : পৃঃ ২৮২, ২৮৪, ৩২৩-৩২৭।

১৪। বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন : সুনীথানন্দ : পৃঃ ২২৮।

১৫। বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : যোগেন্দ্রনাথ : পৃঃ ২৫৪।

১৬। Vallala Charita : Ananda Bhatta : P. 3.

১৭। আধুনিক বাংলা অভিধান : মোসলেম উদ্দিন : পৃঃ ৫০৯।

১৮। প্রাচীন আরাকান রোয়াইঙ্গা হিন্দু : পৃঃ ১৫৮।

১৯। বাংলাদেশের উৎসব : মামুন : পৃঃ ৯৬।

অধ্যায় ২৪

ঢাকায় চিল পূজার মেলা, অন্যান্য স্থানের মেলা, ঢাকায় ঘুড়ি উড়ানো উৎসব, গরুর পরিচর্যা ও দৌড়, বাসি হওয়া ঠান্ডা খাবার খাওয়া

ঢাকার কামরাঙ্গীরচরের মেলা, ফরিদাবাদ ও শ্যামপুরের চিল পূজার মেলা, নেকমর্দানের মেলা, চট্টগ্রামের চৈত্র সংক্রান্তির মহামুনি মেলা, রাজনগরের কালবৈশাখীর মেলা, মেলার আরেক নাম গলৈয়া, ঢাকার নবাববাড়ীতে চৈত্র-সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানো ও পয়লা বৈশাখে বাসি খাবার খাওয়া, বিক্রমপুরে পয়লা বৈশাখে গরুর পরিচর্যা ও দৌড়, মগী সাংগ্রাইং উৎসবে চৈত্রসংক্রান্তির সূর্য উৎসব ও পয়লা বৈশাখের বুদ্ধ উৎসব বিমিশ্রিত, বৌদ্ধ গরু জাতকের কাহিনী, চৈনিক লোক উৎসবে ঘুড়ি ওড়ানো ও ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার রীতি, ঢাকার কুট্টি সম্প্রদায়।

মেলা

বাংলা নববর্ষের সার্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে আরেকটি হচ্ছে বৈশাখী মেলা। বঙ্গদেশের নানা স্থানে সারা বৈশাখ মাস ধরে বিশেষ করে চৈত্রসংক্রান্তি ও ১লা বৈশাখে ছোট-বড় নানা মেলা বসে। পূর্বকালে 'প্রতি ১লা বৈশাখে সারা দেশে উৎসবের বন্যা বয়ে যেত। স্থানীয় জমিদারেরা আয়োজন করতেন প্রজাভোজের। দিনভর চলত আনন্দ উৎসব আর মেলা।'[১] মেলার স্থায়িত্বকাল সাধারণত এক থেকে সাত দিন।

ঢাকা শহরের দুটি বিখ্যাত মেলা

এক দিন স্থায়ী ঢাকা শহরের দুটি বিখ্যাত মেলার বর্ণনা দিয়েছেন হাকীম হাবিবুর রহমান এই ভাবে— "চৈত্র মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে দুপুর থেকে সন্ধ্যার পর

পর্যন্ত মসজিদগঞ্জের চরে এই মেলা বসত। প্রথমে এই চরকে মোগলানীর চর বলা হত। পরে কামরাঙ্গীর চর বলা হল।...এটা হিন্দু ও মুসলমানদের সম্মিলিত মেলা। এতে বেশীর ভাগ মাটির খেলনা আর গুল্লি ও বাসনের দোকান বসত। কোথাও শামিয়ানা টাঙ্গানো হত এবং সংগীতের আসর জমত। আর শহরের হিন্দু মুসলমান গায়করা নিজেদের দক্ষতা দেখাত। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মহল্লা মহল্লা থেকে সং-এর দল আসত এবং গান বাজনা করে নিজেরাও আনন্দ পেত ও অপরকেও আনন্দ দিত।...এই মেলার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ বাংলা সনের প্রথম দিন চিল পূজা নামে ফরিদাবাদ ও শামপুরে এই মেলা বসত। আমার বাল্যকালে আমি দেখেছিলাম যে ফরিদাবাদ থেকে বেশী জোরদার মেলা শামপুরে বসত।...শামপুরে বেশীর ভাগ নাচের আসর জমত যা এখন দেখা যাচ্ছে না। বরং এখন তার জায়গায় জুয়ার বাজার গরম হয়ে গেছে এবং এখন শহরের সকল জুয়ারী সেখানে পৌঁছে আগামী বছরের জন্য ভালমন্দের আলামত বুঝার চেষ্টা করে। চৈত্র পর্বকে আমাদের বাল্যকালে চড়ক পূজা বলা হত।...এই দুই মেলা এমনিতেই সম্মিলিত ছিল। একটি বাংলা বছরের শেষ দিন আর অপরটি বাংলা বছরের প্রথম দিনে হত...এই চৈত্র মাসের শেষে কালী আর শিব গৌরীর সং বের হত। তার একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য যে কালী নাচে কালীর দুই হাতে তলোয়ার বা রামদাও থাকত। এটা একটা বিশেষ নৃত্য যাতে নাচের তালে তালে সকল হাত রীতিমত আঘাত ও আক্রমণের বহিঃপ্রকাশ ঘটাত। প্রত্যেক তাল তরবারির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যেত। এই নাচে ঢাক বাজত।"[২]

নেকমর্দানের বিখ্যাত মেলা

বঙ্গদেশের সাতদিন স্থায়ী একটি বিখ্যাত মেলা উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর জেলার নেকমর্দানের মেলা। 'নেকমর্দানে এখনও পয়লা বৈশাখে যে মেলা বসে তা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের সব চাইতে বড় মেলা। এই মেলা এক সপ্তাহ কাল স্থায়ী হয়। এতে উত্তরবঙ্গের হেন বস্তু নেই যা পাওয়া যায় না। জনসাধারণের আনন্দ দানের উপযোগী আয়োজনও এই মেলায় কম থাকে না।'[৩] এই মেলার বিবরণ দিতে গিয়ে শিরীন আখতার লিখছেন, "মেলা, যাত্রা ও তীর্থযাত্রীদের তত্ত্বাবধানের ভার তাদের (জমিদারদের) জন্য আয়ের এক লাভজনক উৎস ছিল। আজকের মতনই আঠারো শতকে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা বসত। বৃহৎ মেলাগুলির মধ্যে ছিল আলওয়াখোয়া, নেকমর্দ ও ঢালদিঘি মেলা। সেখানে বিহার থেকে বলদ ষাঁড়, পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ ও আসাম থেকে হাতি, পাঞ্জাব থেকে উটের পাল ও দুম্বা বেচাকেনা হত। দিনাজপুর, মালদুয়ার ও হরিপুরের জমিদারেরা নিজেদের মধ্যে মুনাফা ভাগ করে নিতেন।"[৪] কোন কোন মেলা পক্ষকালব্যাপী হয় যেমন চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার নবরত্ন বিহারের চৈত্র সংক্রান্তির মহামুনি মেলা।[৫] কোন কোন মেলা এক মাস স্থায়ী

হয়— যেমন চট্টগ্রামের রাউজান থানার মহামুনি বিহারের চৈত্রসংক্রান্তির মেলা।[৬] আবার কোন কোন মেলা দুই মাস কাল স্থায়ীও হত। এমন একটি মেলা ছিল বিক্রমপুরের রাজনগরের কালবৈশাখীর মেলা। এই মেলা চৈত্রসংক্রান্তির দিন শুরু হয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত চলত।[৭]

মেলা গলৈয়া নামেও পরিচিত

বিক্রমপুরে মেলাকে গলৈয়া বলে। রাজশাহী, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও বাকেরগঞ্জেও মেলাকে গলৈয়া বলে। চট্টগ্রামে বলে গড়ৈয়া বা গরিয়া।[৮] বাংলা ভাষায় এতদঞ্চলে গলৈয়া বা গড়ৈয়া শব্দটি আসতে পারে ইউরোপীয় তথা পর্তুগীজ ভাষার শব্দ 'গাল্যা' (Gala) থেকে যার অর্থ আনন্দ-উৎসব।[৯] কিংবা আসতে পারে আরবী ভাষার শব্দ 'গল্লা' থেকে যার অর্থ নগদ বিক্রি বা সারা দিনের বিক্রি।[১০]

মেলায় হরেক রকম জিনিস বেচাকেনা হয়

মেলার আয়োজন হয় সাধারণত মন্দির বা দরগা-সংলগ্ন কোন খোলা স্থানে। মেলায় স্থানীয় কৃষি ও কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যাদির বেচাকেনা হয়। বেচাকেনা হয় মাটির, কাঠের ও লোহার নানা রকম আকর্ষণীয় খেলার জিনিস ও তৈজসপত্র, রসগোল্লা-জিলিপি-বাতাসা-কদমা-তিল্লা, মুড়ি-মুড়কি-খৈয়ের তৈরী নানা ধরনের খাবার জিনিস, ফল-ফলার ইত্যাদি। জনসাধারণের আনন্দ দানের উপযোগী আয়োজনও কম থাকে না। তার মধ্যে নাচ, গান, নাগরদোলা আর সঙের অভিনয় থাকে। থাকে লাঠিখেলা, কুস্তি, হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্দা, বউছি, গোল্লাছুট প্রভৃতি গ্রামীণ খেলার প্রতিযোগিতা। মেলাস্থলে উন্মুক্ত মাঠে বা নদীর তীরে উড়ে রঙবেরঙের ঘুড়ি।

ঢাকাবাসীর ঐতিহ্যবাহী উৎসব ঘুড়ি ওড়ানো

চৈত্র সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানো ছিল পুরনো ঢাকাবাসীর একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। এই বিষয়ে মুনতাসীর মামুন লিখছেন, "চৈত্র সংক্রান্তিতে ঢাকার ঘুড়ি উড়ানো উৎসব ছিল বিখ্যাত। রমনার মাঠে ঘোড়ার রেস...মহল্লায় মহল্লায় হিজরা নাচ...। রেস ও হিজরা নাচ ছিল ঢাকার বাবু কালচারের অঙ্গ।"[১১] এই বিষয়ে ড. আশরাফ সিদ্দিকীও লিখেছেন, "চৈত্র সংক্রান্তির দিন পূর্বে ঢাকার নবাব বাড়িতে ঘুড়ি উড়ানো হত, পর দিন নববর্ষে বাসি খাওয়া হত— চৈত মে পাককা, বৈশাখ মে খাও, যোভি মাঙ্গো সোভি পাও অর্থাৎ পূর্ব বছরের রান্না এ বছর খেলে শুভ হবে।"[১২] ঢাকা শহরের আদিবাসীদের তথা ঢাকাইয়াদের তথা কুট্টিদের[১৩] ঘুড়ি ওড়ানো সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হাকীম হাবিবুর রাহমান লিখেছেন, "উড়বার বা উড়াবার প্রসঙ্গ যখন এসেই গেল তখন কানকাউয়া সম্পর্কেও

কিছু শুনে নিন, ঢাকা এতেও একটি বিশেষ পারদর্শিতা রাখে। কানকাউয়াকে এখানে ঘুড্ডি বলা হয় আর এটাই দিল্লী ও আগ্রার প্রাচীন শব্দ। সমগ্র ইন্ডিয়ার সঙ্গে এভাবে ব্যতিক্রম যে এখানে খালি হাতে ঘুড্ডি উড়ানো হয় না বরং বাঁশের অতি সুন্দর পাতলা আর নরম অবয়ব কিন্তু শক্ত চরকীর সাহায্যে ঘুড্ডি উড়ানো হয়। সেই চরকীসমূহকে নাটাই বলে।...ঢাকার ঘুড্ডি লাখনৌ-এর কানকাউয়ার মত হয় না। অর্থাৎ ঢাকাইয়াগণ প্রাচীন নমুনার ঘুড্ডি উড়িয়ে থাকেন এবং তারা লাখনৌ-এর সংশোধন ও সংস্করণ কখনও গ্রহণ করেন নি।...ঘুড্ডি সমগ্র শহরে যুবকেরা ও কিশোরেরা সচরাচর উড়াত। কিন্তু তার আনন্দ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেশী পাওয়া যায় যাকে এখানে হারিফী বলা হয়।...মনে রাখবেন যে ঢাকায় প্যাঁচ কাটা কোন কৃতিত্ব বলে বিবেচনা করা হত না।...প্রতিপক্ষের ঘুড্ডিকে নিজের ঘুড্ডি দিয়ে কোপ মেরে কিংবা সংঘর্ষ করে ছিঁড়ে ফেলা কৃতিত্বের পরিচয় বলে ধরা হত। যেহেতু ঘুড্ডি নাকের দিক দিয়ে ছিঁড়ে যায় সেই জন্য এটাকে এখানে নাক ঝো ঝো বলা হয়। জয় পরাজয়ের সিদ্ধান্ত এই নাক ঝো ঝোই করে থাকে। ...ঢাকায় ঘুড্ডি ছাড়া চাং, সাঁফ ও পাতাং উড়াবার সখ ছিল। পাতাং অনেক বড় ঘুড্ডিকে বলা হত। এবং চাং-এর আকৃতি এই ভাবে বুঝবেন যে দুই তৃতীয়াংশকে আরো টুকরা টুকরা অংশ জোড়া দিয়ে একটি বানানো হত। এটাও অনেক বড় হত। তাতে দুই হারা অর্থাৎ উপরে নীচে দুইটি কামানী হত। চাং আর পাতাং দুটোতেই ধ্বনি সৃষ্টি করার জন্য কারসাজি করা হত। সাঁফ সাপের মত হত।"[১৪]

নববর্ষে গরুর দৌড় প্রতিযোগিতা

পয়লা বৈশাখে নববর্ষ উপলক্ষে কোন কোন স্থানে আয়োজন হত গরুর দৌড় প্রতিযোগিতার। এই উপলক্ষে প্রাতঃকালে প্রত্যেক বাড়িতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই গরুগুলোকে স্নান করাতেন। গরুর সিং সিন্দুর দিয়ে রঞ্জিত করতেন। গরুর গায়ে মাটির খুরি দিয়ে পিঠাগুলির ছাপ দিতেন এবং গরুগুলোকে নিয়ে যেতেন প্রতিযোগিতায়। ড. এনামুল হকের ভাষায়, "নববর্ষের স্থানীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে গরুর দৌড়ও অন্যতম। এ অনুষ্ঠানটি এখন একরূপ লোপ পেয়েছে। মাত্র বছর চল্লিশেক আগেও ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে পয়লা বৈশাখে এ অনুষ্ঠান সমারোহ সহকারে উদযাপিত হত। যে সমস্ত জায়গায় গরুর দৌড় হত তথায় ছোটখাট মেলাও বসত। এদিন সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থেরা তাদের হালের গরুর গায়ে রঙের ছোপ দিয়ে গলায় কড়ির মালা পরিয়ে সাজাতেন এবং গরুগুলোকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেন।"[১৫]

উপরোক্ত তথ্যসমূহ থেকে তিনটি বিষয় নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব। আলোচনার বিষয় তিনটি হল :

১। নববর্ষে গরুর পরিচর্যা ও দৌড়,

২। চৈত্র সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানো,

৩। পয়লা বৈশাখে বাসি হওয়া শীতল খাবার খাওয়া।

পয়লা বৈশাখে গরুর পরিচর্যা ও দৌড়

বিক্রমপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ১লা বৈশাখের সকাল বেলা গৃহস্থেরা তাদের হালের গরুগুলোকে স্নান করিয়ে তাদের গায়ে রঙ-বেরঙের ছোপ দিয়ে গলায় কড়ির মালা পরিয়ে সাজাতেন এবং গরুর দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন।

বোহগ বিহু

দেখি এই অনুষ্ঠানের অনুরূপ নববর্ষের একটি অনুষ্ঠান আজও আসামে প্রচলিত আছে। পল্লব সেনগুপ্তের ভাষায়— "আসামের বোহগ বিহু আর বাংলা নববর্ষ ঠিক একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই বিহু অসমীয়াদের নববর্ষের উৎসব। এটি চরিত্রগতভাবে পুরোপুরিই উর্বরতা কেন্দ্রিক— নতুন বসন্তের ফুল, ফল, শস্য-সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে যে আনন্দোৎসব বা রঙ্গালী করা হয় তার প্রথম দিনটির নামই হল গোরু বিহু, চাষের জন্য নির্দিষ্ট গরু-মহিষের বিশেষ পরিচর্য্যার মাধ্যমে নতুন বছরের সূত্রপাত হচ্ছে।"[১৬] এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে অসমীয়াদের নববর্ষের উৎসব একটি কৃষি উৎসব। একটি উর্বরতাকেন্দ্রিক উৎসব। আমরা জানি উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারায় সূর্য ও গবাদিপশুর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এদের উভয়েরই পরিচর্যা হয়, অর্চনা হয়। আরাকানেও নববর্ষ উপলক্ষে গবাদি পশুকে গোসল করানো হয়, নতুন সাজে সাজান হয়, গলায় ফুলের মালা পরানো হয়।[১৭] এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নববর্ষে আরাকানী ও অসমীয়াদের গরুর বিশেষ পরিচর্যার অনুরূপ রীতি বিক্রমপুরে পালিত হওয়ার কারণ কী?

আমরা জানি, মোগল সম্রাট শাহজাহানের অধীনে করদ সামন্ত শরণার্থী মঙ্গৎ রায় (ওরফে নবাব বল্লাল) ও তার অনুচর আরাকানী ও তৈলংদের জায়গীর ছিল বিক্রমপুর তথা শ্রীপুর অঞ্চল।[১৮] তাই আরাকানী ও অসমীয়াদের অনুরূপ রীতি বিক্রমপুরেও প্রচলিত হতে পারে। কারণ :

১। অসমীয়া ও আরাকানীরা পরস্পর নিকটতম প্রতিবেশী এবং একই মোঙ্গল তথা চৈনিক ঐতিহ্যসম্পন্ন জাতিগোষ্ঠী। "The Ahoms were a branch of the Shan race, whose cradle was the hilly region lying north and east of Upper Burma. In the 13th century a prince of their ancient kingdom of Pong left his home with a band of adventurers, crossed the Patkoi range and established himself in the south east corner of the Brahmaputra Valley... The Ahoms were a hardy race of demon-worshippers, eating beef and fowl and drinking spirituous liquor, with the Burmese expertness in building stockades and bamboo-bridges, plying boats and making night attacks.

They were feudally organised under a number of noblemen... By the end of the 16th century the Ahoms became Hinduised, and fifty years later we find their kings adopting Hindu names. Their old social system still remained, and spirit-worship was still the groundwork of their faith."[১৯]

২। অসমীয়াদের মত আরাকানীরাও তিন দিনব্যাপী বিহু উৎসব উদযাপন করে এবং এই উৎসবই হল তাদের বার্ষিক বৃহত্তম সার্বজনীন আনন্দ উৎসব। রিয়াজুল হকের ভাষায়— "কক্সবাজার জেলার বৌদ্ধ-প্রধান এলাকাগুলোতে পয়লা বৈশাখে অনুষ্ঠিত হয় বিজু বা বিহু নামক উৎসব।"[২০]

এখন প্রশ্ন, নববর্ষে গরুর দৌড় কেন? আমরা জানি উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারায় যাদুতে প্রত্যয়ের ভূমিকাটা খুবই প্রবল।[২১] নববর্ষের দিন গরুর দৌড় প্রতিযোগিতার যে আচার পালন করা হয় তার মূল তাৎপর্য অবশ্যই যাদুনির্ভর বাসনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। বাসনা কী? বাসনা হল গরুর মালিক নতুন বছরের সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ধনশালী হবে।

বৌদ্ধ গরু জাতকের কাহিনী

এই আচারটি সম্ভবত বৌদ্ধ গরু জাতকের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অবশ্য বিক্রমপুরে টাকার থলির বদলে গরুর গলায় কড়ির মালা (কড়ি মুদ্রা, ধন ও ধনদেবী লক্ষ্মীর প্রতীক)[২২] পরানো হয়েছে। জাতকের কাহিনীটি এই, পুরাকালে বারানসী নগরে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব গরু হয়ে জন্মান। এক বুড়ির কাছে থাকতেন তিনি। বুড়ি তাকে খুব আদর-যত্ন করত। একবার এক বণিক পাঁচশ গরুর গাড়ী নিয়ে বাণিজ্যে চলেছে। কিন্তু গরুগুলো কিছুতেই একটা নদী পার হতে পারছে না। বোধিসত্ত্ব এক হাজার টাকা মজুরির বিনিময়ে এক এক করে পাঁচশ গাড়ীই পার করে দিলেন। বণিক প্রতিশ্রুতিমত এক হাজার টাকার একটা থলি বোধিসত্ত্বের গলায় ঝুলিয়ে দিল। তা নিয়ে বোধিসত্ত্ব সোজা এলেন বুড়ির কাছে। বুড়ি দেখল তার গরুর চোখ পরিশ্রমে লাল হয়ে গেছে। সারা গা থেকে ঘাম ঝরছে। তার কাছে হাজার টাকা দেখে বুড়ির একটু কষ্ট হল বটে তবে মন তার আনন্দে ভরে উঠল। তার পর গরুটিকে ভাল করে স্নান-খাওয়া করিয়ে চাঙ্গা করে তুলল।[২৩]

চৈত্র সংক্রান্তিতে ঘুড়ি-উড়ান এবং পয়লা বৈশাখে বাসি-হওয়া ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া

আমরা জানি, বিষুব সংক্রান্তির তথা চৈত্র সংক্রান্তির দিনটি কোন পুরাণ কিংবা স্মৃতি-অনুমোদিত শিব পূজার দিন নয়। এটি সূর্য পূজারই একটি বিশিষ্ট দিন। কারণ সূর্যই ঐ দিন দ্বাদশ রাত্রির ভ্রমণ শেষ করে পুনরায় সেই পথে নতুন যাত্রা শুরু করে।[২৪] আমরা

এটাও জানি যে আদিম সমাজের মানুষের নিকট সূর্য ছিল প্রজনন শক্তির প্রতীক। ফসল উৎপাদনের জন্য বৃষ্টির কামনায় এবং সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তারা সূর্যকে সন্তুষ্ট করতে চাইত। সে জন্য তারা বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকর্মের আশ্রয় নিত।[২৫] তাই সূর্য পূজার দিনটিতে আকাশে ঘুড়ি উড়ানো এবং অরন্ধন তথা রান্না-পূজার এই আচার দুটি যে প্রজনন শক্তির প্রতীক সূর্যকে তুষ্ট করার জন্য ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া এবং কোন প্রাচীন শস্যোৎসবের ধারানুবাহী তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নিশ্চয়ই নেই। এ ছাড়াও চৈত্র সংক্রান্তির দিনে অর্থাৎ সূর্যাবর্তনের শেষ দিনটিতে ঘুড়ি-ওড়া ও নাটাই-এর ঘূর্ণন সঞ্জাত যাদুর প্রভাব সূর্যকে চলমান করবে এটাও ছিল আদিম মানুষের ঘুড়িওড়ানো ও নাটাই ঘুরানোর পেছনে বিশ্বাস।

ঐতিহ্যবাহী চীনা লোক উৎসব কীংমিং

শস্য উৎসব উপলক্ষে ঘুড়ি উড়ান এবং আগের দিন রেঁধে-রাখা ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার রীতি একটি ঐতিহ্যবাহী লোক উৎসবের মধ্যে দেখি। কীং মিং বা উজ্জ্বল আলোর পরব চীনে খ্রীষ্টপূর্ব আমল থেকে প্রচলিত আছে। এই উৎসবটি মূলত বসন্তের আবির্ভাবে নতুন করে পৃথিবী উজ্জ্বলতা, উত্তাপ ও শ্যামলতায় পূর্ণ হবার উপলক্ষে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির এই পুনর্জন্ম আর পূর্বপুরুষের আত্মার পরিতৃপ্তিকে সমীকরণ করে গড়ে ওঠা একটা ভাবনাই এই উৎসবের আদি উৎসে ছিল। নানান জীবজন্তুর আকারে হালকা কাঠের (উত্তরকালে কাগজের) ঘুড়ি তৈরী করে ঐ বিশেষ দিনটিতে ওড়ানোর তাৎপর্য ছিল সম্ভবত এটাই যে প্রয়াত পিতৃপুরুষেরা ঐ সব প্রতীকী প্রাণীদের বাহনরূপে গ্রহণ করে মর্ত্যলোকে ফিরে আসবেন তাদের উত্তর- পুরুষদের সুখ-সমৃদ্ধি দেখে সুখী হওয়ার জন্য। রান্নাঘরের এক অধিদেবতারও কল্পনা করা হত প্রাচীন চীনে। এর পূজারও একটা নির্দিষ্ট দিন ছিল, যে দিন মনে করা হত, ঐ দেবতা সুরলোকে যাবেন গৃহস্থের সকল সমাচার তার পিতৃপুরুষদের কাছে পৌঁছে দিতে।

চীনা রান্না ঘরের এক অধিদেবতা

রান্নাঘরের এই অধিষ্ঠাতা দেবতাই আগুনের আবিষ্কার করেন।[২৬] একটি চৈনিক লোকপুরাণে আছে সূর্যের সৃষ্টি গাও সিনশি নামে এক দৈত্যের হাতে। তিনি একদা কিছু পাইন ডাল জড়িয়ে একটি গোলক তৈরী করেন। তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে শূন্যলোকের মাঝখানে ঝুলিয়ে দেন। সেই জ্বলন্ত অগ্নির গোলাটিই সূর্য।[২৭] অন্যান্য দেশের লোকপুরাণেও দেখা যায় সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন।[২৮] আসলে সূর্যপূজার দিনে আগুনকে স্বয়ং দেবতাতুল্য বলে ধার্য করার একটা মানসিকতা ভাবনার গভীরে থাকে বলেই ঐ তিথিতে নিজেদের সেবার প্রয়োজনে আগুন জ্বালান ট্যাবু বা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে। আচার হল অরন্ধনের আগের রাত্রে সব রান্না সেরে চুলা নিভিয়ে রাখা।[২৯]

নবাব বল্লাল ও ঢাকার কুট্টি জনগোষ্ঠী

ঢাকা শহরে এবং ঢাকার নবাববাড়িতে চৈত্র সংক্রান্তিতে ঘুড়ি ওড়ানো এবং নববর্ষে বাসি-হওয়া ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার পেছনে এই চৈনিক ধর্মবিশ্বাস ও আচারগুলো থাকা খুবই স্বাভাবিক। কারণ চৈনিক ঐতিহ্যের ধারক-বাহক-পৃষ্ঠপোষক শরণার্থী রাজা মঙ্গৎ রায় (ওরফে নবাব আবুল ওরফে মহারাজা বল্লাল) ও তার শত সহস্র আরাকানী ও মন অনুচর ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরে (শহর হিসেবে যার শুরু সবেমাত্র ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে)[৩০] এসে আশ্রয়প্রার্থী হন। মঙ্গৎ রায় তার সমস্ত পরিবার ও অনুচরসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মোগল সম্রাটের নিকট থেকে মনসব ও জায়গির লাভ করেন এবং নিজেকে মোগল সম্রাটের একজন সামন্ত রাজা বলে ঘোষণা করে তারই অধীনতায় ঢাকায় থেকে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এমতাবস্থায় মহারাজা মঙ্গৎ রায় ওরফে নবাব আবুলের সঙ্গে ঢাকায় আগত ধর্মান্তরিত মগ মুসলমান অনুচরেরা সঙ্গত কারণেই নবাবের লোক বলে অভিহিত হন। সে কারণেই ঢাকা শহরের আদিবাসী বলে পরিচিত ঢাকাইয়া কুট্টিরা[৩১] (যারা বহিরাগত ধর্মান্তরিত মুসলমানদের উত্তর পুরুষ[৩২], দুর্বোধ্য বাংলা বুলিতে কথা বলেন[৩৩] এবং প্রাচীন ভারতীয় পঞ্চায়েত প্রথা[৩৪] মেনে চলেন)[৩৫] নিজেদের পূর্বপুরুষদেরকে নবাবের লোক বলে দাবী করেন। এই দাবী যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত সে কথা অস্বীকার করা যাবে না কোনক্রমেই। এখানে উল্লেখ থাকে যে সমগ্র আরাকান তথা মগ জাতি দুটি বড় বড় গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একটি কিউট্ট। অন্যটি টউট্ট। কিউট্টরা প্রধানত কৃষিজীবী। টউট্টরা শিকারজীবী। কিউট্টদেরকে মগ জাতির আদর্শ বলে গণ্য করা হয়।[৩৬] এরা বিকৃত বর্মী বুলিতে কথা বলে।[৩৭] ঢাকা শহরে বসবাসকারী কুট্টিরা আসলে শরণার্থী মগ রাজা মঙ্গৎ রায় (ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল)-এর অনুচর মগ কিউট্টদেরই দেশত্যাগী অংশ, যারা ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা শহরে এসে আশ্রয়প্রার্থী হন এবং এই 'কিউট্ট'ই বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে কুট্টি হয়ে যায়।

অধ্যায় ২৫

বাংলা সন দ্রুত চালু হওয়ার কারণ

বাংলা সন দ্রুত চালু হওয়ার কারণ, বাংলা সন মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ সকলেরই গৌরবের স্মৃতিস্তম্ভ।

বল্লালী দারিদ্র

ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় এই শরণার্থীরা আর কখনও আরাকানে ফিরে যেতে পারেন নি। ফলে যদিও প্রথমে তারা এসেছিলেন সাময়িকভাবে তবু তাদের এই আগমন পরিণত হয় প্রত্যাবর্তনহীন এক যাত্রায় এবং তারাও পরিণত হন এই অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীতে। এমতাবস্থায় মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল যে মোগল সম্রাট শাহজাহানের মনসবদার-জায়গিরদার-করদ রাজা হয়ে সম্রাট শাহজাহান, যুবরাজ দারা শিকোহ ও শাহজাদা সুলতান শাহ সুজা এবং এই দেশবাসীর হৃদয় জয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকার স্থায়ী করতে প্রয়াসী ছিলেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই।[৩৮] এই হৃদয় জয়ের জন্য সুকৃতির দ্বারা তাকে অবশ্যই হতে হয়েছিল অপরিমিত ব্যয়শীল। তার অপরিমিত ব্যয়শীলতা সম্পর্কে গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, "বল্লাল সেন যেরূপ প্রতাপশালী ছিলেন তেমনি ছিলেন অমিতব্যয়ী। তাহার রাজ্যের আয় ছিল এক কোটি বিশ লক্ষ।...এই উপস্বত্ব থাকা সত্ত্বেও অপরিমিত ব্যয়শীলতার জন্য তাহার কোন সময়েই অভাব মিটিত না। তাহার এই অনুচিত, অতিরিক্ত ব্যয়জনিত দারিদ্র্য 'বল্লালী দারিদ্র্য' আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল।"[৩৯]

বল্লালী ক্রিয়া

'রাজা সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র অধিপতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের পরম পৃষ্ঠপোষক' এই ঐতিহ্য ও বিশ্বাস নিয়ে তান্ত্রিক ধর্মের পরম অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক

রাজ্যহারা বাদশাহ মঙ্গৎ রায় ঢাকায় এসে আশ্রয়প্রার্থী হন। শরণার্থী আরাকানরাজ মঙ্গৎ রায় ও তার হাজার হাজার মগ অনুচর তাদের মিশ্রস্থাপত্য-রীতি, মিশ্রধর্ম, মিশ্রদেবদেবী, তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি বিশেষ করে মহাদেবীর পূজাপদ্ধতি, সূর্যপূজা, বুদ্ধপূজা, কৃষ্ণলীলা, জন্মাষ্টমী-মুহররম-ঈদের মিছিল, রাস, ঝুলন, দোল, নববর্ষ, চৈত্র সংক্রান্তি, হালখাতা, মেলা, যাত্রা, ঘোড়ার দৌড়, মোরগের লড়াই, জুয়া, রাজকীয় ভূমিকর্ষণ অনুষ্ঠান, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের পোষকতা ইত্যাদির ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ঢাকায়। মঙ্গৎ রায় ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল মোগল সম্রাটের করদ রাজা হয়ে তার হাজার হাজার মগ অনুচর সমেত ঢাকায় স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করেন। ফলে সঙ্গত কারণেই স্থানীয় জনগণের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় দেখি তিনি এবং তার মগ অনুচরেরা মিলে ঢাকাকে কেন্দ্র করে জনবিরল ও পতিত নিম্নবঙ্গ তথা পূর্ববঙ্গকে জনবহুল ও আবাদী করে তোলেন, নিম্নবঙ্গে নতুন নতুন গ্রাম ও জনপদ গড়ে তোলেন এবং এখানে বিভিন্ন উৎসব-মিছিল-মেলা-যাত্রা প্রভৃতির প্রচলন করেন, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে অবাধে পূর্ণ প্রসার পায়। দেখি মঙ্গৎ রায় ওরফে বল্লাল রাজা বাংলার তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতে এত ব্যাপক প্রভাব ফেলেন যে বাংলার 'তান্ত্রিকী ক্রিয়া' বল্লাল রাজার নামে 'বল্লালী ক্রিয়া'[৪০] আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে যায়।

বল্লালী আমল বঙ্গের হিন্দুর ইতিহাসে স্বর্ণযুগ

মহারাজা বল্লাল (ওরফে মঙ্গৎ রায়) অতিশয় জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। তার মত এত জনপ্রিয় ও প্রজাহিতৈষী রাজা বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় একজন নেই। ফলে তিনি কিংবদন্তীর চরিত্রে পরিণত হন। বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যথার্থই বলেছেন, "বল্লাল সেনের মত এত পরিচিত কোন হিন্দু রাজা নাই। বল্লালের ইতিহাস বাদ দিলে বঙ্গের হিন্দুর ইতিহাসে কিছু থাকে না। আর সেই বল্লালী ইতিহাসের নির্য্যাস এই আভিজাত্য (কৌলিন্য)।"[৪১] বল্লাল রাজার আমলের অতুল কীর্তির কথা বিবেচনা করে তার আমলকে বঙ্গের হিন্দুর ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা যায়।

ইতিহাস বিকৃতির শিকার হন নবাব বল্লাল

অথচ পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে আধুনিককালে হিন্দু পুনর্জাগরণের সময়ে বঙ্গের হিন্দুদের নিকট এই গৌরবজনক বল্লালী আমলের ইতিহাসকেই (অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যযুগের ইতিহাসকেই) মনে হয়েছে লজ্জাজনক। ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "বাংলার নবজাগরণ দেখা দিল হিন্দু সমাজকে আশ্রয় করে। কিন্তু অচিরেই এই নবজাগৃতি রূপ নিল হিন্দু পুনর্জাগরণের। তখন প্রাচীন ভারতের ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপরে জোর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মানসে তার অতীত সমৃদ্ধি ও বর্তমান উন্নতির তুলনায় মধ্যযুগের ইতিহাসকে মনে হল লজ্জাজনক।"[৪২] এমতাবস্থায় সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে

পারে, বাংলার মধ্যযুগের তথা বল্লালীযুগের গৌরবময় ইতিহাসকে বঙ্গের হিন্দুদের নিকট লজ্জাজনক মনে হল কেন?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে কোন কীর্তিমান ও জনপ্রিয় শাসকের পতনের পর স্বার্থবাদী ও কুচক্রী মহল ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত, প্রাদেশিক, দলগত ইত্যাকার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে তার স্মৃতি জনগণের মন থেকে মুছে ফেলার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য বিকৃতির আশ্রয় নেয়, কীর্তিমান শাসকের অমর কীর্তিসমূহকে নিজেদের কীর্তি বলে প্রচার করে এবং তা ভবিষ্যত প্রজন্মকে বিশ্বাস করানোর জন্য যুক্তি দাঁড় করায়, নতুন করে ইতিহাস নিজেরা লেখে কিংবা লেখায় ভাড়াটে লেখক দিয়ে। দুঃজনক হলেও সত্যি যে কীর্তিমান বল্লাল রাজার (ওরফে আবুল রাজার ওরফে মুকুট রাজার ওরফে ধরম সার ওরফে মঙ্গৎ রায়ের) ক্ষেত্রেও স্বার্থবাদী ও কুচক্রী মহল তা-ই করেছিল। তারা নবাব বল্লালের নাম-নিশানা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চালায় ব্যাপক ও বিধিবদ্ধভাবে। এই উদ্দেশ্যে বল্লাল রাজার (ওরফে মঙ্গৎ রায়ের) অতুল কীর্তিরাজিকে তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কালের বিভিন্ন ব্যক্তির কীর্তি বলে চালিয়ে দেয়।

মলহনের পুত্র বল্লাল রাজার কোন কোন কীর্তিকে (যেমন কৌলিন্য প্রথা, সন বলালি ইত্যাদি) চালিয়ে দেয় বাংলার সেন রাজবংশের রাজা বিজয় সেনের পুত্র রাজা বল্লাল সেনের কীর্তি হিসেবে। আর এই সব তথ্য সমর্থনের জন্য ব্যাপক ও বিধিবদ্ধভাবে কুলগ্রন্থ (বল্লালী কুলীনদের বংশাবলী ও ইতিহাস) জাল করা হয় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাচীনীকৃতও করা হয়। হিন্দু পণ্ডিতদের ইতিহাস বিকৃতি ও জালিয়াতি সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক আনিসুল হক চৌধুরী লিখেছেন, "এই তো গেল, একদিকে ইংরেজ কর্তৃক এতদ্দেশের ইতিহাস বিকৃত করিয়া মিথ্যা ইতিহাস রচনার কথা। অপরদিকে, দাদের উপর বিষ ফোড়ার মত এতদ্দেশের হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজও সক্রিয় হইয়া উঠিল। ইংরেজের দেখাদেখি এতদ্দেশের হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ ইংরেজেরও এক ধাপ উপরে উঠিয়া বিভিন্ন পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়া উহাদের বয়স গোপন করিবার জন্য রচনার দিন তারিখ উল্লেখ না করিয়া তম্মধ্যে তাহাদের মনগড়া মুসলমান যুগের পূর্ববর্তী এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অতীব কাল্পনিক মিথ্যা বিবরণ দিয়া ইংরেজের উপরেও টেক্কা মারিয়া এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিল। ঐ সমুদয় পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থে রচনার দিন তারিখ উল্লেখ না থাকায় উহাদের বয়স গোপন থাকায় ঐ সমুদয় গ্রন্থ যে ইংরেজের দেখাদেখি ইংরেজ আমলেই রচিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না।"[৪৩]

বাংলা সন দ্রুত চালু হওয়ার কারণ

দেখি প্রধানত দুটি কারণে বাংলা সন দ্রুত চালু হয়ে যায়। প্রথমত, বাংলা সনকে এর প্রবর্তক হালখাতা ও পুণ্যাহর মাধ্যমে বাঙালীর উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করায় এই সন সমাজব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। ফলে সনটি

ব্যাপকভাবে চালু হয়। দ্বিতীয়ত, বাঙালীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জগৎকে অর্থাৎ পূজা-পার্বণ-উৎসব-মেলাকে বাংলা সনের প্রবর্তক এই সনের অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলায় বাংলা সন বাঙালীর নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। ফলে বাংলা সন দ্রুত চালু হয়ে যায়।

বাংলা সনে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে

উপসংহারে আমরা অকপটে বলতে পারি, বঙ্গদেশ যেমন হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান ধর্মাবলম্বীর গৌরবস্থল বাংলা সনও তেমনি এই তিন ধর্মানুসারীরই গৌরবের একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এই তিন ধর্মের মূল্যবান উপাদানেই বাংলা সনের দেহ গঠিত। অর্থাৎ বাংলা সনে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ঐতিহ্যের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। বাংলা সনে চান্দ্র হিজরী সনের ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতীয় সৌর সনের বৈজ্ঞানিকতা যুক্ত হয়েছে। এই সনের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধের দিন ও মাসগুলো আছে। আছে বর্ষ শুরুর মাস হিসেবে ভগবান বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত পবিত্র বৈশাখ মাস। আছে সূর্যপূজার অনুষঙ্গ চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক উৎসব। আছে মগ রাজাদের নববর্ষের খাতা উৎসব। আর আছে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) মদীনা গমন, হিজরী সন ও মোগল সম্রাট মহামতি আকবরের সিংহাসনারোহণ। সমন্বয়মূলক ধর্মে বিশ্বাসী বাদশাহ মঙ্গৎ রায় (ওরফে মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল) ও তার অনুচরেরা মিলে আরাকানের আদলে যে অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়বাদী জীবনধারা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বঙ্গদেশে তার সঙ্গে বাংলা সনের মৌল ধারণার পরিপূর্ণ মিল আছে। মহাদেবী দুর্গা (তথা চণ্ডী/মাউ/উমা)-র মত[৪৪] বাংলা সনও বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত কৌমপ্রধান বাঙালী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, দিয়েছে জাতীয় চেতনা ও গৌরব বোধের এক অনন্য শক্তি।

তথ্যনির্দেশ

১। দৈনিক সংবাদ : ১৬-৪-১৯৮৫ : পহেলা বৈশাখ : জুবায়ের জার্জিস।
২। ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে : হাশেম সূফী : পৃঃ ১১৯-১২০।
৩। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : পৃঃ ২৫।
৪। দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য : পৃঃ ১৫৩।
৫। বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন : পৃঃ ১৯৫-১৯৬।
৬। প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৮৫-১৮৬।
৭। বিক্রমপুর : ১ম খণ্ড : হিমাংশু : পৃঃ ৩১৩-৩২৬।
৮। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান : (ক-জৈ) : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : পৃঃ ১৮১, ১৮৫।
৯। SAMSAD English-Bengali Dictionary : P. 446.
১০। আধুনিক বাংলা অভিধান : মোসলেম উদ্দিন : পৃঃ ২৩৮।

১১। বাংলাদেশের উৎসব : মামুন : পৃঃ ৪২।
১২। বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য : পৃঃ ৫১।
১৩। স্মৃতিময় ঢাকা : মামুন : পৃঃ ২৮-৪৩; ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে : পৃঃ ৪৫, ৮৫, ১০০; Glimpses of old Dhaka : PP. 52-53.
১৪। ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে : পৃঃ ১০৬-১০৭।
১৫। বইয়ের খবর (ত্রৈমাসিক পত্রিকা) : ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা : জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮২: পৃঃ ১৩।
১৬। পূজা পার্বণের উৎসকথা : পৃঃ ৭১।
১৭। দৈনিক জনকণ্ঠ : ১ বৈশাখ ১৪০৫ : নববর্ষ উৎসব : সঞ্জীব দ্রং : পৃঃ ১৫।
১৮। বিক্রমপুরের নবাব বল্লাল সেন ও ঢাকেশ্বরী মন্দির : পৃঃ ১০১-১০৬।
১৯। History of Aurongzeb : Vol. III : PP. 97-99.
২০। বাংলাদেশের উৎসব : রিয়াজুল হক : পৃঃ ৩৮।
২১। পূজা পার্বণের উৎসকথা : পৃঃ ৭৪।
২২। পূজা পার্বণের উৎসকথা : পৃঃ ৫৮, ১১৭; ইতিহাস ও ঐতিহাসিক : তরফদার: পৃঃ ১৩৮।
২৩। সেভেন ইণ্ডিয়ান ক্লাসিকস : পৃঃ ৩৬৭।
২৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পৃঃ ৬৫১-৬৫২।
২৫। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক : তরফদার : পৃঃ ১৭৩।
২৬। পূজা পার্বণের উৎসকথা : পৃঃ ৯৯-১০০।
২৭। সূর্যবাদ : আতোয়ার : পৃঃ ৯৬।
২৮। প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৫।
২৯। পূজা পার্বণের উৎসকথা : পৃঃ ১০০।
৩০। মোগল রাজধানী ঢাকা : আব্দুল করিম : বাংলা একাডেমী : ১৯৯৪ : ঢাকা: পৃঃ ১০, ২৩।
৩১। ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে : পৃঃ ২০-২১; Glimpses of old Dhaka : P. 52.
৩২। স্মৃতিময় ঢাকা : মামুন : পৃঃ ২৯, ৩১।
৩৩। Glimpses of old Dhaka : PP. 52, 165 : "The Kuttis of Dhaka talk a peculiar Bengali Jargon which makes them the object of humour to other Bengalis."
৩৪। বাঙালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : পৃঃ ৫০; বাংলা বিশ্বকোষ : ৩য় খণ্ড : মুক্তধারা: পৃঃ ৬১৫।
৩৫। স্মৃতিময় ঢাকা : মামুন : পৃঃ ২৮-৪৩।
৩৬। JASB : Vol. XV : 1846 : PP. 60-61.
৩৭। A History of South East Asia : D.G.E.Hall : P. 328.
৩৮। বিক্রমপুরের নবাব বল্লাল সেন ও ঢাকেশ্বরী মন্দির : পৃঃ ৬৯-৭১।
৩৯। বৃহৎ বঙ্গ : ১ম খণ্ড : দীনেশচন্দ্র সেন : ১৩৪১ : কলিকাতা : পৃঃ ৪৮৫।
৪০। বিক্রমপুর : ২য় খণ্ড : হিমাংশু : পৃঃ ২০০-২০২।
৪১। বিক্রমপুরের ইতিহাস : ১ম খণ্ড : যোগেন্দ্রনাথ : পৃঃ ২৫৯।
৪২। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য : আনিসুজ্জামান : পৃঃ ৩৮৬।
৪৩। বাংলার মূল : আনিসুল হক চৌধুরী : ১৯৯৫ : ঢাকা : পৃঃ ১৬৭।
৪৪। বাংলাদেশের উৎসব : মামুন : পৃঃ ১৯, ৮২-৮৫; বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস : এম. এ. রহিম: ১৯৮৫ : ঢাকা : পৃঃ ৮৩-৮৪, ১১৬; ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে : পৃঃ ৩৩-৩৬।

অধ্যায় ২৬

চিত্র

রেনেল-কৃত (১৭৬৪-৭৬) বাংলার ভূমি ও নদনদী নকশা।

ফন ডেন ব্রোক-কৃত (১৬৬০) বাংলার ভূমি ও নদনদী নক্‌শা।

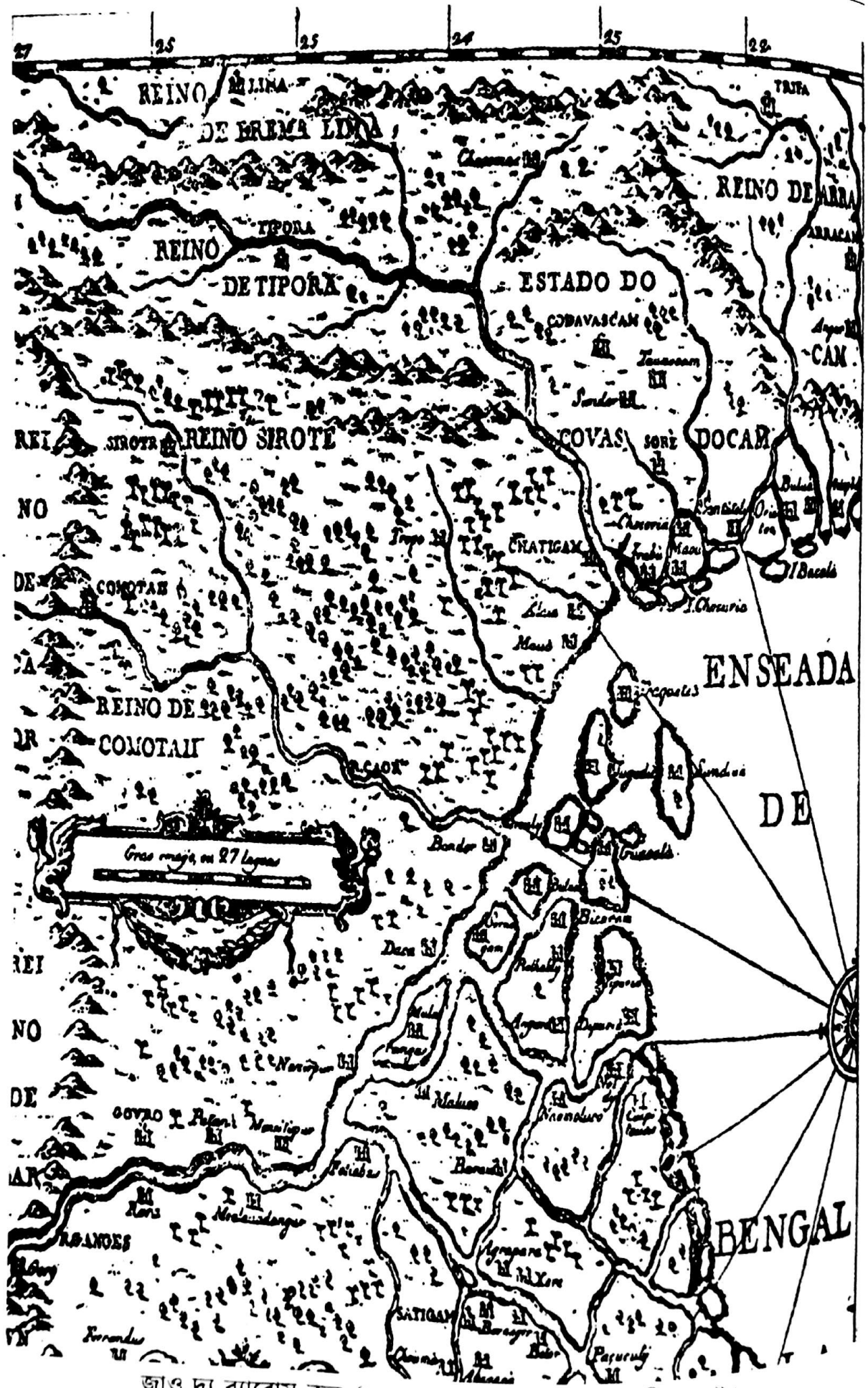

জাও দ্য ব্যারোস-কৃত (১৫৫০) বাংলার ভূমি ও নদনদী নক্‌শা।

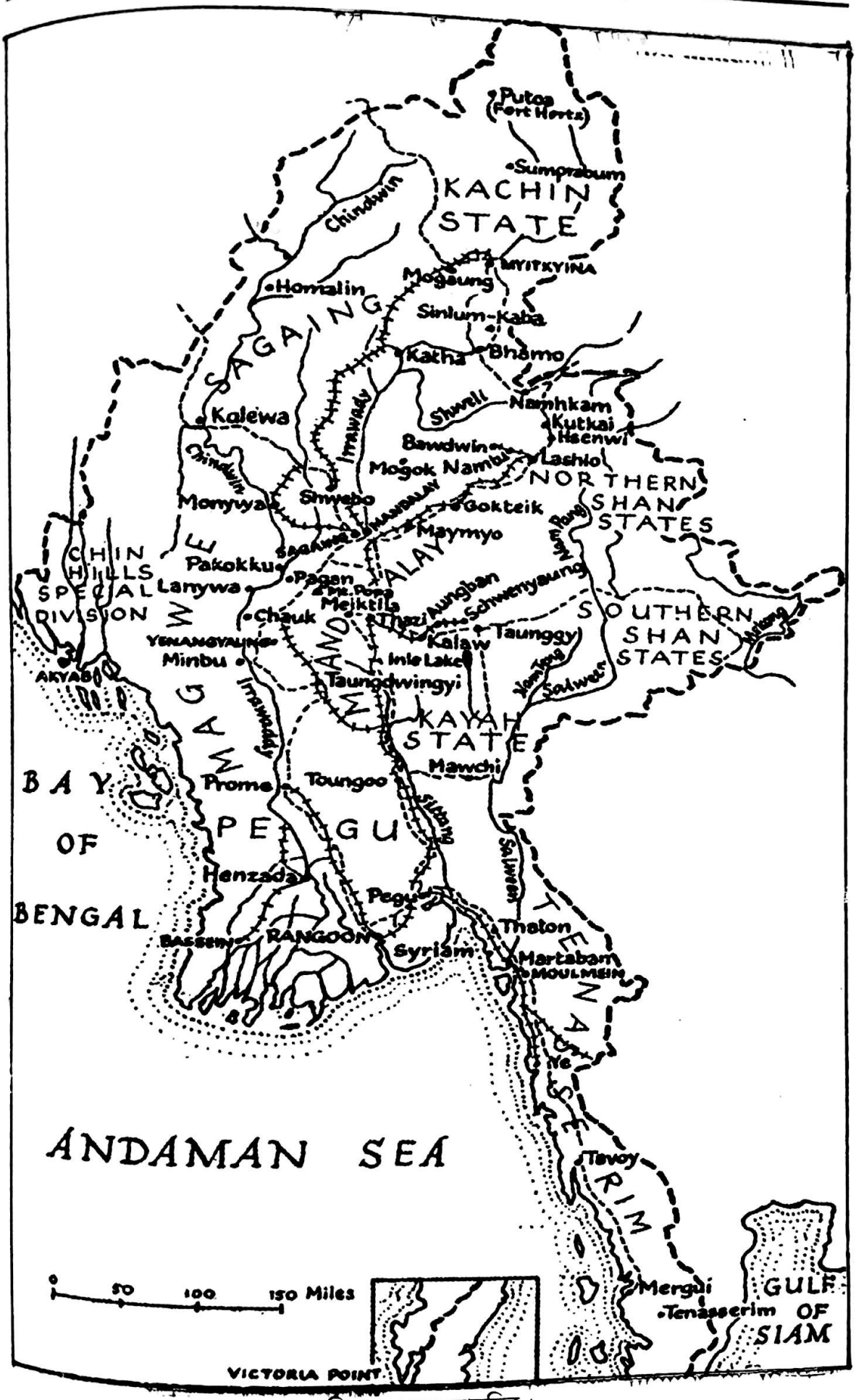

মিয়ানমারের মানচিত্র।

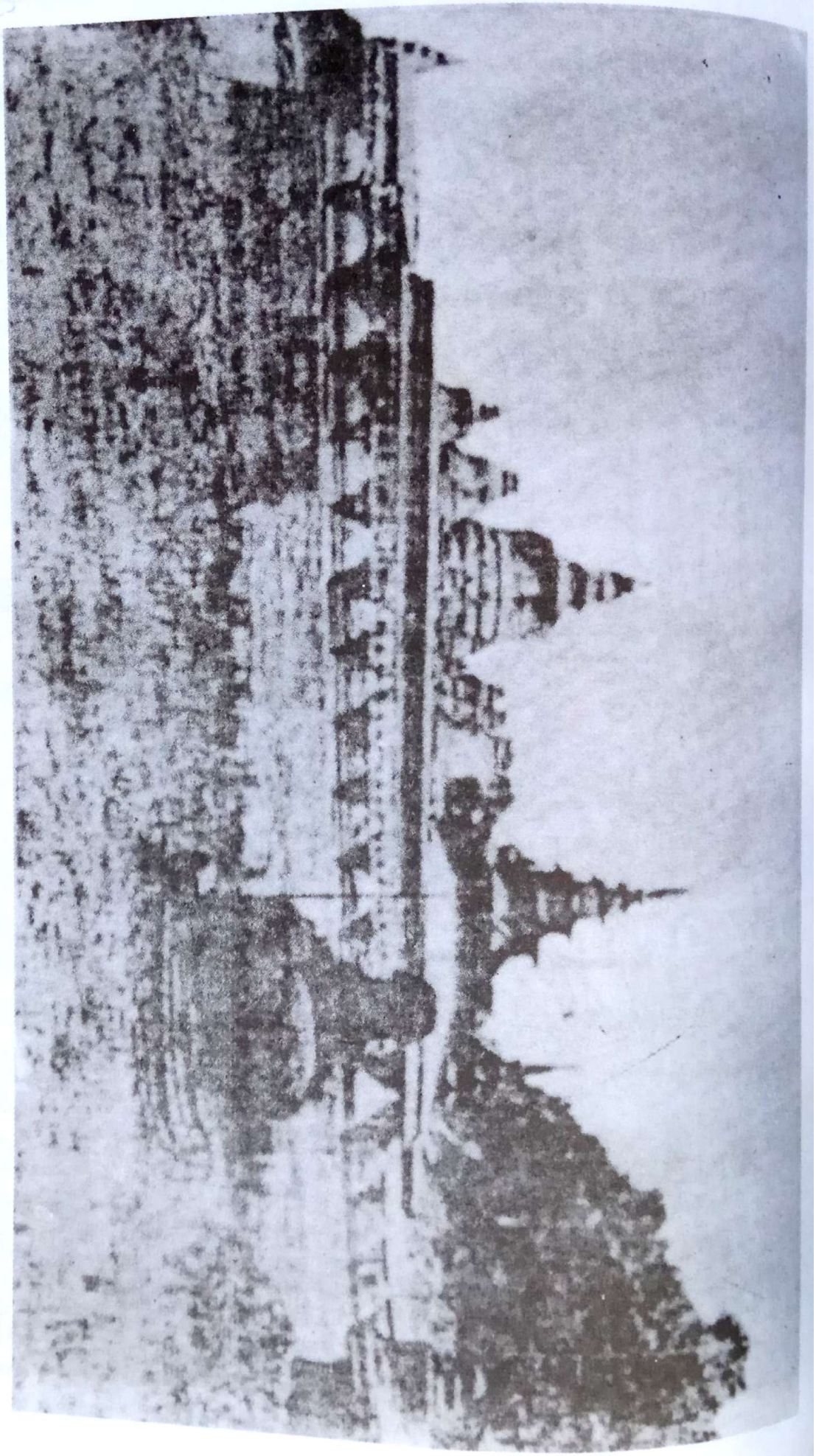

আরাকান রাজধানী মোহাউং-এর ছিত্তাওং প্যাগোডা।

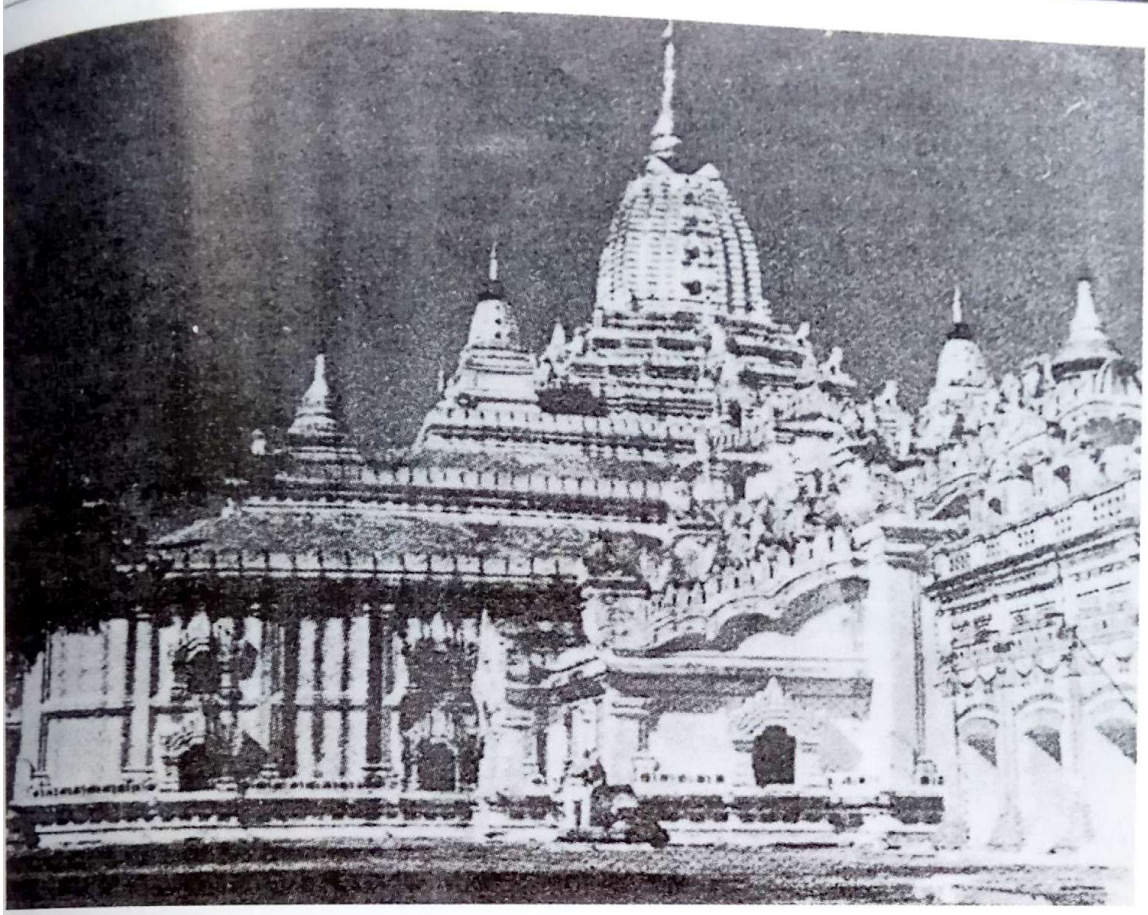

মিয়ানমারের আনন্দ প্যাগোডা।

মিয়ানমারের পরিখা ও প্রাচীরবেষ্টিত একটি প্রাচীন রাজপ্রাসাদ।

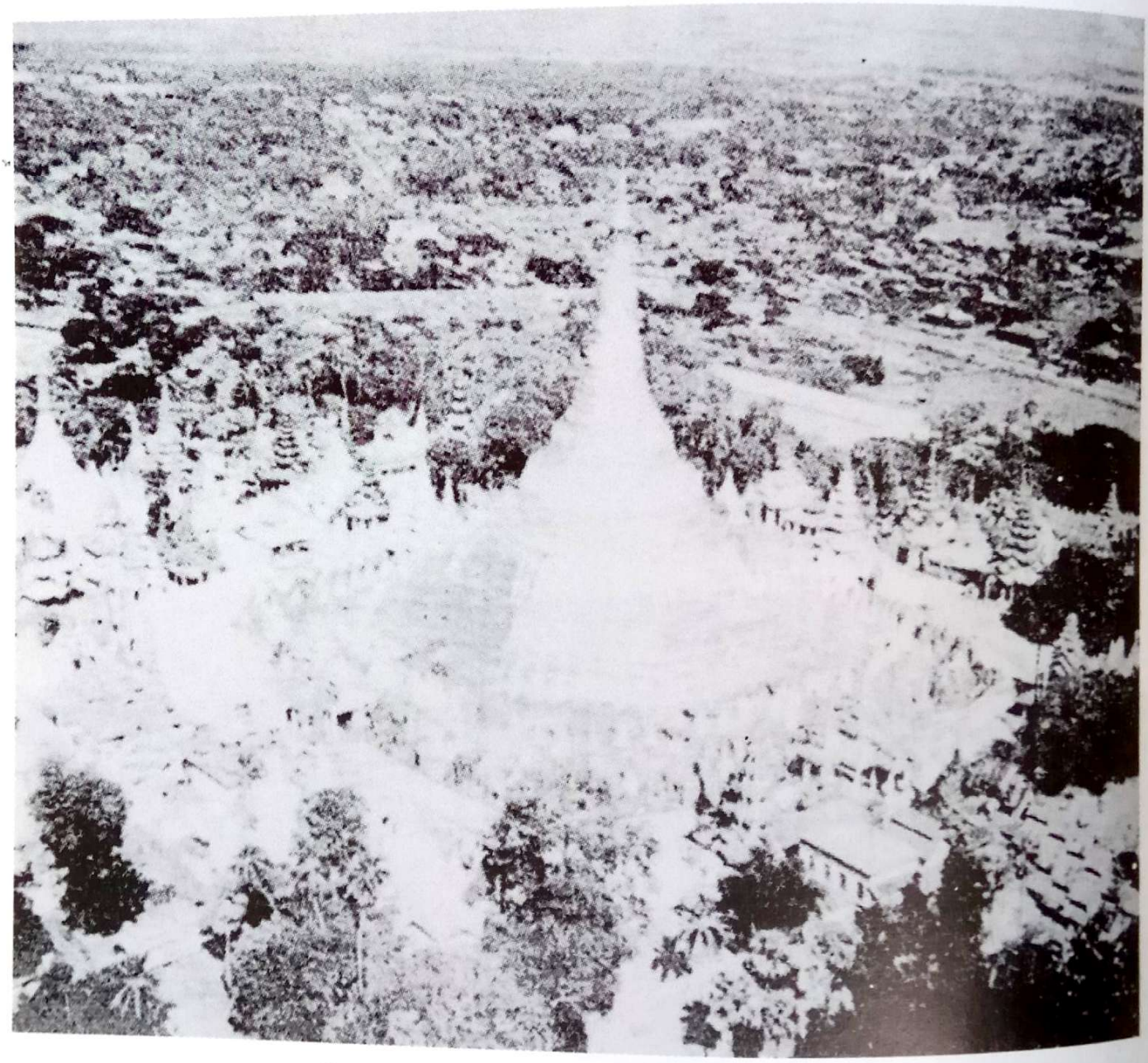

মিয়ানমারের সোয়েজিগন প্যাগোডা।

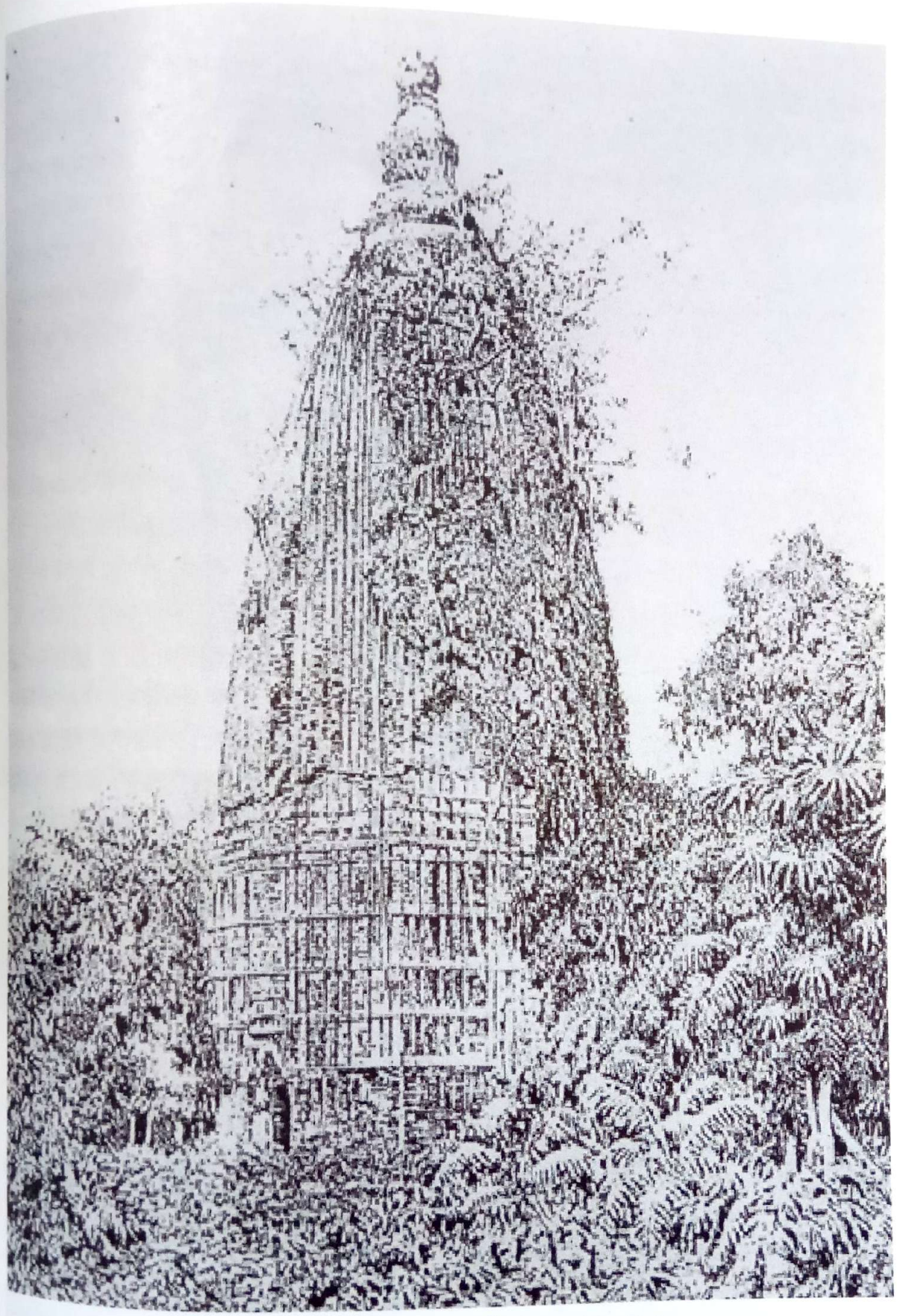

রাজাবাড়ির বিখ্যাত চান্দা মিঞার প্যাগোডা।

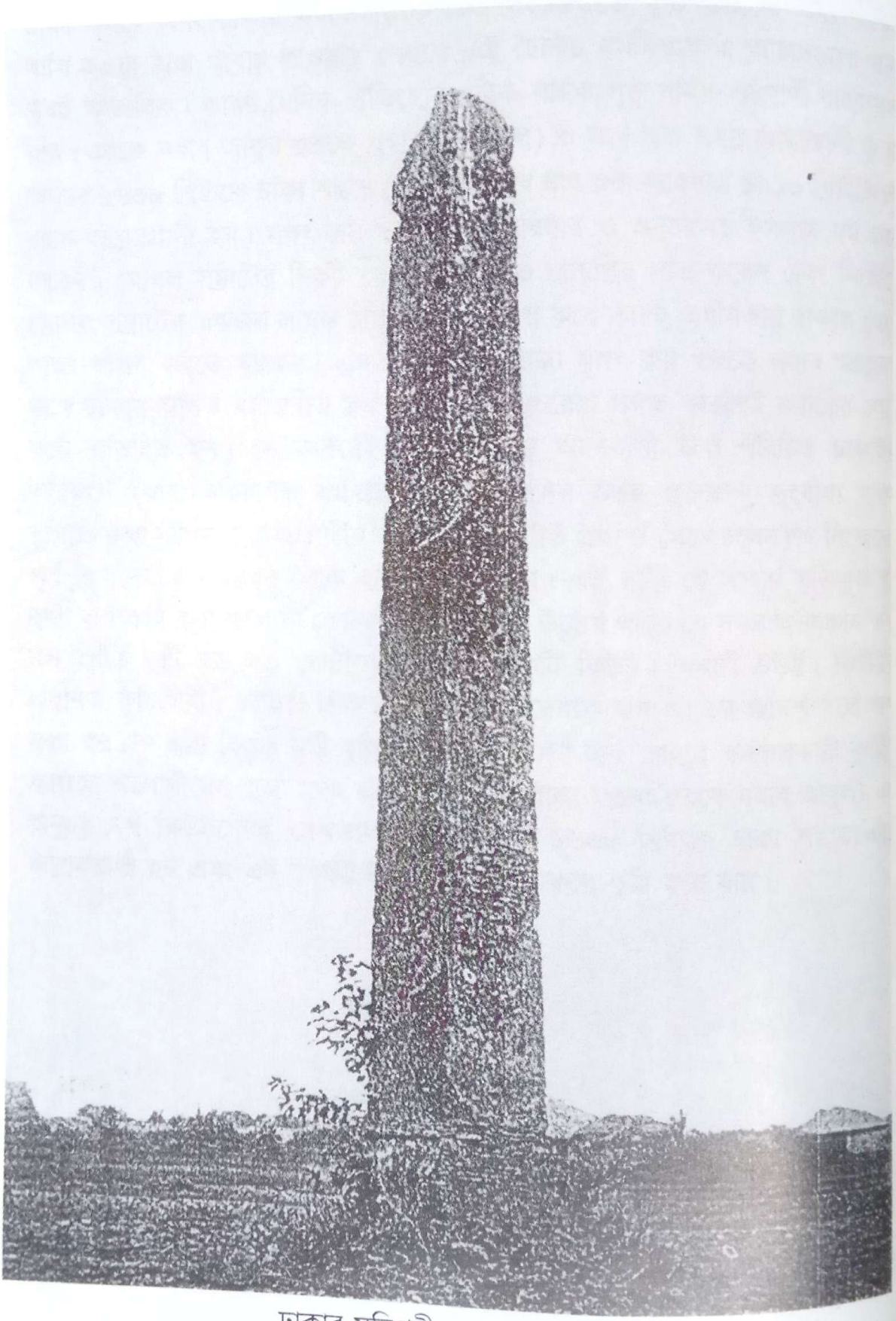

ঢাকার মনিপুরী পাড়ার মগ স্তম্ভ।

রামপাল থেকে প্রাপ্ত কাঠের ১নং স্তম্ভের ১নং পৃষ্ঠ

রামপাল থেকে প্রাপ্ত কাঠের ১নং স্তম্ভের ২নং পৃষ্ঠ

রামপাল থেকে প্রাপ্ত কাঠের ১নং স্তম্ভের ৩নং পৃষ্ঠ

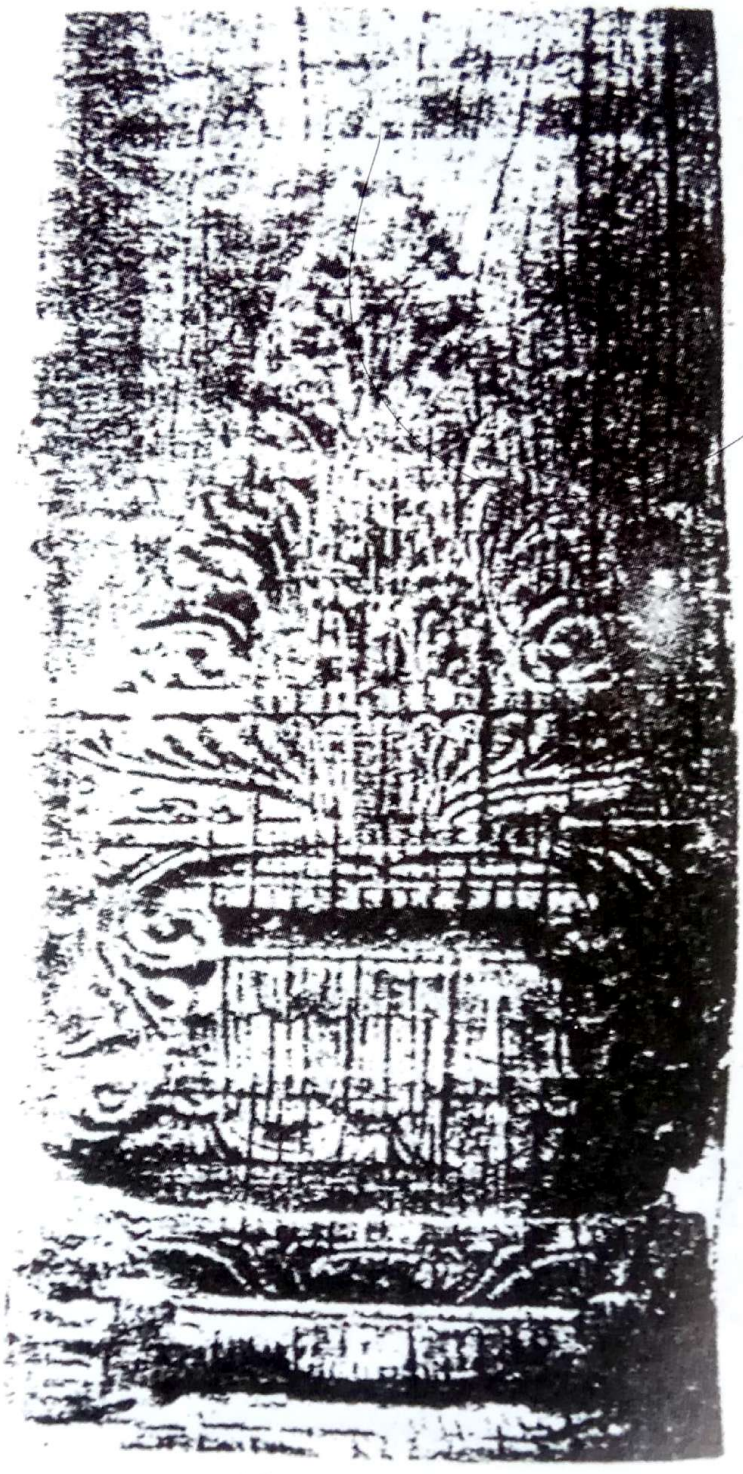

রামপাল থেকে প্রাপ্ত কাঠের ১নং স্তম্ভের ৪নং পৃষ্ঠ

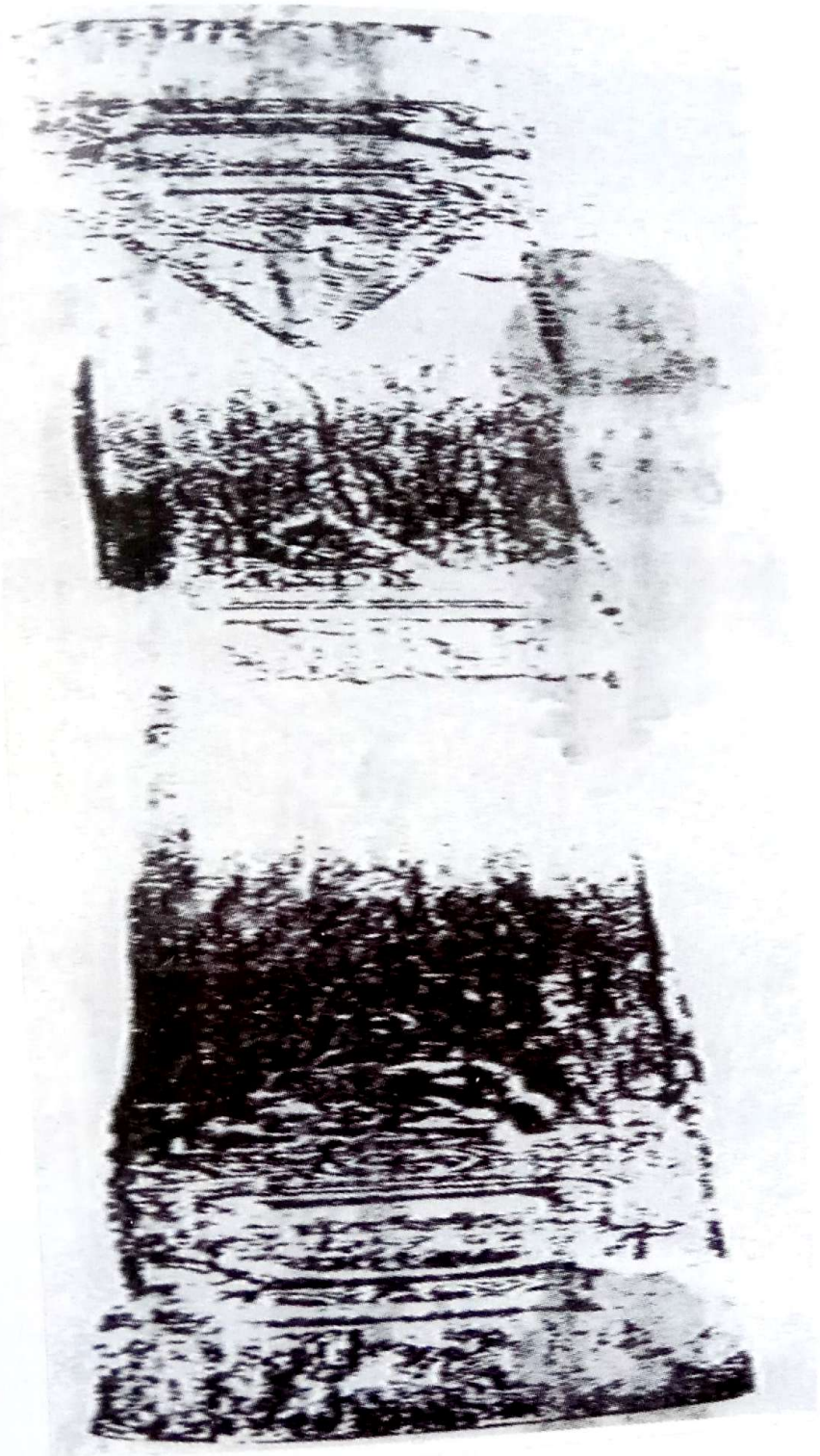

রামপাল থেকে প্রাপ্ত কাঠের ২নং স্তম্ভের ১নং পৃষ্ঠ

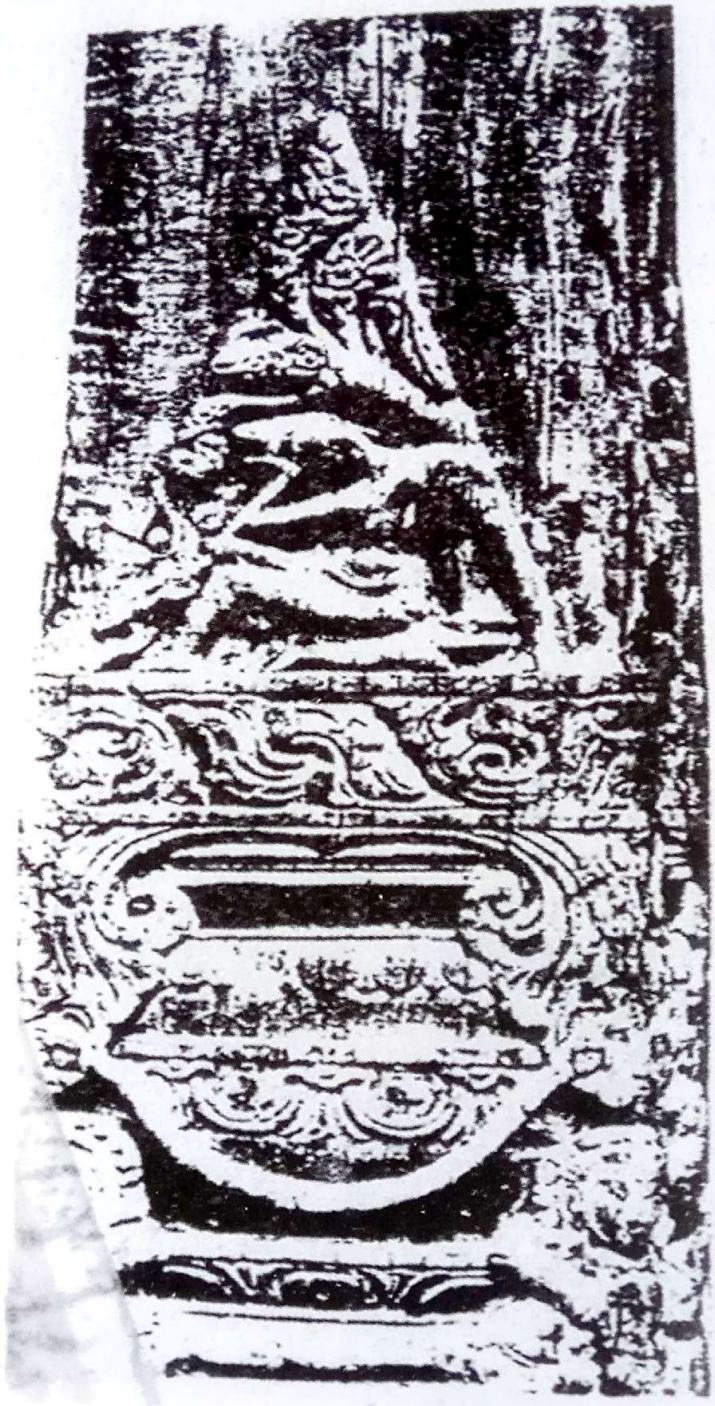

রামপাল থেকে প্রাপ্ত কাঠের ২নং স্তম্ভের ২নং পৃষ্ঠ

রামপাল থেকে প্রাপ্ত কাঠের ২নং স্তম্ভের ৩নং পৃষ্ঠ

রামপাল থেকে প্রাপ্ত কাঠের ২নং স্তম্ভের ৪নং পৃষ্ঠ

নয়নন্দ থেকে প্রাপ্ত পর্ণশবরী মূর্তি

বজ্রযোগিনী থেকে প্রাপ্ত পর্ণশবরী মূর্তি

আব্দুল্লাহপুর থেকে প্রাপ্ত অঘোর মূর্তি

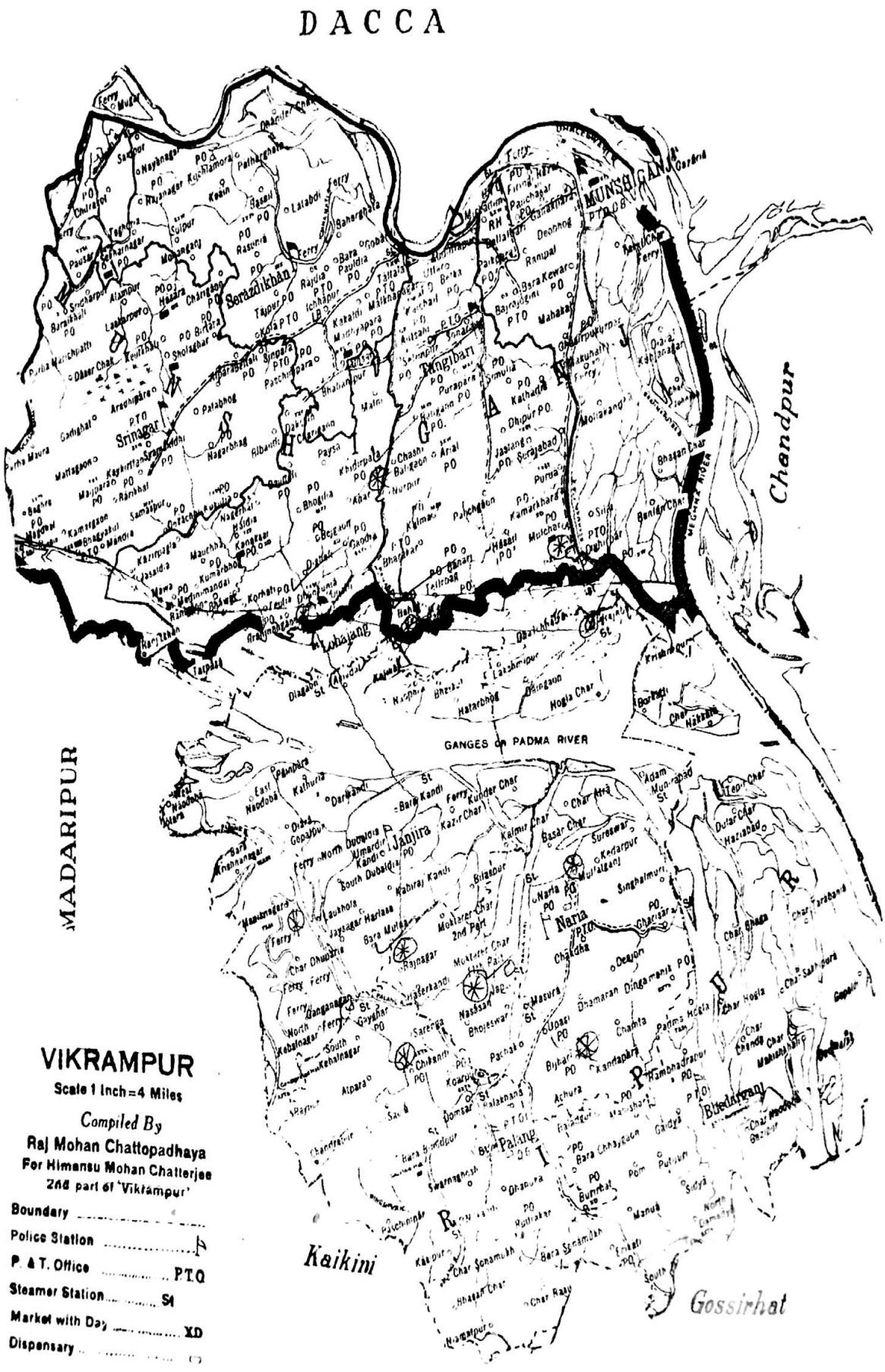

উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের মানচিত্র (বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে)

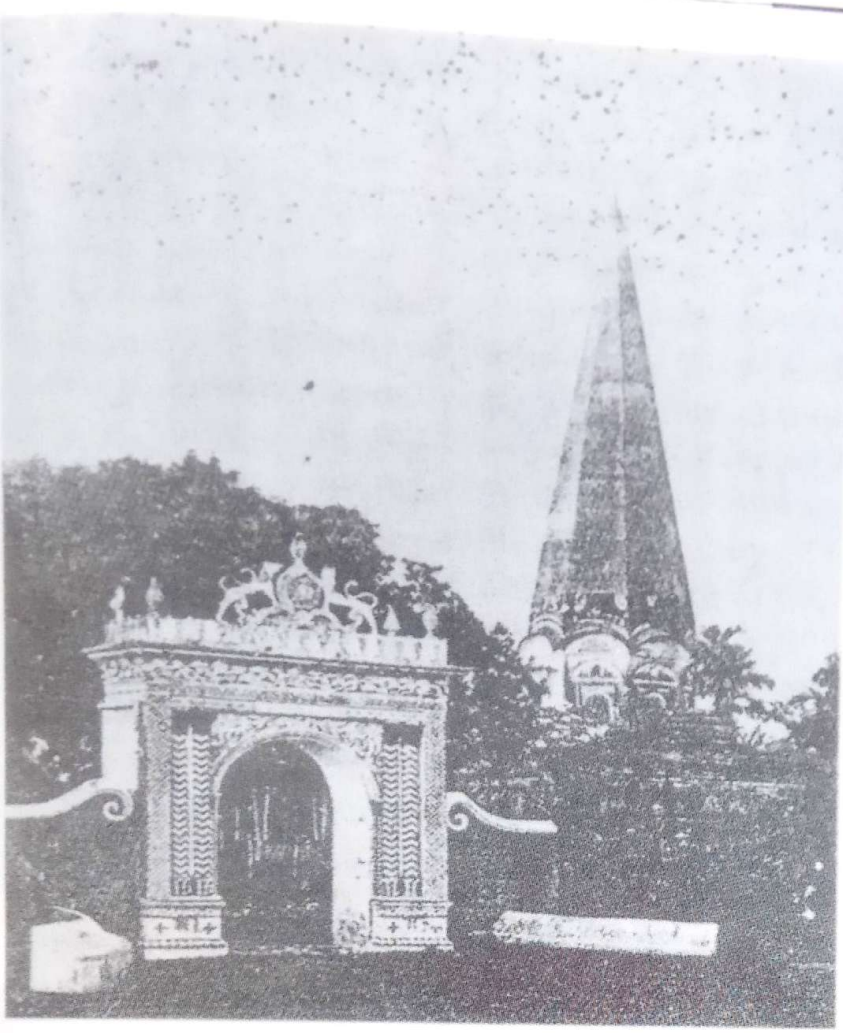

রমনার কালীবাড়ি, উনিশ শতকের শেষার্ধে

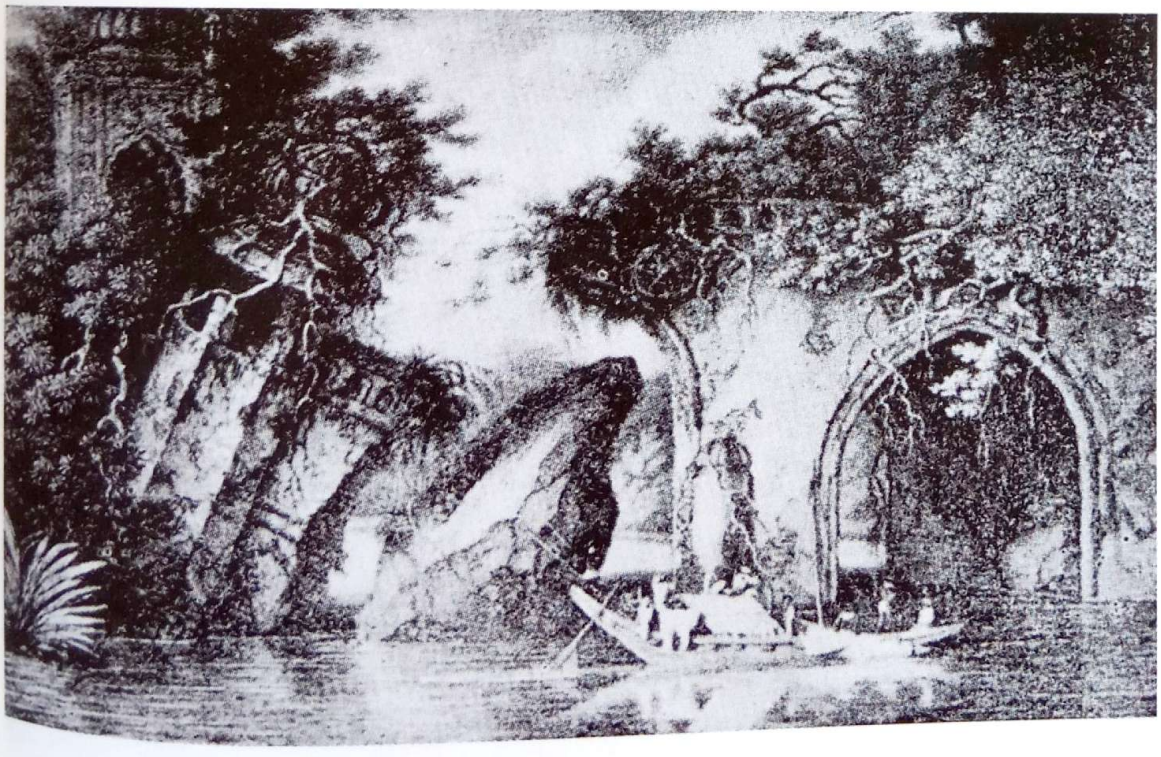

পাগলার পুলের ধ্বংসাবশেষ

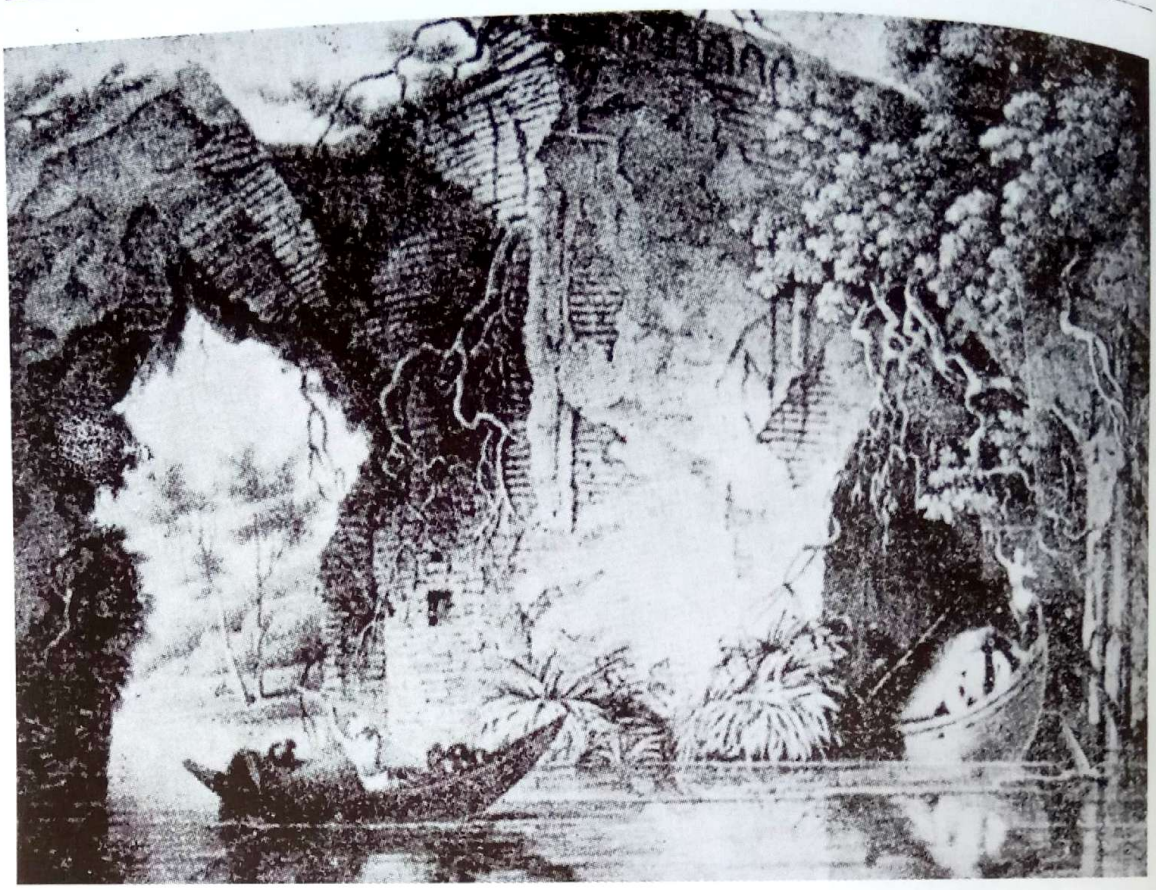

টঙ্গির পুলের ধ্বংসাবশেষ

হুসেনী দালানের দক্ষিণ ভাগ, ঢাকা

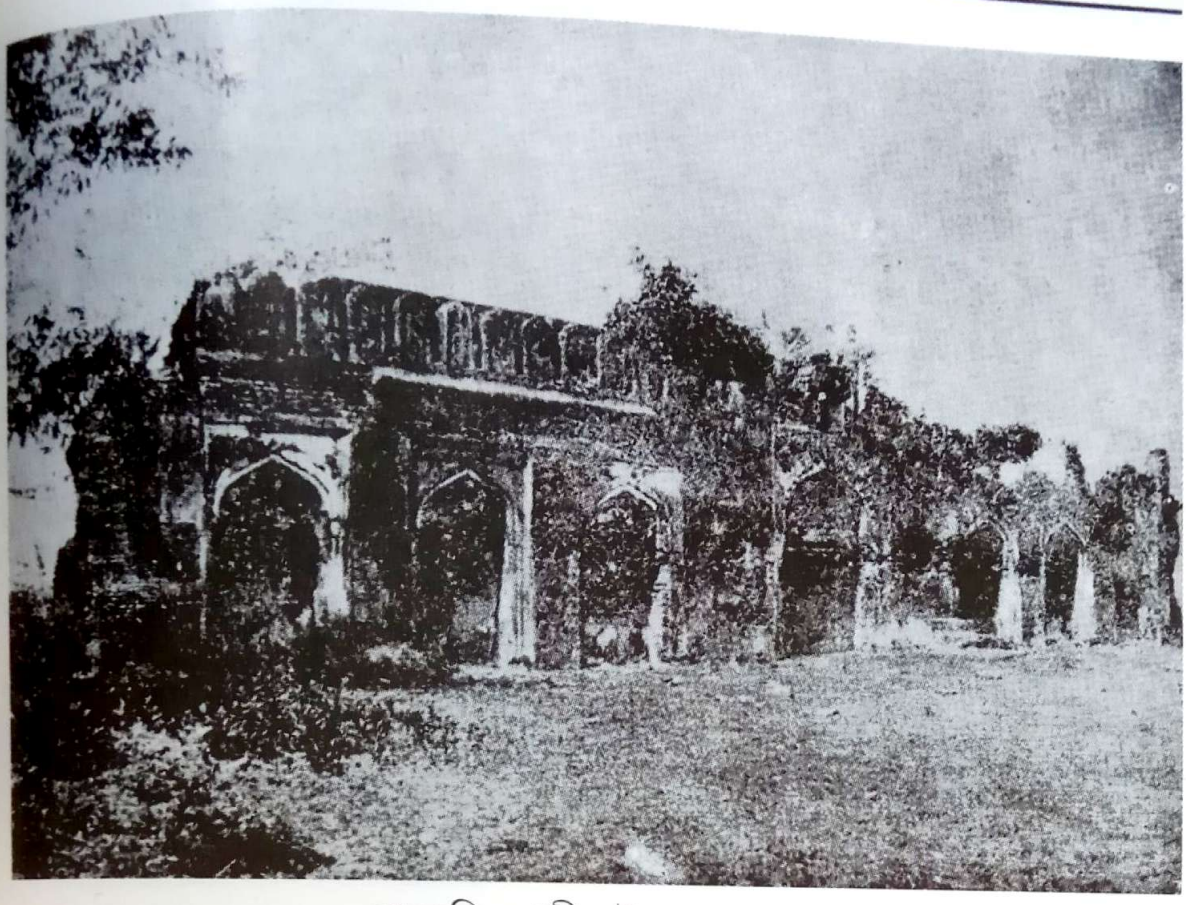

ধানমণ্ডির প্রাচীন ঈদগাহ, ঢাকা

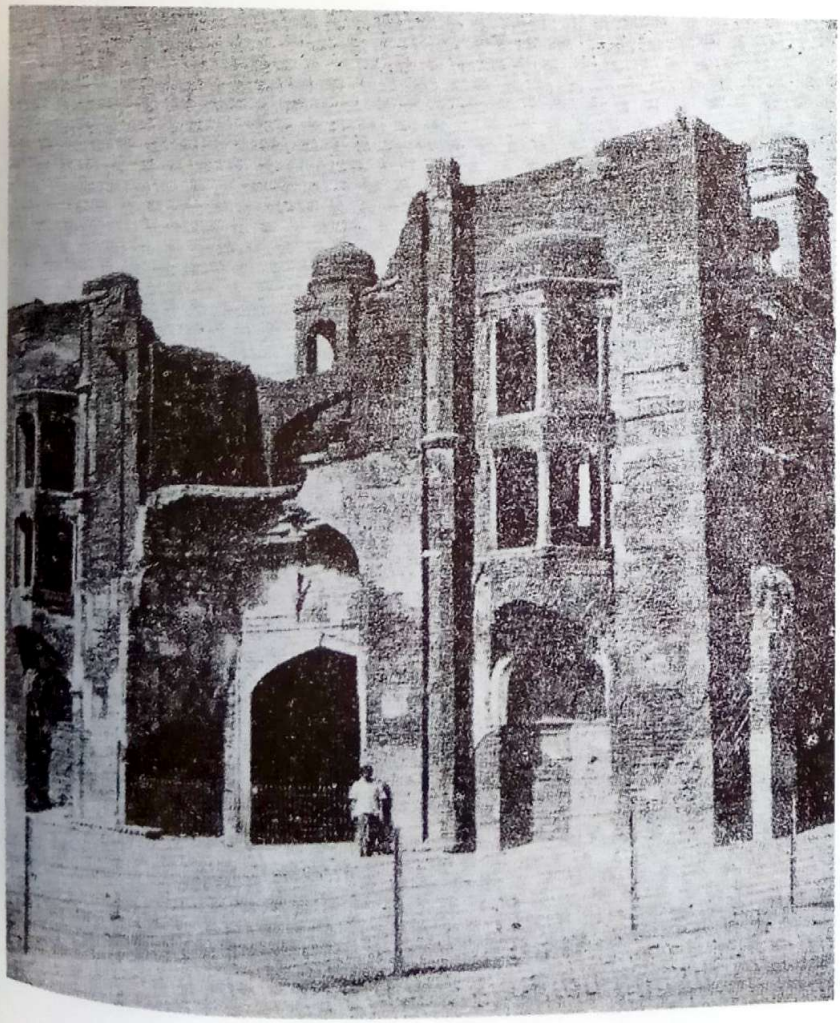

লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ তোরণ, ঢাকা

সাতগম্বুজ মসজিদ, ঢাকা

তাঁতীবাজার-নবাবপুর সড়কের প্রাচীন পুল

খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদ, ঢাকা

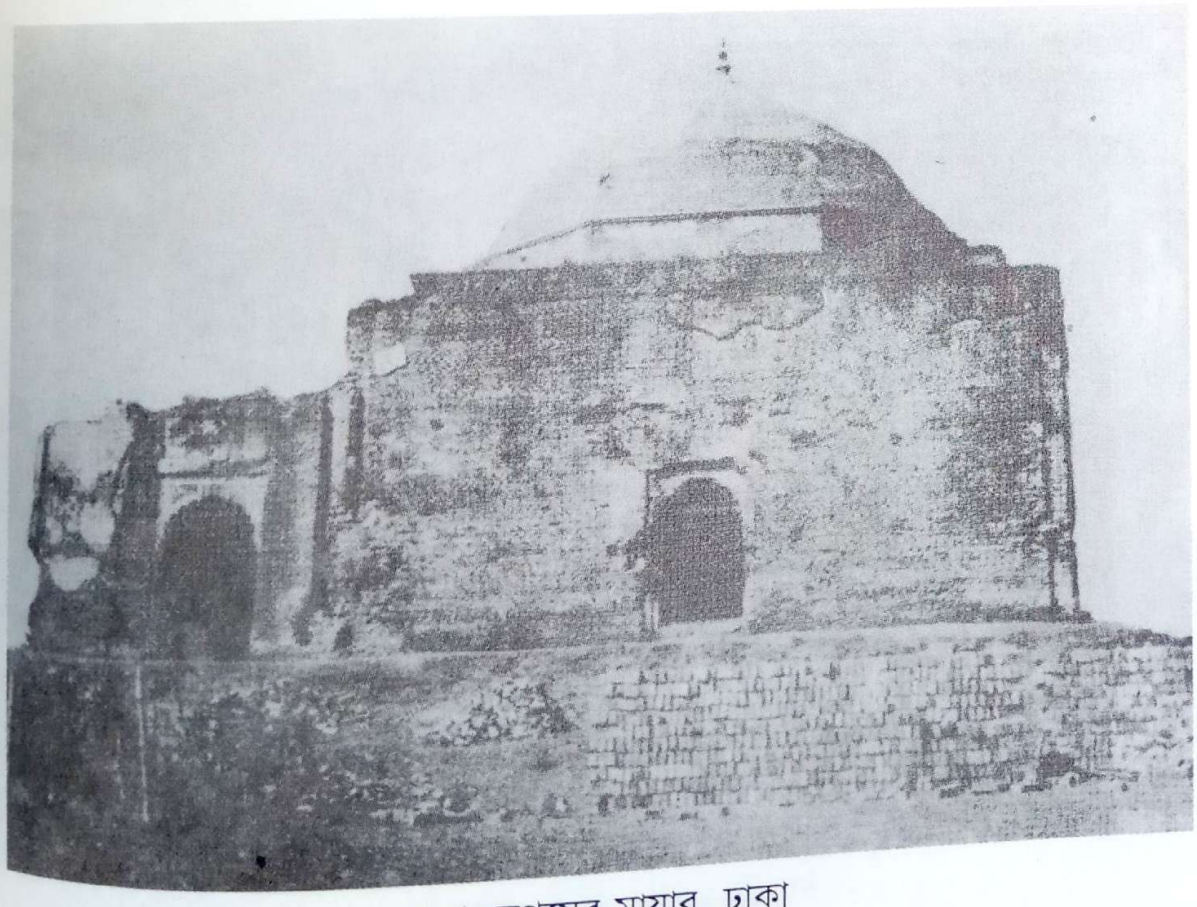

দারা বেগমের মাযার, ঢাকা

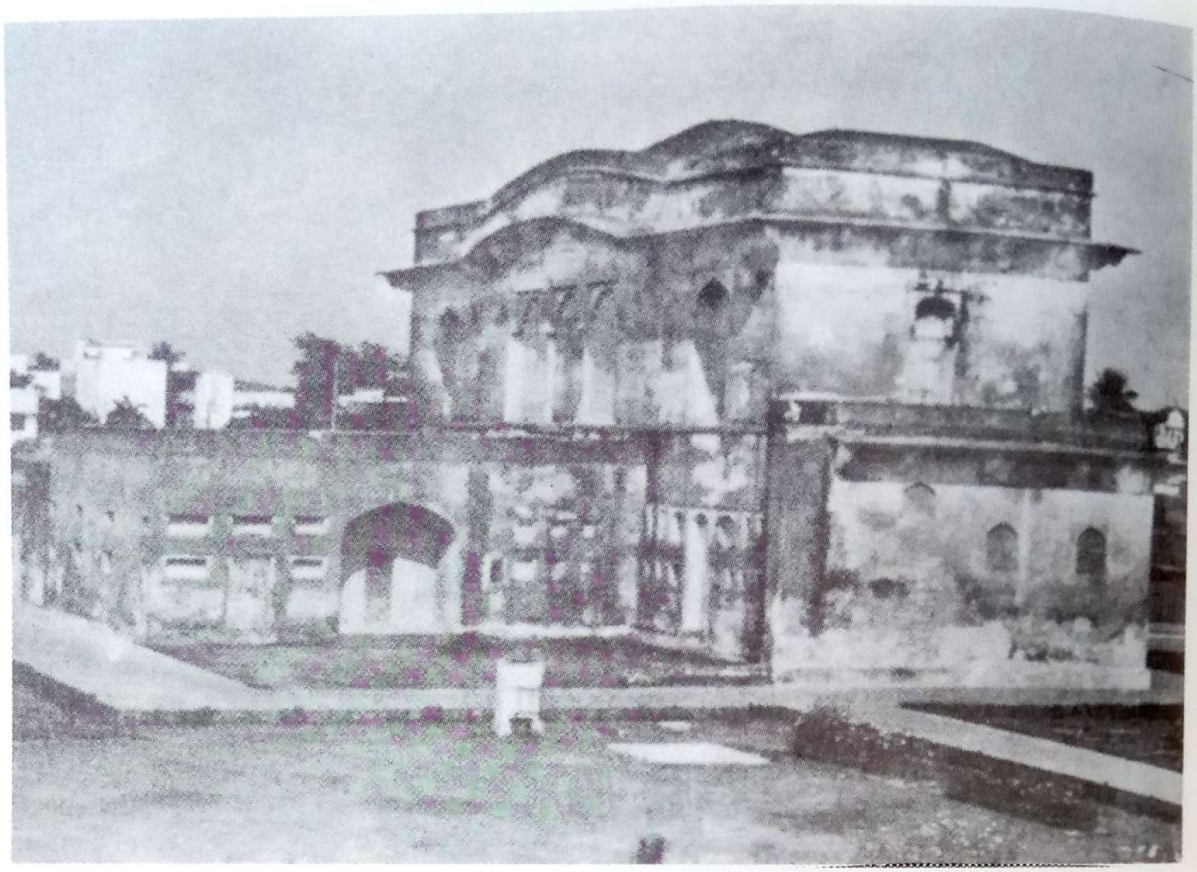

হাম্মামখানা, লালবাগ দুর্গ, ঢাকা

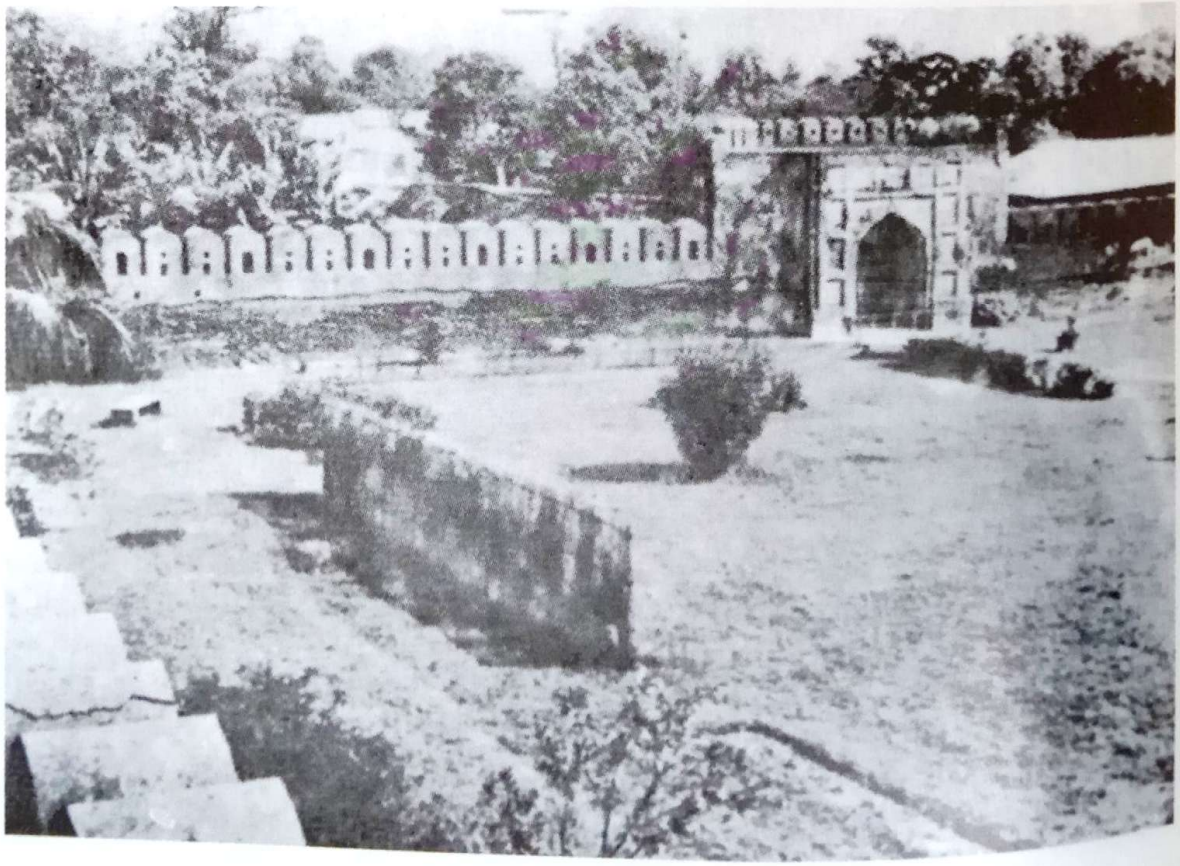

সোনাকান্দা দুর্গ, নারায়ণগঞ্জ

বাবা আদম মসজিদ, রামপাল, মুন্সীগঞ্জ

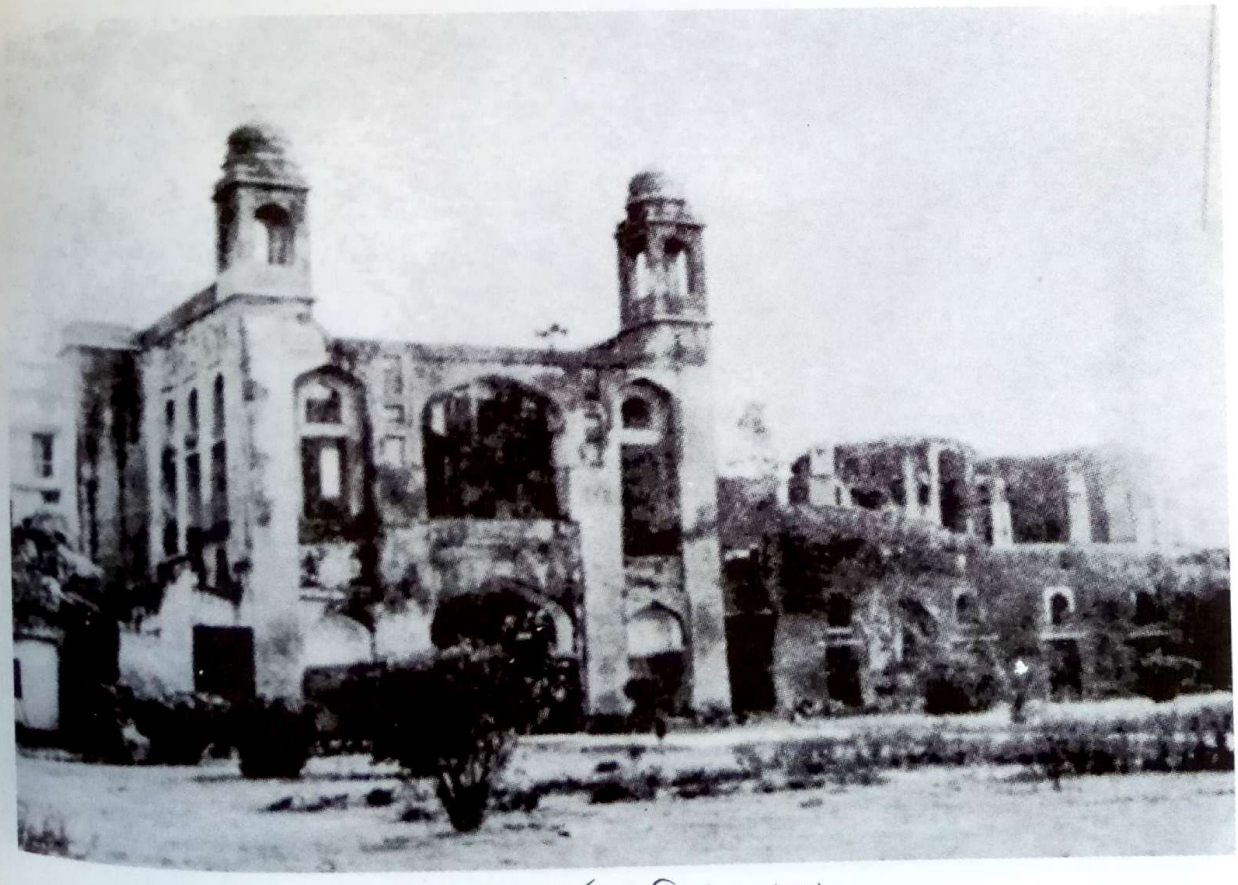

লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ তোরণ

আব্দুল্লাপুরের পুল, মুন্সীগঞ্জ

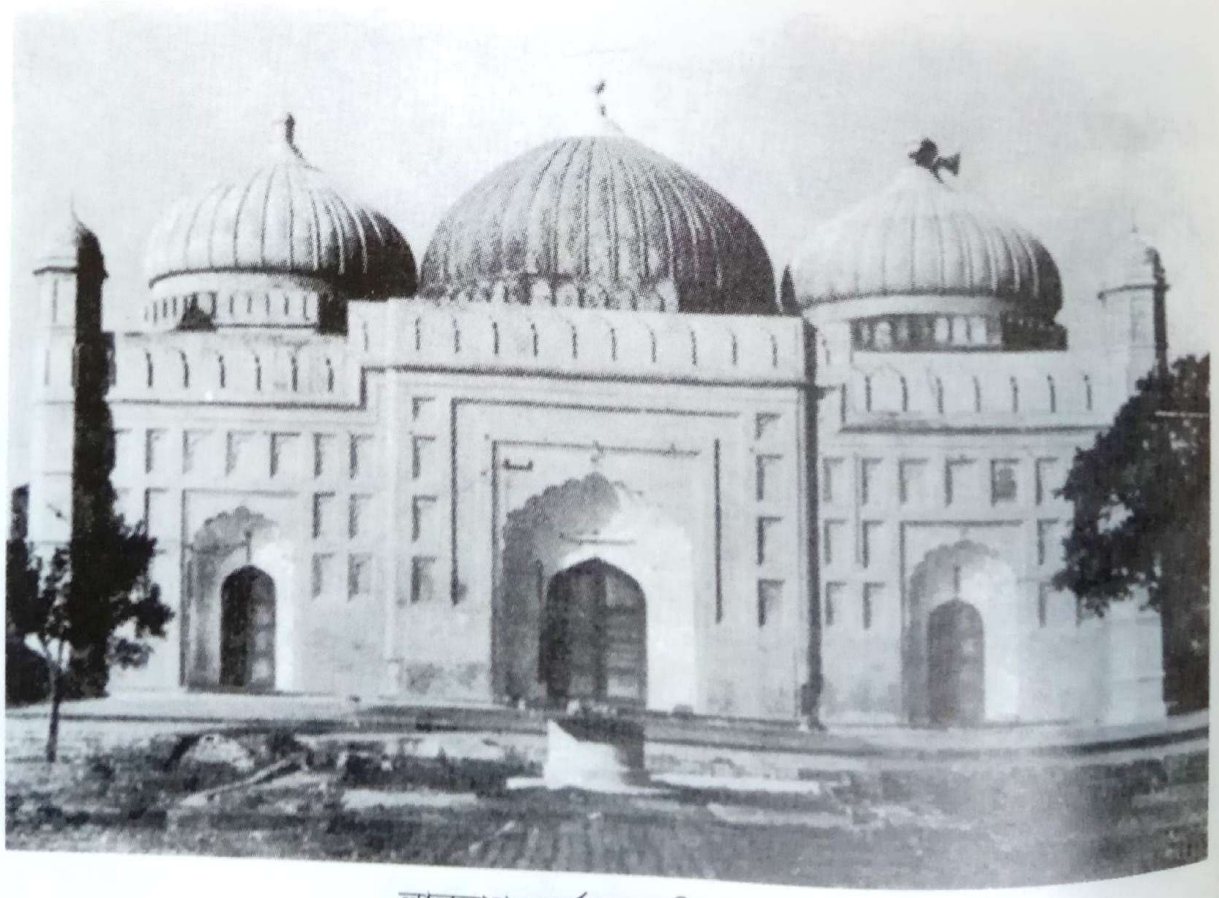

লালবাগ দুর্গের মসজিদ, ঢাকা

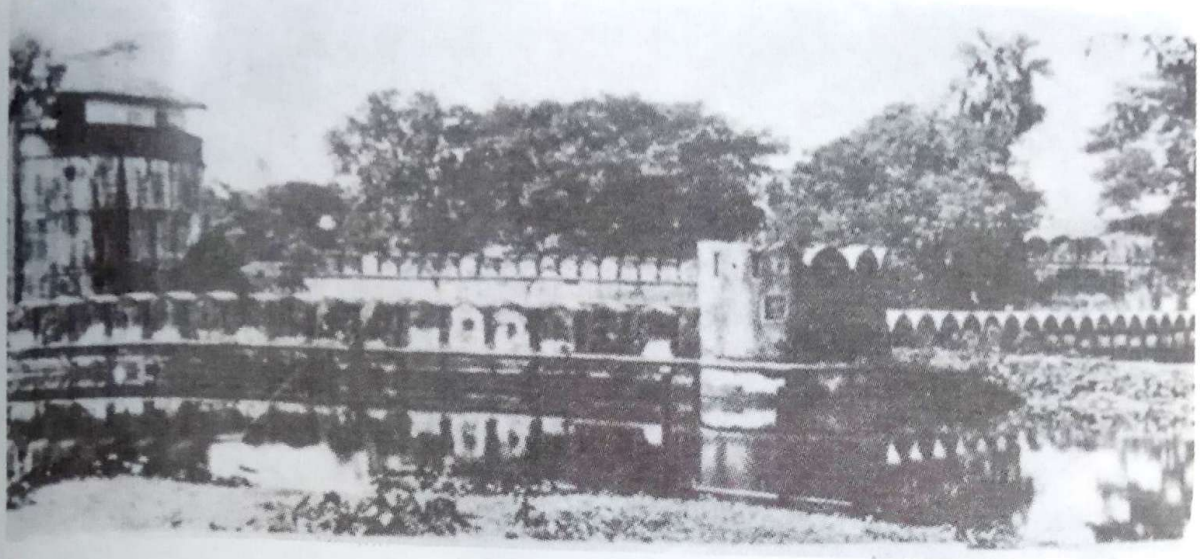

ইদ্রাকপুর দুর্গ, মুন্সীগঞ্জ

কদম রসুল, নবীগঞ্জ

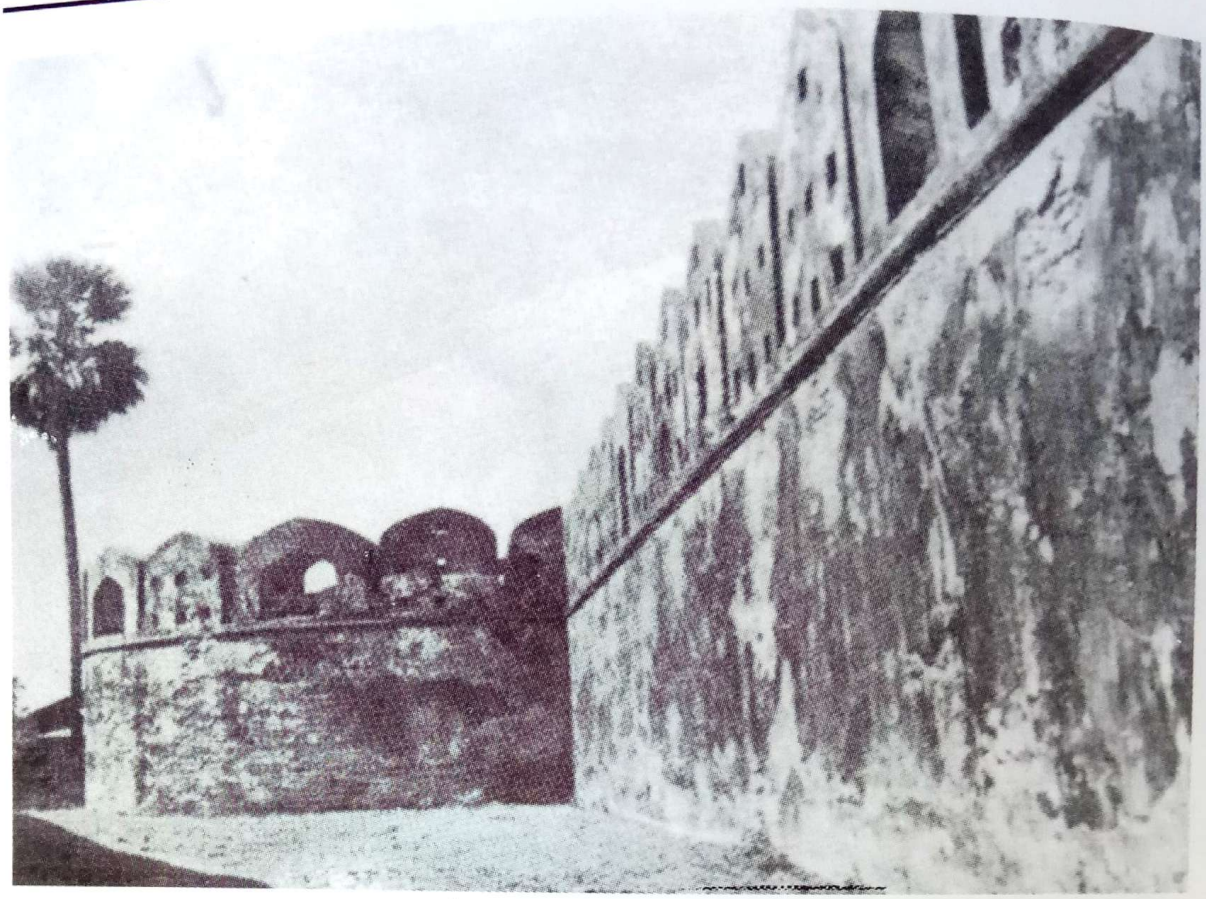

হাজীগঞ্জ দুর্গ, নারায়ণগঞ্জ

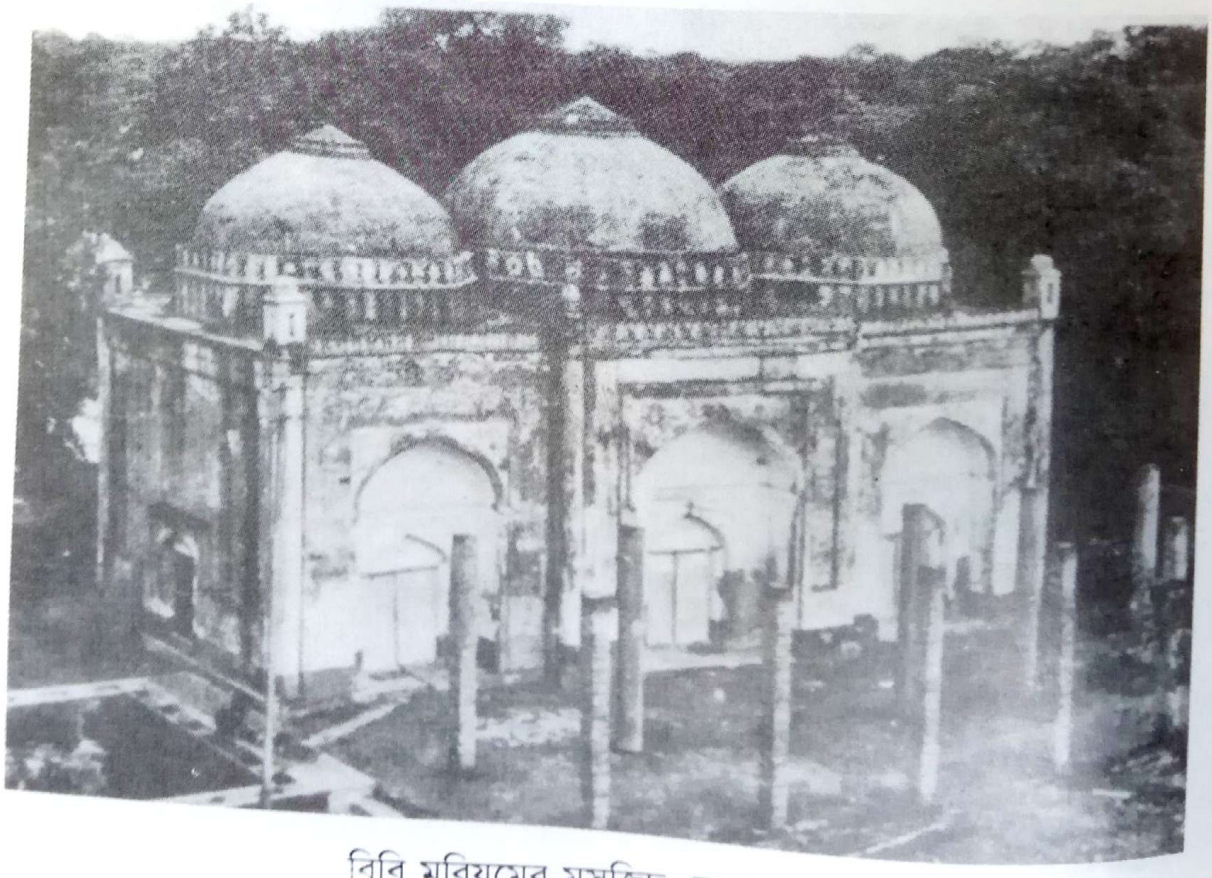

বিবি মরিয়মের মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ

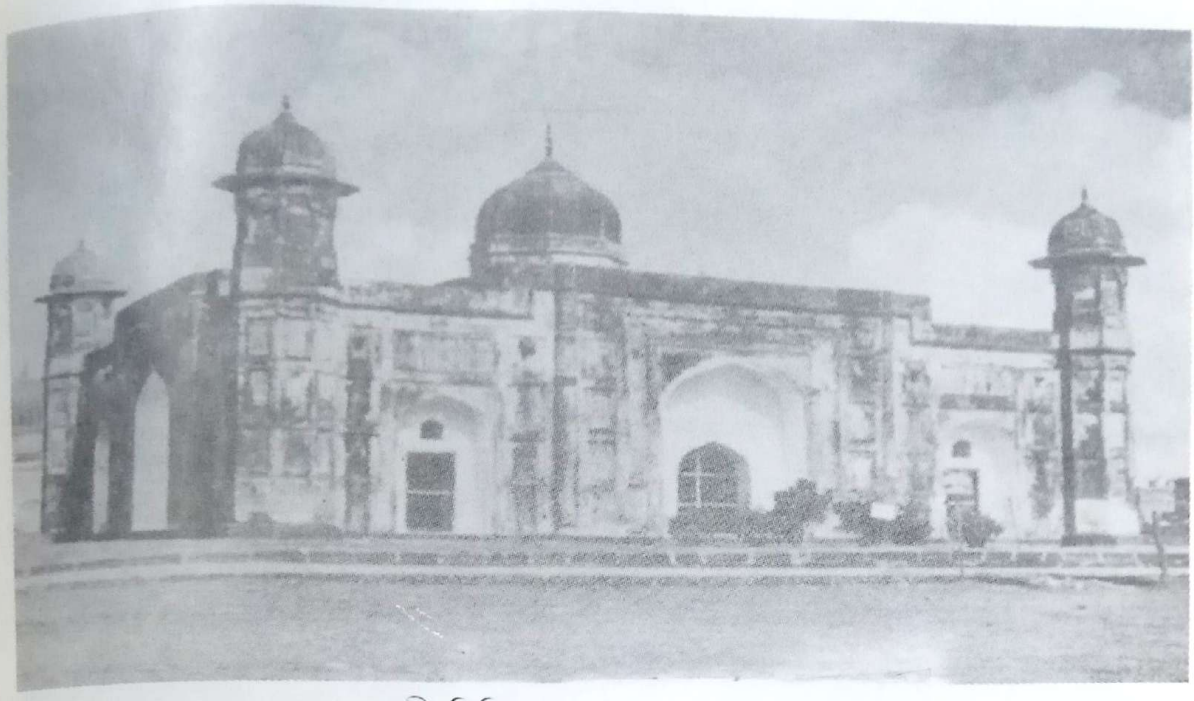

পরী বিবির মাযার, লালবাগ, ঢাকা

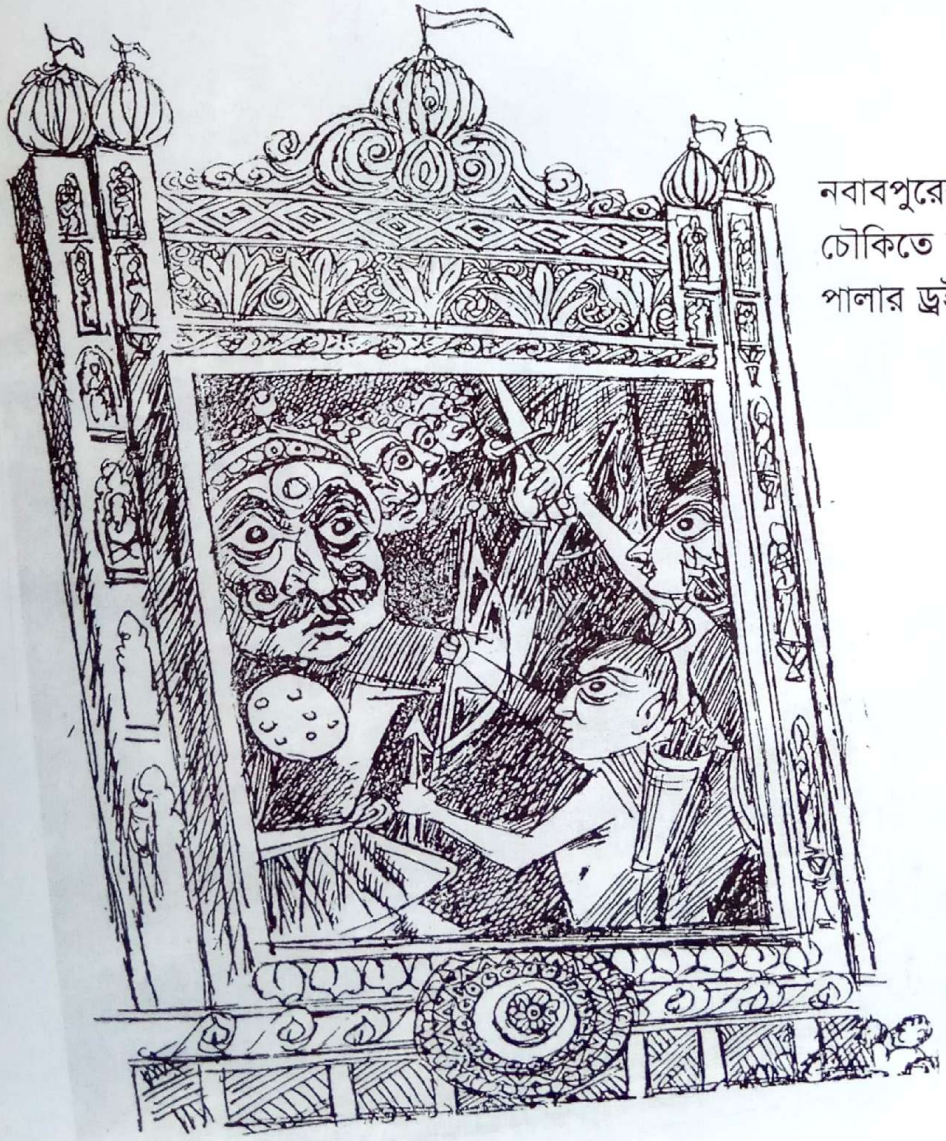

নবাবপুরের বড় চৌকিতে রাবণবধের পালার ড্রইং

বড় কাটরা, যেমনটি দেখেছিলেন চার্লস ডি অয়লি ১৮২৩ সালে

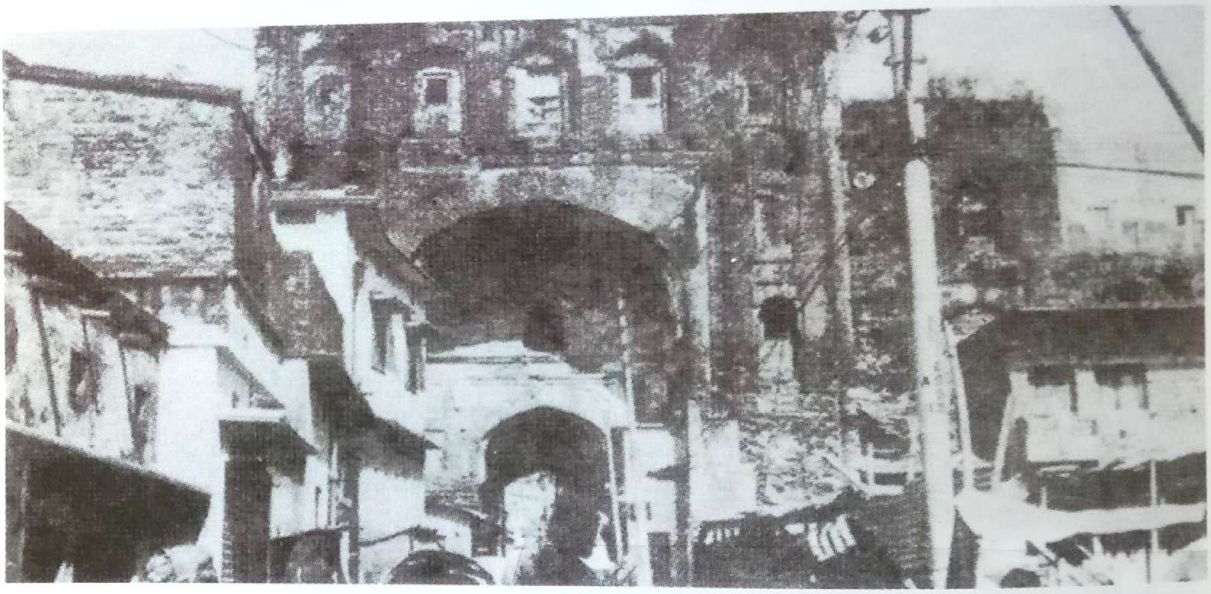

বড় কাটরা এখন

বড় কাটরার উত্তর ফটক, যেমনটি ছিল ১৮১৬ সালে

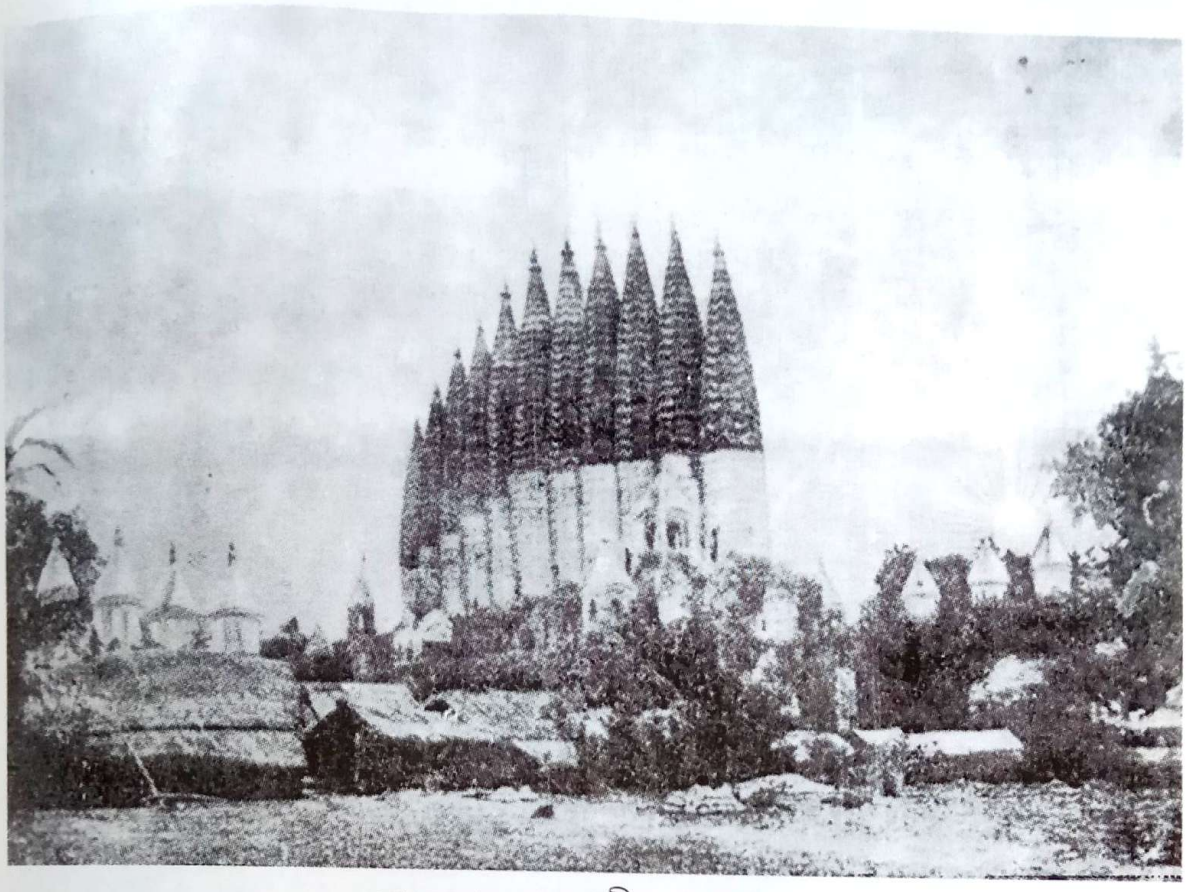

রাজনগর রাজবাড়ীর তোরণদ্বার

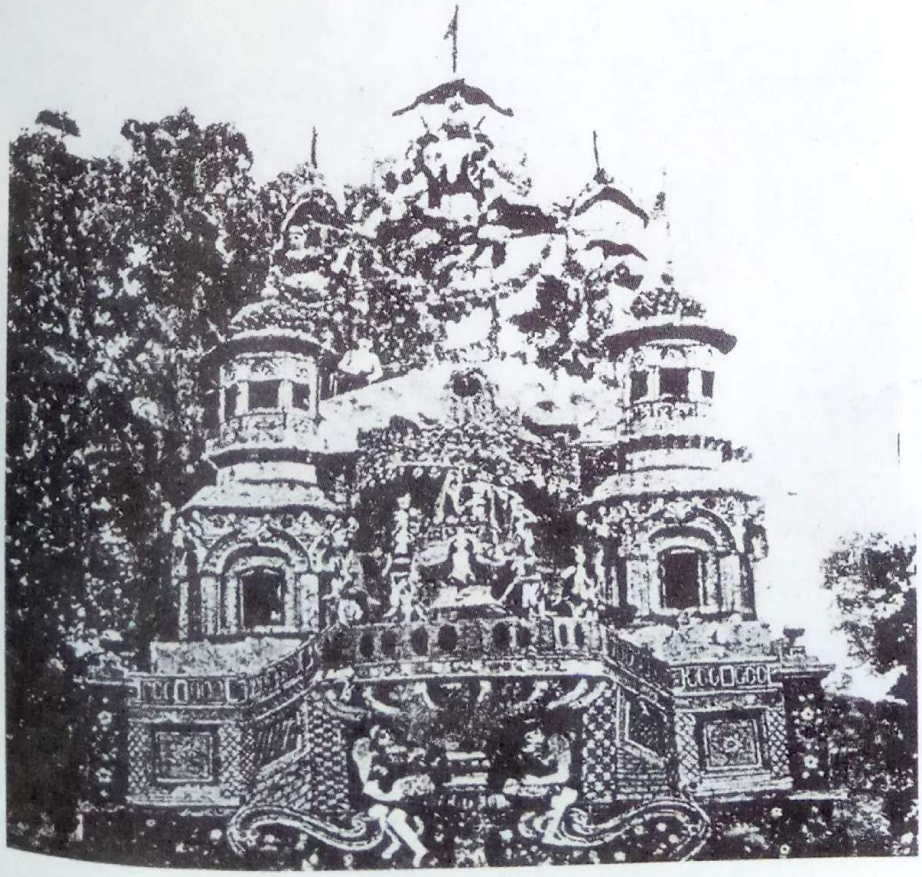

জন্মাষ্টমীর বড় চৌকি (নবাবপুর) বিংশ শতকের প্রথমদিকে।

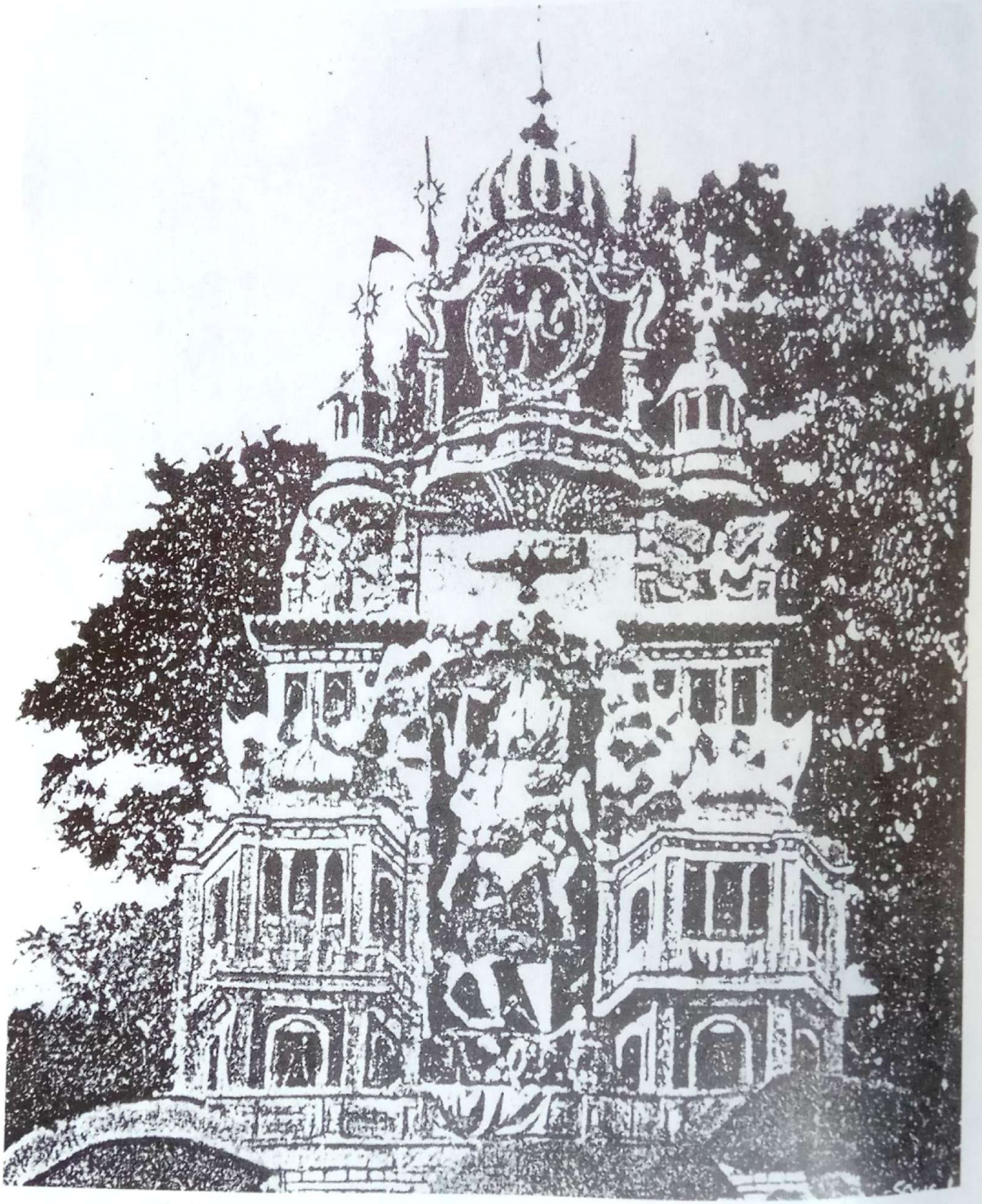

জন্মাষ্টমীর বড় চৌকি (ইসলামপুর)। বিংশ শতকের প্রথম দিকে।

গজারী গাছ (রামপাল)। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে

জন্ম - ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। শিক্ষা ও কর্মজীবন – ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুর কে.বি. ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হন এবং একই কলেজ থেকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন খান বিক্রমপুর ও ঢাকার ইতিহাসের একজন নীরব গবেষক। সেই ১৯৭২ সাল থেকে তিনি নিরলসভাবে গবেষণা করে আসছেন। ইতোপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধই উঁচুমানের ও তথ্যসমৃদ্ধ। তাঁর একটি গবেষণাগ্রন্থ 'বিক্রমপুরের নবাব বল্লাল সেন ও ঢাকেশ্বরী মন্দির' ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর আজীবন সদস্য।

জয়নাল আবেদীন খানের যে-সব গবেষণা পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় সেগুলো হল : 'বিক্রমপুরের তিনটি প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও নবাব বল্লাল', 'প্রাচীন বিক্রমপুর আধুনিক বিক্রমপুর', 'বিক্রমপুরের 'প্রাচীন পুকুর-দীঘি বিক্রমপুরের বিখ্যাত রাজাবাড়ীর মঠ', 'বিক্রমপুরের বাবা আদমের মসজিদ বাবা আদমের মাযার', 'বঙ্গে দশভুজা দুর্গা ও চতুর্ভুজা কালী দেবীর পূজা', 'ঢাকার লালবাগ কেল্লা ও পরীবিবির মাজার', 'সন বলালি ও নবাব বল্লাল', 'মাংতা (বেদে) সমতল বঙ্গে একটি পার্বত্য কৌম সমাজ'।

প্রচ্ছদ : সেলিম আহ্‌মেদ

বঙ্গাব্দ

বাংলা সন ইতিহাস, উৎপত্তি ও বিকাশ

মহারাজা বল্লাল ওরফে নবাব আবুল ওরফে বাদশাহ মঙ্গৎ রায়

জয়নাল আবেদীন খান

Pathak Shamabesh
Since 1987
BANGABDA : bangla shan itihash , utpatti o bikash
0552702
Tk. 450.00 + Vat

Also available from Pathak Shamabesh

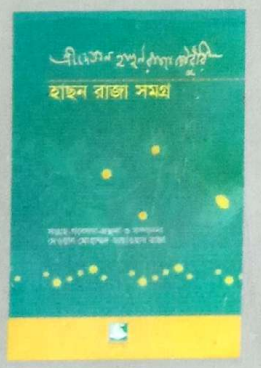

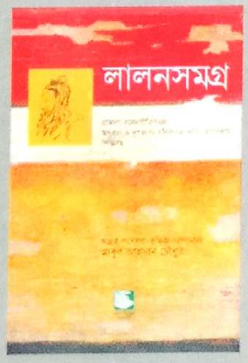

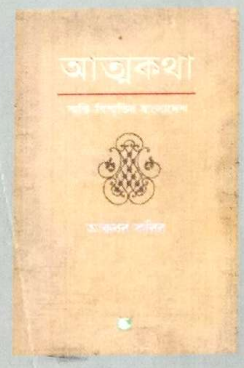

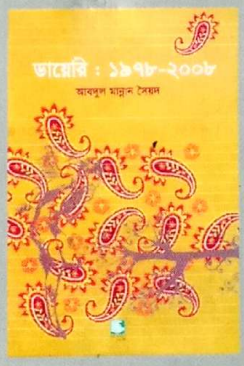

Cover Design by Selim Ahmed

Pathak Shamabesh
Since 1987

A
Pathak Shamabesh Book

Histography / Social History

B. Tk. 450.00
UK. £ 20.00
US. $ 35.00

CULTURE PRESS

ISBN 984-70212-0020-7

Printed & Bound by Culture Press, Bangladesh